উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ • কলিকাতা-৯

উপনিষদ প্রাচীনকালের ঋষির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তার দার্শনিক উৎকর্ষ বিশ্বের সকল মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তার মাধুর্য কবির কল্পলোকেও দুর্লভ। তাই তা শোপেনহরের মত দার্শনিকের হৃদয়কে ঐকান্তিকভাবে মুগ্ধ করেছিল।

বাস্তবিক উপনিষদকে অবলম্বন ক'রে এমন একটি ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল যা সত্য, প্রেম ও মঙ্গলকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করেছে। তাই তার মধ্যে যেমন একটি পাবনী-শক্তি আছে, তেমন অনন্ত আনন্দের স্পর্শ আছে। সেই কারণেই তা রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

বিত্ত বড় না তত্ত্বকথা বড়, শ্রেয় কি আর প্রেয় কি, এই দৃশ্যমান জগত কি স্বপ্নবৎ প্রপঞ্চ না পরম সত্তার লীলাভূমি—এই সকল দার্শনিক প্রশ্ন উপনিষদের আলোচনার বিষয়। তা সত্ত্বেও তার দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই তা সরস, তাই তা একাধারে কাব্য ও দর্শন।

বর্তমান পুস্তকে প্রাচীন ভারতের এই অমূল্য সম্পদকে বাঙলা-ভাষীর নিকট স্থাপন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সরল সরস ভাষায় উপনিষদগুলির মূল ভাবধারা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা-ধারার সহিত উপনিষদের নিগূঢ় সংযোগ আছে। এই পুস্তকে সেই যোগসূত্রগুলিও আলোচিত হয়েছে।
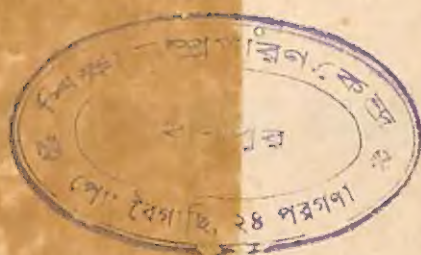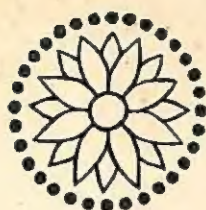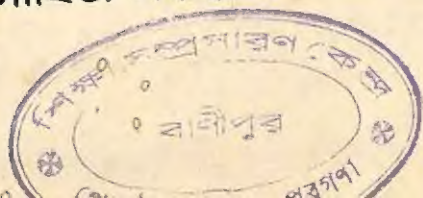
॥ উপনিষদের দর্শন ॥

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ • কলিকাতা-৯

৺মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতৃদেব শ্রীচরণেষু
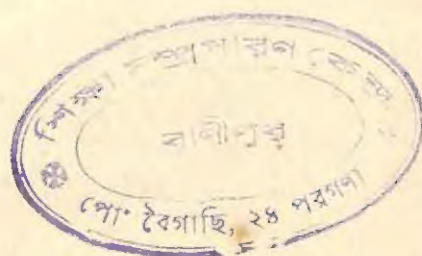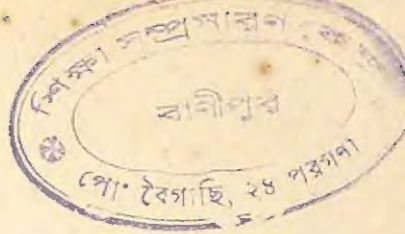
লেখকের নিবেদন

বিশ বছরের অধিক পূর্বে আমি উপনিষদের দর্শন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ। পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করবার সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। আমার বিশেষ তৃপ্তির কারণ আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সেখানি পড়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

পরে পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে এবং একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের জন্য একাধিক স্থান হতে আমি অনুরোধ পাই। ইচ্ছা থাকলেও সে অনুরোধ এতদিন রক্ষা করবার সুযোগ পাই নি। কর্মজীবনে এমন বিরামহীন কর্তব্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল যে দীর্ঘকাল ধরে আমার জীবনে অবসর বলে কোনো বস্তু ছিল না। সম্প্রতি অবস্থা অনুকূল হওয়ায় এবিষয় মনোযোগ দেবার সুযোগ হয়েছে।

পুস্তকখানি পরীক্ষা ক'রে দেখলাম সামান্য সংশোধন বা পরিবর্তন ক'রে দিলে চলবে না। কালের ব্যবধানে নূতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনে হল তার রীতিমত পরিবর্তন প্রয়োজন। ফলে বইখানি এক রকম সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিয়েছে, যদিও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। প্রথম বইখানি ছিল তথ্যবহুল। পাঠকসমাজের নিকট যে নূতন পুস্তক স্থাপিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যামূলক। এখানে বক্তব্য বিষয়কে সহজ ও চিত্তাকর্ষক রূপে স্থাপন করবার চেণ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সহিত উপনিষদের দর্শনের নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। যথাস্থানে উভয়ের যোগসূত্রগুলি দেখান হয়েছে।

পুস্তকখানি এই ভাবে সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করায় পূর্বের পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বড় একটা রইল না। সেই কারণে তার স্বাতন্ত্র্য সূচিত করবার জন্য নামটিও ঈষৎ পরিবর্তিত করা হয়েছে। পুস্তকটি বিদগ্ধ সমাজে সমাদর লাভ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

৫ই সেপ্টেম্বর
১৯৬৩

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক কথা

[উপনিষদের উৎকর্ষ বিশ্বের মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে—শোপেনহর, ডয়সেন, ম্যাক্সমূলার, রবীন্দ্রনাথ। উপনিষদের কাল—বেদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের পারস্পরিক সম্বন্ধ। অথর্ব বেদের স্বাতন্ত্র্য। উপনিষদের অর্থ নিয়ে বিতর্ক। উপনিষদের সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা। বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে মতভেদ—উপনিষদের মূল বচন হতে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা।]

উপনিষদ প্রাচীনকালের মনীষীর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তা নানাভাবে বিস্ময় উৎপাদন করে। তা বেদের ন্যায় ধর্মগ্রন্থের আশ্রয়ে জন্মলাভ করেও স্বাধীন মননশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তা মানুষের প্রথম দার্শনিক চিন্তনের নিদর্শন। সবার বড় বিস্ময়, তার বক্ষ আশ্রয় ক'রে এমন একখানি বিজ্ঞান-সম্মত, যুক্তিসঙ্গত, আশাবাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল যা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

সে-দর্শন বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে গড়া, সে-দর্শন এমন এক বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গিতে উন্নীত হয়েছিল যেখানে শোক, তাপ, মোহ, মৃত্যুর পরুষ হস্তাবলেপ পৌঁছায় না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা দীক্ষিত হয়েছিল তারা হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে মানুষ অমৃতের পুত্র হবার অধিকারী, কারণ তারা নিজেরা পরাবিদ্যার চর্চা ক'রে মৃত্যুর বেদনাকে খন্ডন করতে পেরেছিল। সেই কারণেই উপনিষদের বাণী আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল।

তা ঘোষণা করেছিল, "এই পৃথিবী সকল জীবের নিকট মধুস্বরূপ। এই পৃথিবীতে সকল জীব মধু।"[১]

তা বলেছিল, "বাতাসে মধু বয়, নদীর জলে মধু ক্ষরে। ওষধীরা মধুময় হক। দিবা এবং ঊষা মধুময় হক। পৃথিবীর ধূলি মধু। আমাদের পিতা

---

১ ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।
অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৫॥ ১

আকাশ মধুময় হক। বনস্পতি, সূর্য এবং গাভীগুলি সকলেই আমাদের নিকট মধুময় হক।”[২]

তা সমগ্র বিশ্ব ব্যেপে এক আনন্দময়ের প্রকাশ উপলব্ধি করেছিল। তাই পরম সত্তাকে তা বর্ণনা করেছিল “আনন্দরূপ ও অমৃত”[৩] বলে।

এমন আনন্দরসে পরিপ্লাবিত সাহিত্য বড় একটা দেখা যায় না। তা অত্যন্ত বিরল। তবে তার আর একটি উদাহরণ আমাদের দেশেই পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে। তিনিও এমন দিব্যদৃষ্টির সন্ধান পেয়েছিলেন যার ফলে তাঁর নিকট মানবজীবন “আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ” রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনিও অনুরূপ সুরে গেয়েছিলেন,

> “সকল আকাশ সকল ধরা
> আনন্দ হাসিতে ভরা,
> যেদিক পানে নয়ন মেলি
> ভালো সবি ভালো।”[৪]

তাই দেখি উপনিষদের এই বাণী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপয়িতা স্যর উইলিয়ম জোনসই প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভান্ডারের সহিত পশ্চিমের মানুষের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। তিনি উপনিষদ পড়ে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহর উপনিষদ পাঠ ক'রে অনুরূপ ভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি উপনিষদের জন্য যে শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা ক'রে গেছেন তেমনটি মনে হয় খুব কম গ্রন্থের ভাগ্যেই জোটে। তার বাংলা অনুবাদটি এই রকম দাঁড়ায় :

“সমগ্র বিশ্বে এমন কোনো গ্রন্থ নাই যা উপনিষদের মত কল্যাণকর ও উৎকর্ষসাধক। তা আমাকে জীবনে দিয়েছিল তৃপ্তি মরণেও এনে দেবে তৃপ্তি।”

এই প্রশংসাপত্রের অনুমোদনের যদি প্রয়োজন হয় তাও পাওয়া যাবে বিশ্ববরেণ্য আর একটি মনীষী দার্শনিকের কাছ হতে। তিনি হলেন ম্যাক্স্-মূলার। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই প্রশংসাপত্রের অনুমোদন লিখে রেখে গেছেন। তাঁর নিজের রচিত এক গ্রন্থে শোপেনহরের উক্ত রচনাটি উদ্ধৃত ক'রে তারপর এইরকম মন্তব্য করেছেন,

“শোপেনহরের এই কথাগুলির যদি সমর্থন লাগে তা হলে বহু দর্শনগ্রন্থ

---

[২] মধু বাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তু ওষধিঃ।
মধু নক্তমুতোষসো। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমানস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥
বৃহদারণ্যক ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১১

[৩] আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ মুণ্ডক ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭

[৪] গীতাঞ্জলি, ৪৫

এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠে নিবেদিত আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা দিতে আমি নিজেই প্রস্তুত আছি।"[৫]

তাই বলছিলাম যে উপনিষদের অন্যতম বিস্ময় হল মানুষের দার্শনিক চিন্তনের প্রথম চেষ্টায় আমাদেরই দেশের মনীষী এমন বিশ্বজয়ী উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার তাৎপর্য ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করতে হলে উপনিষদের প্রাচীনতা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঠিক কোন কালে কোন যুগে উপনিষদ রচিত হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। তার অবতারণা ক'রে আমাদের বর্তমান আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করবার প্রয়োজন নাই। বিতর্ক এড়িয়ে অন্য পথে আমরা এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নিতে পারি। আমরা সেই পথেই যাব।

আমাদের স্বাধীন ভারত সরকার যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকার মর্যাদা দিয়েছেন, তার মাঝখানে একটি চক্র আছে। আমরা এই পতাকাটিকে বছরে দুইবার সম্মান জানিয়ে অভিবাদন করি। সুতরাং সকলেরই এই চক্রটি নজরে এসে থাকবে। কেউ কেউ হয়ত শুনে থাকব, তাকে অশোক চক্র বলে।

তাকে পতাকায় স্থান দেবার কারণ হল এই : এখন হতে বাইশ শত বছর আগে এ দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি তার জন্য নয়। তিনি যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তেমনি পরদুঃখ-কাতর ছিলেন। দেশের মানুষের কল্যাণসাধন এবং দেশের মানুষকে সৎশিক্ষা-দানকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার মানুষকে সৎশিক্ষা দেবার জন্য তাই তিনি এক নূতন ধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের নানা স্থানে পাথরের থাম নির্মাণ ক'রে তার গায়ে তিনি সুন্দর সুন্দর বচন লিখে রাখতেন। লোকে তাই পড়ে হিংসা ত্যাগ করতে শিখত, সকলকে ভালবাসতে শিখত। সুন্দর বচনকে সুন্দর পরিবেশের মাঝখানে স্থাপন না করলে ত মানায় না। তাই এই থামগুলিকে সুন্দর করবার জন্য তাদের মাথায় নানা সুন্দর মূর্তি স্থাপন ক'রে সাজাতেন। এমনি একটি থামের মাথায় তিনি চারটি সিংহ মূর্তি স্থাপন ক'রে সাজিয়েছিলেন। এই সিংহগুলি পরস্পরের দিকে পিঠ ক'রে চারিদিকে চেয়ে রয়েছে। তাদের তলায় আছে চারটি জীবের ছবি। একটি হাতীর, একটি ঘোড়ার, একটি বৃষের ও একটি হংসের। এদের প্রত্যেকটির মাঝখানে একটি চক্র আঁকা। তাই হল অশোক চক্র।

অশোকের যুগ আমাদের দেশের ইতিহাসের সর্ব থেকে গৌরবময় যুগ। তাই তাকে স্মরণ রাখবার জন্য আমাদের জাতীয় পতাকায় অশোকস্তম্ভে যে চক্র স্থাপিত আছে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

---

৫ Three Lectures on the Vedanta Philosophy, F. Maxmuller, p. 8.

এই যে চক্রের কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, সেই চক্রেরও একটা অর্থ আছে। আমাদেরই দেশের সম্রাট অশোকের তিন শত বৎসর পূর্বে আর এক রাজবংশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। অন্যের দুঃখ তাঁর মনকে ভারি পীড়া দিত। মানুষের জীবনে কত দুঃখ আছে। সকল মানুষের দুঃখ দূর করবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। অনেক সাধনার পর তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তার নাম বৌদ্ধধর্ম। এই চক্র তাঁর সেই প্রচারিত ধর্মের প্রতীক। তাই তার নাম ধর্মচক্র। অহিংসা ও সকল জীবে দয়া এই ধর্মের মূল নীতি। সেই কারণে, সে কালের মানুষ বুদ্ধকে পরমকারুণিক মহর্ষি বলত। রাজা অশোক বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। তাই তাঁর স্তম্ভকে এই চক্র দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

বুদ্ধ যখন এদেশে আবির্ভূত হন, তখন তা জ্ঞানে ও সভ্যতায় অনেক অগ্রসর ছিল। আমাদের দেশের মানুষ তারও অনেক পূর্ব হতেই জ্ঞান ও শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। তাদের সেকালে ইতিহাস বলা হত। এই দুটি গ্রন্থে যে গল্প বলা হয়েছে তার ঘটনা ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই ঘটেছে। বুদ্ধের যুগের লিখিত ইতিহাস আছে, কিন্তু রাম সীতার কাহিনী বা পাণ্ডবদের কাহিনী যে যুগের কথা বলে, তার কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। খানিকটা কিংবদন্তী, খানিকটা প্রকৃত ঘটনাকে জড়িয়ে নিয়ে যে রচনা তাকেই সেকালে ইতিহাস বলা হত। আমাদের দেশের মানুষ রামায়ণের যুগের পূর্বেও জ্ঞান ও শিক্ষায় বেশ অগ্রসর হয়েছিল। আমরা জানি আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষার নাম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত বই আমরা এখনও বিদ্যালয়ে কিছু কিছু পাঠ ক'রে থাকি। সব থেকে প্রাচীন যুগে যে ভাষায় বই লেখা হত, তার নাম ছিল বৈদিক ভাষা। তা সংস্কৃতের মত, কিন্তু সংস্কৃত হতে বিভিন্ন। মায়ের সঙ্গে মেয়ের যেমন খানিকটা মিল দেখা যায়, খানিকটা যায় না, এ সেই রকম। বৈদিক ভাষা হতেই সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়েছে। বৈদিক ভাষা মা, সংস্কৃত ভাষা মেয়ে।

এই ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলা হত এই কারণে যে বেদ এই ভাষায় লিখিত হয়েছিল। বেদ পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন লিখিত গ্রন্থ। সুতরাং তা-হতে, উপনিষদ কত প্রাচীন জিনিস খানিকটা অনুমান করা যায়। আমরা সহজে এইটুকু অনুমান ক'রে নিতে পারি যে বেদের যুগের শেষ ভাগেই উপনিষদ রচিত হয়েছে। সেই বেদের যুগ বুদ্ধের যুগ বা লিখিত ইতিহাসের যুগেরও শত শত বৎসর পূর্বের যুগ।

প্রাচীন উপনিষদগুলি বেদের যুগেই বেদের অংশরূপে গড়ে উঠেছিল। তাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। সেই ঘনিষ্ঠতা কতখানি গভীর সে সম্বন্ধে

আমাদের একটা ধারণা ক'রে নেওয়া দরকার। সেই কারণে, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই বেদের উৎপত্তি। ধর্মের প্রধান উৎস হল বিশ্বের মূল শক্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি। সে আকুতি অভিব্যক্তি পায় নানা জাতির মধ্যে নানা ভাবে। কেহ প্রতীক রেখে তাঁকে পূজা করেন, যেমন পৌরাণিক হিন্দুধর্মে। কেহ প্রতীক না রেখে পরম সত্তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যেমন খ্রীষ্টধর্মে গির্জায় উপাসনার ব্যবস্থা। আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পথ নির্বাচন করেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষে যেখানে সেকালের ঋষি শক্তির বা সৌন্দর্যের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, তার ওপরেই দেবত্ব আরোপ ক'রে তাঁরা স্তোত্র রচনা করেছেন। সেই স্তোত্রের নাম হল সূক্ত। এই ভাবে অগ্নি দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, বায়ু অধিষ্ঠিত হয়েছেন, জলের দেবতা বরুণ অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আকাশের সূর্য মহাশক্তির উৎস। তিনিও দেবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভোরবেলাকার আকাশের রাঙিমা ঋষির মনকে সৌন্দর্যে মুগ্ধ করেছে, তিনি তাকে ঊষা নামে অভিহিত ক'রে দেবত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ'দের উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র বা সূক্ত রচিত হয়েছে তাই নিয়েই বেদের জন্ম।

বেদের এই মূল অংশকে বলা হয় সংহিতা। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে অন্য অংশ যুক্ত হয়েছে। বেদের সূক্তগুলি রচিত হয়েছে প্রাচীন ভাষায়। বেদে তা ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমরা তাকে বৈদিক ভাষা বলি। এখন শ্রদ্ধা নিবেদন কেবল স্তোত্র পাঠেই হয় না। তার সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক ক্রিয়া থাকে। বৈদিক যুগে সেই আনুষ্ঠানিক অংশ প্রধানত রূপ নিত যজ্ঞানুষ্ঠানের। এই যজ্ঞের উপকরণ খুব সরল ছিল। একটি বেদী নির্মিত হত। তার ওপর কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালান হত। সেই সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রপাঠ হত বা সুর-সংযোগে তা গাওয়া হত। তার সঙ্গে অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হত। তাই জন্য অগ্নিকে অভিবাদন করা হত 'পুরোহিতম্' বলে, 'যজ্ঞস্য ধাতবম্' বলে।

এখন এই যজ্ঞ করতে একাধিক মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেহ স্তোত্র পাঠ করেন। তাঁকে বলা হয় 'হোতা'। কেহ স্তোত্র পাঠ না ক'রে গান করেন। তাঁকে বলা হয় 'উদ্গাতা'। কেহ অগ্নিতে আহুতি দেন। তাঁকে বলা হয় 'অধ্বর্যু'। তাঁদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন কাজ। এই ভাবে যজ্ঞের নানা দিক এসে পড়ে। তার জন্য বিধিবদ্ধ বিধান চাই। বেদের যে অংশে এই বিধানগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় ব্রাহ্মণের প্রধান আলোচ্য বস্তু হল যজ্ঞবিধি। যজ্ঞও কত বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল। কোনোটিকে বলা হত 'অগ্নিষ্টোম', কোনোটি 'জ্যোতিষ্টোম', কোনোটি 'বিশ্বজিৎ'। আবার কতদিন ব্যেপে একটি যজ্ঞ স্থায়ী হত তার ভিত্তিতেও বিভিন্ন নামকরণের

ব্যবস্থা হত। যেমন যে যজ্ঞগুলি বারো দিনের অধিক স্থায়ী হত তাদের সত্র বলা হত। ব্রাহ্মণে এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সুতরাং বেদের দুটি মূল অংশ, একটি সংহিতা, অপরটি ব্রাহ্মণ। সংহিতা মূল জিনিস। তাতে থাকত বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত প্রশস্তি। তা বৈদিক ভাষায় রচিত। আর তার বিভিন্ন যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রয়োগ-বিধি সম্পর্কে যে রচনা, তা হল ব্রাহ্মণ। তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

আমরা চারটি বেদের নাম শুনেছি, ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। কিন্তু এই বেদগুলির পারস্পারিক সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্রে ঠিক এক ধরনের নয়। ঋক, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, অনেকটা একই পরিবারের কন্যার মত। অথর্ব বেদ কিন্তু বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। তা যেন ভিন্ন পরিবারের মেয়ে। ঠিক বলতে কি এক কালে তিনটি বেদই ছিল এবং তখন অথর্ব বেদের সম্ভবত অস্তিত্ব ছিল না। সেকালে বেদকে তাই 'ত্রয়ী' বলা হত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে তার কথা।[৬] এই ঋক, সাম ও যজুঃ বেদের পারস্পারিক সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, তা বেশ বোঝা যায় তাদের সংহিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করলে।

মোটামুটি বলা যায় যে এই তিন বেদের মূল হল ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদের যে শাখা বা সংকলনটি বিশেষ সম্মানিত তাকে বলা হয় শাকল শাখা। এই শাখায় দশটি মণ্ডলে দশ হাজারের ওপর মন্ত্র বা ঋক্‌ আছে। এগুলি সবই পদ্যে রচিত।

সামবেদ কোনো স্বতন্ত্র রচনা নয়। সামবেদের প্রধান শাখার ১৬০৩টি মন্ত্রের মধ্যে ১৫০৪টিই ঋগ্‌বেদ থেকে নেওয়া। এই দুই বেদের পার্থক্য হল বিষয় সম্পর্কে নয়, তার ব্যবহারের রীতি সম্পর্কে। ঋগ্‌বেদের মন্ত্র যজ্ঞে পাঠ হত, কিন্তু সামবেদের মন্ত্র যজ্ঞে গাওয়া হত। একই পদ্য আবৃত্তি হত ঋগ্‌-বেদের মন্ত্র হিসাবে আবার সঙ্গীত রূপে গাওয়া হত সামবেদের মন্ত্র হিসাবে। কাজেই মূলত তারা অভিন্ন।

যজুর্বেদের সহিত এদের একটু পার্থক্য আছে। আবার সাদৃশ্যও আছে। ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ সম্পূর্ণভাবে পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদ প্রধানত গদ্যে রচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যজ্ঞে যিনি আহুতি দেন তাঁকে বলা হত অধ্বর্যু। তিনি সে সময় যে মন্ত্র প্রয়োগ করতেন তাই আছে যজুর্বেদে। তা হল আহুতি সম্পর্কে ব্যবহৃত মন্ত্রের সংকলন। সেগুলি গদ্যে রচিত। তবে যজুর্বেদে ঋক্‌ সংহিতার মন্ত্রও কিছু স্থান পেয়েছে।

সুতরাং ঋক্‌, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদে যে মন্ত্রগুলি পাই তারা দেবতার

---

[৬] যমৃষয়স্ত্রয়ীবিদো বিদুঃ ঋচঃ সামানি যজূংষি॥
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ॥

প্রতি প্রশস্তি নিবেদনের কাজে লাগে। এগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত এবং বৈদিক যজ্ঞবিধির অপরিহার্য উপাদান।

তাদের মধ্যে আর একটি বড় রকম সাদৃশ্য হল তাদের ব্রাহ্মণ অংশটির কাঠামো তিন বেদেই এক রকম। যদিও ব্রাহ্মণের সূত্রপাত হয়েছিল যজ্ঞবিধির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে, তার সঙ্গে স্বতন্ত্র ধরনের বিষয়ও কিছু যুক্ত হয়েছিল। এখানে যেটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সম্পর্কে ব্রাহ্মণের জন্ম হলেও, তার বিষয়বস্তু ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে মানসিক মনন বিষয়ক ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়েছে। প্রথমে দেখি ব্রাহ্মণ সুরু হয়েছে যাগ-যজ্ঞাদির বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা দিয়ে। পরে দেখা যায় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণের শেষের অংশে বাস্তব যজ্ঞক্রিয়া আর আলোচনার বিষয় নয়। তার স্থান নিয়েছে বাস্তব উপাচারবিহীন যজ্ঞের আলোচনা। এমন কি যজ্ঞের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণের যে অংশে বিষয়বস্তু এইভাবে রূপান্তরিত হল তাকে বলা হয় আরণ্যক। বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেছেন এই অংশ অরণ্যে পড়তে হত বলে তার নাম আরণ্যক। সম্ভবত গার্হস্থ্য আশ্রম শেষ ক'রে মানুষ যখন বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করবার জন্য বনে এসে বাস করত, তখন এই বিষয়টি পাঠ ও আলোচনা হত। তাই এর নাম আরণ্যক। আরণ্যকের স্তরে ব্রাহ্মণে বাস্তব যাগ-যজ্ঞাদির আলোচনা ত্যাগ ক'রে মানসিক উপাদানের ভিত্তিতে যাগ-যজ্ঞাদির বিষয় অবতারণা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে 'মহাব্রত' নামে এক যজ্ঞের রহস্য-ব্যাখ্যা আছে। এই বেদেরই শাঙখায়ন আরণ্যকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। যজ্ঞাদির সহিত সম্পর্করহিত বস্তুরও যে আলোচনা আছে তারও উদাহরণ পাই এই আরণ্যকে। এখানে স্বপ্নফলের বর্ণনাও স্থান পেয়েছে।

আবার দেখা যায় পরবর্তী অবস্থায় নূতন ক'রে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় না আছে বাস্তব যাগ-যজ্ঞাদির ব্যাখ্যা, না আছে উপকরণ-বিহীন আধ্যাত্মিক যাগ-যজ্ঞাদির ব্যাখ্যা। তাদের স্থান নিয়েছে স্বতন্ত্র বিষয়। সেখানে আছে অবিমিশ্র দার্শনিক আলোচনা। এখানে যজ্ঞকর্ম ত্যাগ ক'রে মননকর্মে মন দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণের এই অংশকেই উপনিষদ বলে। এই-ভাবে ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি ক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। এটি হল ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের ইতিহাস। প্রথমে বাস্তব যজ্ঞ হতে আধ্যাত্মিক যজ্ঞ এবং পরে আধ্যাত্মিক যজ্ঞ হতে দার্শনিক আলোচনা। উপা-সকের মন এইভাবে আনুষ্ঠানিক ধর্ম হতে দার্শনিক তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে ব্রাহ্মণে কর্মকান্ড হতে জ্ঞানকান্ডে গিয়ে মানুষের মন

উত্তীর্ণ হয়েছে। বিষয়বস্তুর এই পরিবর্তনটি ঘটেছে খুব ধীরে ধীরে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে আরণ্যকে যজ্ঞের সহিত সম্পর্করহিত বিষয়েরও আলোচনা পাওয়া যায়। ঠিক সেইরকম এমনও দেখা যায় যে যদিও উপনিষদের বিষয়বস্তু দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা, সেখানে যজ্ঞের আধ্যাত্মিক আলোচনারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ঊষাকে অশ্বমেধ যজ্ঞরূপে বর্ণনার কথা উল্লেখ করতে পারি। যা আরণ্যকের বৈশিষ্ট্য তা উপনিষদের মধ্যেও পাওয়া যায়। তার কারণ, দুই অবস্থার সন্ধি-ক্ষণে বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিকরকম প্রকট হয় না।

এইভাবে যা ছিল ধর্মবিষয়ক আলোচনা, তা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে কথা খাটে, ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধেও মোটামুটি সে কথা খাটে। ঋগ্‌বেদ সুরু হয়েছিল নানা দেবতার প্রশস্তি দিয়ে, কিন্তু সেখানেও দেখা যায় দার্শনিক বিষয়বস্তুও স্থান পেয়েছে। প্রথমে দার্শনিক প্রশ্ন বা আলোচনা উঠেছে বিক্ষিপ্ত আকারে, শেষের দিকে দার্শনিক আলোচনা বেদের মধ্যেই বেশ সম্মানিত স্থান পেয়েছে। তার দু-একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঋগ্‌বেদের শাকল শাখায় দশটি মণ্ডল আছে। তার প্রথম মণ্ডলেই দেখা যায় দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

"এই যে সৃষ্টি,
কোথা হতে তার উৎপত্তি হল?
এর উত্তর কে জানে,
এ বিষয় কে বলেছে?"[৭]

প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন শক্তির উৎস বিভিন্ন দেবতারূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁদের জন্য ঋগ্‌বেদে প্রশস্তি রচিত হয়েছে। তারই মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখি এই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে ঋষির মনে প্রশ্ন জেগেছে। তিনি তার উত্তরও দিয়েছেন এবং তাও ঋগ্‌বেদের এই প্রথম মণ্ডলেই স্থান পেয়েছে। এটিও একটি দার্শনিক আলোচনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আলোচনাটি এইরকম,

"সেই এককে পণ্ডিতেরা বহুনামে অভিহিত করেন—
ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলেন।
আবার সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী (সূর্য)ও বলেন।
যম বা মাতরিশ্বাও বলেন।"[৮]

---

[৭] কোহদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আবভূব কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১॥ ৩০॥৬

[৮] ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নি যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥
ঋগ্‌বেদ॥ ১॥ ১৬৪॥ ৪৬

সুতরাং ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলেই বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনাকেও বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়।

শেষের দিকে, বিশেষ ক'রে দশম মণ্ডলে গিয়ে দেখা যায় যে দার্শনিক আলোচনা সেখানে নিজের জন্য বিশিষ্ট স্থান ক'রে নিয়েছে। এই সম্পর্কে দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম সূক্তটি হল 'পুরুষ সূক্ত'। এখানে সমগ্র সৃষ্টিকে একই বিরাট পুরুষের অঙ্গ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি এত বিরাট যে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রেও তাঁর শেষ হয় না।[৯] এই বিরাট পুরুষই উপনিষদে গিয়ে ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়েছেন। ব্রহ্মের অর্থও ত বিরাট।

অন্য সূক্তটির নাম নাসদীয় সূক্ত, কারণ তার আরম্ভ 'নাসদাসীৎ' এই কথা দিয়ে। এর আলোচ্য বিষয়, সৃষ্টি কি ক'রে হল, দর্শনের এই মূল প্রশ্নখানি। এই সূক্তে সেই প্রশ্নখানি উত্থাপিত হয়েছে, তার উত্তর দেবারও চেষ্টা হয়েছে।

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এই ভাবে,

"কোথা হতে এল এই বিসৃষ্টি
কেহ কি সৃজিল কিংবা কেহ নয়?
পরম ব্যোমেতে যিনি অধিপতি
তিনি বা জানেন হয়ত বা নয়।"[১০]

উত্তর দেবার চেষ্টায় যা বলা হয়েছে তার দার্শনিক মূল্যও কিছু আছে। সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া করেন তা অব্যক্ত অবস্থায় ছিলেন এইরূপ বলা হয়েছে,

"নাহি ছিল সৎ না ছিল অসৎ
নাহি ব্যোম নাহি বায়ু বা তখন।
কি ছিল কোথায় কাহার অধীন?
তাহা কি গো জল গভীর গহন?
না ছিল মরণ, নাহি অমরণ,
না ছিল রাত্রি, নাহি ছিল দিন।
নিজ বলে বলী ছিল একজন
না ছিল অপর তাহা হতে ভিন।"[১১]

তার পর বলা হয়েছে অসৎ-এর মধ্যেই সম্ভাবনার অঙ্কুর নিহিত ছিল এবং সেই অব্যক্ত শক্তির মধ্যে যখন আত্মপ্রকাশের কামনা জাগল, তখনি সৃষ্টির প্রবাহ প্রবর্তিত হল। এইভাবে বেদ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে রচিত হয়েও ক্রমশ এক

---

[৯] স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যাতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌॥
ঋগ্‌বেদ॥ ১০॥ ৯০॥ ১

[১০] ঋগ্‌বেদ॥ ১০॥ ১২৯॥ ৯

[১১] ঋগ্‌বেদ॥ ১০॥ ১২৯॥ ৬—২

অজ্ঞাত শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণে দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং বেদ অবিমিশ্র ধর্মগ্রন্থ নয়, দর্শনের গ্রন্থও বটে। তা মানুষের প্রথম দার্শনিক আলোচনারও নিদর্শন।

মূল গ্রন্থ বেদে যে শক্তি ক্রিয়া করেছে, তার আনুষঙ্গিক রচনা ব্রাহ্মণে তার প্রভাব আরও ক্রিয়াশীল হয়েছে। সেই কারণেই দেখা যায় যে ক্রমবিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণ পরিবর্তিত হয়েছে আরণ্যকে এবং আরণ্যক পরিবর্তিত হয়েছে উপনিষদে। ব্রাহ্মণ অবিমিশ্রভাবে যজ্ঞক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে জড়িত। আরণ্যক বাস্তব উপকরণের সাহায্যে যজ্ঞের আলোচনা বর্জন ক'রে আধ্যাত্মিক যজ্ঞের আলোচনা করেছে, আবার যজ্ঞের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক-রহিত বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছে। উপনিষদে দার্শনিক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিশ্বের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের পিপাসাই তার প্রেরণা এবং সে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তন ও আলোচনা তার বিষয়বস্তু। এইভাবে যা ছিল ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা তা দর্শন-বিষয়ক আলোচনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই তিন খানি বেদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। উপরের আলোচনা হতে তা সমর্থিত হবে। প্রথম লক্ষণ, তিন বেদেরই মন্ত্র আংশিকভাবে ঋগ্‌বেদ হতে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষণ, তিন্ বেদেরই ঘনিষ্ঠভাবে যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ আছে। ঋগ্‌বেদের সম্পর্ক যজ্ঞের হোতার সহিত, সামবেদের সম্পর্ক যজ্ঞের উদ্গাতার সহিত এবং যজুর্বেদের সম্পর্ক যজ্ঞের অধ্বর্যুর সহিত। এই ঘনিষ্ঠতার আরও একটি সমর্থন পাই ব্রাহ্মণ হতে। এই তিনটি বেদের প্রত্যেকটির সহিত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সংযুক্ত আছে। প্রাচীন উপনিষদগুলির এইভাবেই উৎপত্তি হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ। ঐতরেয় উপনিষদ ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অংশ। আর বৃহদারণ্যক উপনিষদ শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ।

সুতরাং একথা বলা চলে যে এই ত্রয়ী বা তিন বেদের পরস্পরের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য যে তারা একই পরিবারের মেয়ে কেন, তারা একই জননীর সন্তানের মত। তাদের মধ্যে মিলের অভাব যৎসামান্যই এবং সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী। এই ত্রয়ী যেন তিন ভগিনী।

অথচ চতুর্থ বেদ অথর্বের সঙ্গে এদের মিল হতে অমিলই বেশী। অথর্ব বেদের কিছু অংশ গদ্যে রচিত, কিছু অংশ পদ্যে রচিত। সেটা বড় কথা নয়। তিন বেদের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য হল উদ্দেশ্যগত। তিন বেদের উদ্দেশ্য দেবতাকে প্রশস্তি নিবেদন, অথর্ব বেদের উদ্দেশ্য হল সংসারে মানুষের বৈষয়িক উন্নতিবিধান। ত্রয়ীর সম্পর্ক ধর্মের সহিত, অথর্ব বেদের সম্পর্ক ব্যবহারিক জীবনের সহিত। বেদের ভাষায় বলা যায় ত্রয়ীর সম্পর্ক শ্রৌত-কর্মের সহিত, আর অথর্ব বেদের সম্পর্ক গৃহ্য-কর্মের সহিত।

শুধু তাই নয়। ত্রয়ীর সঙ্গে অথর্ব বেদের এক বিষয়ে বড় রকম পার্থক্য আছে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদের প্রত্যেকটির সহিত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ সংযুক্ত। কিন্তু অথর্ব বেদের সহিত তাদের সম্পর্ক বড় নেই। অথর্ব সংহিতায় একটি মাত্র ব্রাহ্মণ আছে। তার নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। কিন্তু তার বিষয়বস্তু অন্য বেদের ব্রাহ্মণ হতে ধার করা। অথর্ব সংহিতার সহিত কোনো আরণ্যক বা উপনিষদ সংযুক্ত নয়। তার অর্থ হল, না ধর্ম না দর্শনের সহিত অথর্ব বেদের সংযোগ আছে।

অথর্ব সংহিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায় তার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হতেই। অথর্ব অর্থে বুঝি ঐহিক সমৃদ্ধি। এই সংহিতার সম্পর্কও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাতে যা আলোচিত হয়েছে তার সম্বন্ধ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সহিত। আয়ুষ্য বা আয়ু বৃদ্ধি কি ক'রে হয়, ভৈষজ্য বা রোগের প্রতিষেধক কি, শান্তিক বা ভূতের উপদ্রব কি ক'রে দূর করা যায়, আভি-চারিক বা শত্রুনাশের উপায় কি—এই ধরনের বিষয় তার আলোচ্য বস্তু।

সুতরাং দেখা যায় যে ত্রয়ীর সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক নেই। ত্রয়ী যদি হয় তিন ভগিনীর সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত, অথর্ব হবে ভিন্ন ঘরের মেয়ে। এই সব দেখে মনে হয় এক কালে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি সংহিতাই বেদ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং অথর্ব বেদ বেদের মর্যাদা পেয়েছে অনেক পরে। এক কালে আভিজাত্য বৃদ্ধির জন্য রামায়ণ, মহাভারতকেও ত পঞ্চম বেদ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

উপনিষদ এইভাবে বেদের কোলেই জন্মগ্রহণ করেছিল। উপনিষদের পরি-ভাষাগত অর্থও বোধ হয় তাই। কিন্তু নানা পণ্ডিতের উর্বর মস্তিষ্ক-শক্তির প্রয়োগের ফলে তার অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচারিত হয়ে ব্যাপারটি জটিল হয়ে পড়েছে। ফলে উপনিষদের অর্থ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ডয়সেন উপনিষদকে রহস্যগত জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[১২]

বিখ্যাত ভারতীয় শাস্ত্রবিৎ ম্যাকস্মুলার বলেছেন গুরুর নিকট বসে উপ-নিষদ আলোচিত হত বলে তার এই নাম। তিনি বলেছেন,

"প্রথমে উপনিষদ বোঝাত একটি সভা, বিশেষ ক'রে এমন সভা যেখানে গুরু হতে একটু ব্যবধান রক্ষা ক'রে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ঘিরে সমবেত হত।"[১৩]

অষ্টোত্তর শত উপনিষদের সংকলনে পণ্ডিত বাসুদেব শর্মা যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এইরূপ : উপ অর্থে গুরুর উপদেশ হতে লব্ধ, নি অর্থে নিশ্চিত-রূপে জ্ঞান, আর সদ্ অর্থে যা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। তা হলে

---

১২ Deussen, *Philosophy of the Upanishads*, p. 14-15.
১৩ Maxmuller, *Sacred Books of the East*, Vol. I, p. ixxxi.

অর্থ দাঁড়ায়—গুরুর নিকট হতে লব্ধ যে নিশ্চিত জ্ঞান জন্ম মৃত্যুর বন্ধন খণ্ডন করে।

আমরা মহামনীষী শংকরাচার্যেরও একটি ব্যাখ্যা পাই। তা অনেক বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেটি পাই তাঁর লিখিত তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যের গোড়ায়। তা এই বলে, "ব্রহ্মজ্ঞানকে উপনিষদ বলা হয়, কারণ যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, কিংবা তার একেবারে উচ্ছেদ সাধন করে, কিংবা শিষ্যকে ব্রহ্মের সন্নিধানে উপস্থিত করে, কিংবা তার মধ্যে পরব্রহ্ম সন্নিবিষ্ট আছেন বলে।"

এই সব কটি ব্যাখ্যাতেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেটা অসঙ্গতও কিছু নয়। তবে ধাতুগত অর্থের দুই বিভিন্ন সূত্র ধরে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর মত জন্মগ্রহণ করেছে। সদ্ অর্থে উপবেশন ধরে তার ভিত্তিতে ডয়সেন ও ম্যাক্সমুলার ব্যাখ্যা করেছেন। সদ্ অর্থে বিনাশ করে বা ছেদন করে এই অর্থের ভিত্তিতে বাসুদেব শর্মা ব্যাখ্যা করেছেন। শংকরের ব্যাখ্যা বিকল্প দুই বিভিন্ন অর্থের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। আমরা এখন এই ব্যাখ্যা-গুলির আলোচনা করব।

অর্থের ব্যাখ্যা করা উচিত উপনিষদ যে কালে রচিত সেই কালের ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রেখে। তা যদি হয়, তা হলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদন বা বিনাশ সাধন, এই ধরণের ব্যাখ্যার প্রয়োগের কোনো অবকাশ থাকে না। সংসারবন্ধন ছেদন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ তখনি জাগে, যখন পরজন্মবাদের ওপর মানুষের দৃঢ় প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদের যুগে, যে যুগে উপ-নিষদের জন্ম হয় সে যুগে জন্মান্তরবাদ ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। উপনিষদের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে তার বীজ থাকতে পারে, কিন্তু পরজন্ম আছে, এই ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস তখনো মানুষের মনে জাগে নি। পরবর্তী কালে ষড়্দর্শনের যুগে তা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিশ্চিত। কিন্তু উপনিষদের যুগে না পরজন্মবাদ, না জীবন-বন্ধন হতে মুক্তিস্পৃহা, কোনটিই মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ষড়্দর্শনের যুগে দার্শনিক জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায়রূপে পরিগণিত হত। উপনিষদের যুগে দার্শনিক জ্ঞানের বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল না। জানার জন্যই জানা সেখানে প্রেরণা, ব্রহ্মকে জানাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং উপনিষদের সহিত জন্ম-বন্ধন নাশের সংযোগ স্থাপন ক'রে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বাহির করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

ম্যাকস্মুলার বা ডয়সেন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গুরুর নিকটে বসে শিক্ষা লাভ হত এই ধারণার ভিত্তিতে। কিন্তু উপনিষদের যুগে প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেই উপনিষদ আলোচনার যে রীতি দেখতে পাই, তার দ্বারা তা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয় না। সেখানে দেখা যায় যে উপনিষদ আলোচনায় গোপনীয়তাও রক্ষা হত না এবং গুরুর নিকটে বসে আলোচনাতেও তা সীমাবদ্ধ থাকত না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে উপনিষদের দার্শনিক আলোচনা একটি প্রকৃষ্ট চিত্তবিনোদনের উপায় বলে গৃহীত হয়েছে। রাজা জনক প্রকাশ্য সভায় বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে উপনিষদের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। যে দার্শনিক বিতর্কে অন্যদের পরাস্ত করতেন, তাঁকে তিনি পুরস্কার দিতেন। এই জন্য তাঁর খ্যাতি বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। গল্প আছে যে সেই কারণে তাঁর অজাতশত্রু নামে প্রতিবেশী রাজা ভারি ঈর্ষাবোধ করেছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য নিজেও দার্শনিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন।

শুধু তাই নয়। উপনিষদের যুগে ব্রহ্মজ্ঞান একটি নির্বাচিত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। বরং উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মবিদ্যাকে সকলের মধ্যে প্রচার করবার জন্য উৎসুক ছিলেন দেখা যায়। বয়সের অল্পতা বা নারীত্ব বা নিকৃষ্ট কুলে জন্ম, কোনোটিই বাধা বলে স্বীকৃত হত না। কঠ উপনিষদের নচিকেতার গল্পে পাই সামান্য বালকও যমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই পাই যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজিত হবার মুখে তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তির অংশ দিতে চেয়েছিলেন, তিনি তার পরিবর্তে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাতে যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছাও পূর্ণ করেছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পাই, পিতৃ পরিচয় দিতে অক্ষম হলেও সত্যকামকে গৌতম ঋষি শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। সে গল্প রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সরস রূপে অনেকের পরিচিত হয়েছে।

সুতরাং এই সব কারণে উপনিষদের জ্ঞানের প্রচারে কোনো বাধা থাকতে পারে না। তবে যেটুকু বাধা থাকতে পারে তা তার বিষয়বস্তুর জটিলতা-হেতু। বিশ্বের মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা ত জটিল হবেই। সেই কারণে পরম তত্ত্বের পথকে উপনিষদের ঋষি "ক্ষুরের ধারার ন্যায় নিষিত, দুরতিক্রমণীয় ও দুর্গম" বলে বর্ণনা করেছেন।[১৪] উপনিষদের আলোচ্য বিষয় সেই কারণেই অনেকের নিকট বোধশক্তির অতীত হয়ে পড়ে। সেটা কোনো বিধি-নিষেধের প্রভাবে নয়, বিষয়ের গুরুত্ব হেতুই তা ঘটে থাকে। উপনিষদের জ্ঞানকে রহস্য বলে যদি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, তাও সেই কারণে। রহস্যে, একান্তে তার আলাপের বিধি আছে বলে তা রহস্য নয়; তার তথ্যগুলি নিগূঢ় এবং সুগভীর চিন্তাসাপেক্ষ, সেই কারণেই তা রহস্য। সুতরাং ডয়সেনের ব্যাখ্যাও উপনিষদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে না।

আসলে ভুল হয়েছে এই যে উপনিষদ কথাটির সহজ, সরল, স্বাভাবিক

---

[১৪] ক্ষুরস্য ধারা নিষিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ কঠ॥ ১॥ ৩॥ ১৪

অর্থ, আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ দাঁড়ায়, সে অর্থের প্রতি দুর্ভাগ্যক্রমে কারও দৃষ্টি পড়ে নি। সকলেই এই কথাটির মধ্যে একটি গূঢ় অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। ফলে জটিল অর্থ তাঁদের মনে ঠেকেছে, কিন্তু সহজ অর্থটি কারও চোখে পড়ে নি।

উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত, আমরা জানি। এই বেদান্ত অর্থে পরবর্তী কালে আমরা কয়েকটি বিশেষ দার্শনিক মতকে জেনেছি। আসলে কিন্তু সেই মতগুলি মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত। এই ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্তি উপনিষদের তত্ত্বগুলিকে একত্র সাজিয়ে স্থাপন করবার চেষ্টা হতেই হয়েছে। এই বিভিন্ন মতগুলি আবার সেই ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য হিসাবে গড়ে উঠেছে। সেই কারণে তাদের নাম 'বেদান্ত দর্শন' হয়েছে।

আসলে কিন্তু উপনিষদকেই বেদান্ত বলা হয়ে থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা তার সমর্থন পাই। তার শেষে আছে, "পুরাকালে পরম গুহ্য এই তত্ত্বটি বেদান্তে প্রচারিত হয়েছে।"[১৫] তুলনায় অপ্রাচীন হলেও শ্বেতাশ্বতর বিশিষ্ট উপনিষদগুলির অন্যতম। তারও পূর্বে বেদান্ত কথাটির উল্লেখ হয়ে থাকলে প্রাচীনতম উপনিষদগুলিরই সমার্থ-বোধক বলে তাকে ধরে নিতে হবে। উপনিষদের বেদান্ত বলে নামকরণ করবার কারণ এই যে তা বেদের অন্তে স্থাপিত। আমরা জানি সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, এই দুই অংশ নিয়ে বেদ এবং ব্রাহ্মণের শেষ অংশ জুড়ে আছে উপনিষদ। সুতরাং বেদের শেষে তার স্থিতি বলেই তাকে বেদান্ত বলা হয়। বর্তমান লেখকের মতে উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত এবং পারিভাষিক অর্থও তাই। বেদের শেষে তার অবস্থিতি বলেই তার নাম উপনিষদ, অন্য কোনো কারণে নয়। উপনিষদ শব্দটি বেদান্তের সমার্থবোধক শব্দমাত্র।

এই সম্পর্কে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধারণ দর্শন যে ভাবে লিখিত হয়ে থাকে উপনিষদের দর্শন সে ভাবে গড়ে ওঠে নি। সাধারণ দার্শনিকের সত্যানুসন্ধান মার্গকে আমরা বিচার-মার্গ বলতে পারি। মনের যে অংশ চিন্তা করে কেবল সেই অংশকেই অবলম্বন ক'রে তিনি সত্য সন্ধান করেন। মনের অনুভূতি বৃত্তির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। আপাতদৃষ্টিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা দর্শন করি তাও দর্শন, কিন্তু দার্শনিকের দর্শন বিভিন্ন বস্তু। তিনি গভীরতর দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুর অন্তরের সত্যকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় বিচার-মার্গই তাঁর একমাত্র অস্ত্র। এই বিচার-মার্গ বৈজ্ঞানিকও সত্যানুসন্ধানের কার্যে প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

---

[১৫] বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্‌ ॥
শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬ ॥ ২২

তবে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার পদ্ধতির একটু বিভিন্নতা আছে। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয় সীমাবদ্ধ। কাজেই সেখানে কৃত্রিম উপায়ে অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে গবেষণা সম্ভব হতে পারে। দার্শনিকের আলোচনার বিষয় কিন্তু যেমন অসীম তেমন জটিল। বিশ্ব-সম্বন্ধে যা কিছু মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে সবই তাঁর আলোচনার বিষয়। কাজেই সেখানে পরীক্ষামূলক গবেষণার সুযোগ নেই। তাই দার্শনিককে অধিকমাত্রায় কেবল যুক্তি ও চিন্তার ওপর নির্ভর করতে হয়। এইভাবে চিন্তা ক'রে তিনি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্যগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে, যুক্তি দিয়ে সমর্থন ক'রে প্রকাশ করেন।

উপনিষদের দর্শন কিন্তু এইভাবে রচিত হয় নি। তার কারণ উপনিষদের ঋষি খানিকটা কবি, খানিকটা দার্শনিক। তিনি বিভিন্ন সমস্যাকে পৃথক্ ক'রে নিয়ে কেবল বিচার-মার্গের সাহায্যে তার সমাধানে তথ্যগুলিকে সাজান নি। বিশ্বের নানা সমস্যা সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেছেন, ভেবেছেন, তার পর যা উপ-লব্ধি করেছেন, তা অনেক সময় কবিসুলভ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে বিভিন্ন বাণীর মধ্যে কোনো সংযোগ নেই, বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্ আলোচনাও নেই। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন মনীষী যা উপলব্ধি করেছেন, উপনিষদের পাতায় তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং উপনিষদের দর্শনকে এক জায়গায় সাজান অবস্থায় কোথাও পাই না। তাকে পেতে হলে আমাদেরই গড়ে নিতে হবে। এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দর্শন তত্ত্বের কণাগুলি যেন একটি ছিন্ন হারের ছড়ান মুক্তা। তাদের খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে। তারপর সুতো দিয়ে গ্রথিত করতে হবে। তবেই সমগ্র হারখানি পাওয়া যাবে। উপ-নিষদের বিচ্ছিন্ন ভাবধারাগুলিকে যুক্তিসম্মতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তবেই আমরা তার সমগ্র রূপখানি পেতে পারি।

উপনিষদের এই অসংলগ্ন ভাবধারাগুলিকে সজ্জিত ক'রে একটি পূর্ণ দার্শনিক মতের আকার দেবার প্রয়োজনীয়তাবোধ প্রাচীন কালেই হয়েছিল। তাকে সুসংবদ্ধভাবে সাজানর চেষ্টাও হয়েছিল। ব্রহ্মসূত্রের ত এইভাবেই জন্ম। মহর্ষি বেদব্যাস এই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু একটি বিভ্রাট ঘটে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক সফল হতে পারে নি।

সেকালে লিখিত আকারে পুস্তক সংরক্ষণ করা সম্ভব হত না। সেকালে আরও একটা ধারণা ছিল যে বোঝার চেয়ে শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করা ভাল জিনিস, কারণ, "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী", শাস্ত্রের আবৃত্তি তা বোঝা থেকে উত্তম জিনিস। সেই কারণে সূত্রে রচনা-পদ্ধতির জন্ম হয়। বর্তমান-কালে বিজ্ঞানে প্রযুক্ত বিভিন্ন 'ফরমুলা'ও এই কারণে সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিস্তারিত ভাবকে সংক্ষিপ্ততম আকার দেওয়া। সূত্রের আকার যত সংক্ষিপ্ত হয় তত তার সার্থকতা বেশী, কারণ তাতে মুখস্থ করবার পরিশ্রম কমে যায়। কালে এই সংক্ষিপ্ত করার নেশা সেকালের পণ্ডিতদের এমন ক'রে

পেয়ে বসেছিল যে সংক্ষেপ-করণটাই তাঁদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সূত্রের অর্থবোধ হয় কি হয় না, সে বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। একটি সূত্র হতে একটি মাত্র অক্ষরকে বর্জন করতে সক্ষম হলে তাঁরা নাকি পুত্রসন্তানপ্রাপ্তির সমান আনন্দের অধিকারী হতেন।

এ থেকে বোঝা যাবে তাঁদের ঝোঁক ছিল কোন পথে। সংক্ষেপ-করণটা গৌণ বস্তু, তার সার্থকতা স্মরণশক্তিকে সাহায্য করায়, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য হল, যতই সংক্ষিপ্ত আকারে হক, আলোচ্য বিষয়টি বোধগম্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা। কিন্তু কার্যগতিকে হয়ে গেল ঠিক বিপরীত। মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে তাঁরা গৌণ উদ্দেশ্যকেই সম্মান দেখালেন বেশী। ফলে সূত্র এমন আকার নিল যে তার অর্থ করা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে উঠল। তার ভাষ্য বা টীকা ভিন্ন তার অর্থ বোধগম্য হল না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের ভাষ্যে এবং টীকায় তার বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখা গেল। এইভাবে মূল গ্রন্থকারের বক্তব্য কি ছিল তা জানবার বিশেষ উপায় রইল না।

সূত্র রচনার এই আনুষঙ্গিক কুফলগুলি ব্রহ্মসূত্রেও বেশ দেখা দিয়েছিল। এখানেও সূত্র-আকারে তার অর্থ এমন দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াল যে ভাষ্য ভিন্ন তার অর্থ করা সম্ভব রইল না। এখানে অনেক সময় একই সূত্র একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায়, এরকম ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন অর্থে তার প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু কোথায় তার কি অর্থ, তা জানবার কোনো উপায় নেই। ফলে, ভাষ্যকারের কাজ হয়ে পড়ে জটিল। ব্যাখ্যার জন্য মোটামুটি তাঁকে সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই যে যার নিজের ভাষ্যে নিজের মতটি প্রতিবিম্বিত করেন। এরূপ ক্ষেত্রে এমন বিভ্রাট ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, নির্ভর করবার বা পথ দেখাবার যখন কিছু নাই, এবং সূত্রগুলি এমনি দুরূহ যে আলোকপাত ক'রে কোনো সাহায্য করতে তারা অক্ষম, তখন মানুষ নিজের বুদ্ধি বা ধারণাসম্মত অর্থকেই জ্ঞানে হক, অজ্ঞানে হক, তার প্রকৃত অর্থ বলে গ্রহণ ক'রে থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের বেলায় এই বিভ্রাট ঘটেছিল অতিমাত্রায় বেশী। এখানেও তার অর্থ ভাষ্য ভিন্ন বোধগম্য করা অসম্ভব হওয়ায় তার অর্থ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রূপে করেছেন। যাঁদের ভাষ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন শংকর, রামানুজ, মাধবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও নিম্বার্ক। এঁদের মধ্যে শংকরের ভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শুধু ব্রহ্মসূত্র নয়, তিনি প্রত্যেকটি প্রাচীন উপনিষদের ওপরও একটি ক'রে ভাষ্য লিখে গেছেন। এঁদের ব্যাখ্যাগুলি এমনি পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র যে তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক তত্ত্ব বলে স্থাপন করা যায়। এঁদের প্রত্যেকটি ভাষ্যই বেদান্ত দর্শন বলে খ্যাত, কারণ তারা মূলে সকলেই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের ব্যাখ্যা করে। আসলে কিন্তু তারা তা নয়। তারা প্রত্যেকেই যে মনীষী দ্বারা রচিত, তাঁর নিজের দার্শনিক

মতেরই পরিচয় দেয় মাত্র। প্রত্যেকটি ভাষ্য কি বিশেষ মত প্রকাশ করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে এইটুকু উল্লেখ করলেই চলবে যে এতগুলি যে বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে, তা ব্রহ্মসূত্রের অর্থের দুর্বোধ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হবে না।

এইসব দেখে মনে হয় মহর্ষি বেদব্যাস যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন তা যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তিনি উপনিষদের দর্শনকে একটি পূর্ণ, অখণ্ড আকার দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মনে যে আকারটি গড়ে উঠেছিল তা কেমন ছিল, ব্রহ্মসূত্রের দুরূহতায় আমাদের পক্ষে তা জানা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে রূপটি যে কি তা আন্দাজ করতে গিয়ে, বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন নূতন তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যেই যখন এমন মত-দ্বৈধ, তখন সূত্রকারের মতটি কি, তা জানার উপায় থাকে না। বরং এই ভাষ্যগুলি তা বুঝতে সাহায্য না ক'রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মোটামুটি পূর্বে যা বলা হয়েছে তাই ঘটেছে, অর্থাৎ গ্রন্থকারের মনের ভাব এমন আকারে লিপি-বদ্ধ হয়েছে, যে তার অর্থ করা দুঃসাধ্য। ফলে ভাষ্যকার নিজের বুদ্ধি এবং ধারণামতই ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে যে নূতন তত্ত্বগুলি সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি ততখানি আসল সূত্রকারের মত নয়, যতখানি যিনি ভাষ্যকার তাঁরই মত। তাদের সার্থকতাও সেই হিসাবেই। এই ব্যাখ্যাগুলির ফলে আমরা এতগুলি নূতন দার্শনিক তত্ত্ব লাভ করেছি। সেটি ত কম লাভের জিনিস নয়।

কিন্তু আসলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? মনে হয় তা হয় নি। উপনিষদ দর্শনের সমগ্র রূপটি কি, তা এখনও জানা বাকি রয়ে গেছে। অবশ্য এক হিসাবে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-গুলিকে উপনিষদ দর্শন বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ অবস্থাটিকে জটিল ক'রে তুলেছে। একটি সর্বজন-স্বীকৃত ব্যাখ্যা থাকলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাত নেই। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—এদের কোন্ মতটি উপ-নিষদের সঠিক ব্যাখ্যা করে। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেও ত আবার নূতন ক'রে উপনিষদের দর্শনখানিকে গড়ে তুলতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যকার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তাও সন্তোষজনক নয়। তাঁদের কেহই সোজাসুজি উপনিষদ হতে উপাদান সংগ্রহ করেন নি। উপনিষদের বিশ্লিষ্ট তত্ত্বগুলিকে সংগ্রহ ক'রে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে, তাঁরা উপনিষদের দর্শনটির রূপ দেবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মসূত্রকেই সোজাসুজি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এ যেন অপরের আঁকা একটি অতি অস্পষ্ট ছবিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন চিত্রকরের হাতে বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমাদের এই অস্পষ্ট ছবিকে অবলম্বন

করেই যে উপনিষদের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বা এ ব্যবস্থার কোনো সঙ্গত যুক্তিও নেই। আসল বস্তু উপনিষদই যখন হাতের কাছে পড়ে রয়েছে, তখন এক অস্পষ্ট ছবির সাহায্যে তার রূপটিকে ফুটিয়ে তোলবার ব্যর্থ প্রয়াসের প্রয়োজন কি? আসল বস্তু যদি পাওয়া সম্ভব না হত, তা হলে বরং এমন পথ অবলম্বন করার অর্থ হত। এক্ষেত্রে আসল বস্তু হতে উপাদান সংগ্রহ করাই সব থেকে যুক্তিযুক্ত। উপনিষদের বচন হতেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অসংবদ্ধ ভাবধারাগুলির যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে তাদের সাজিয়ে পূর্ণ দর্শনটি উদ্ধার করতে হবে।

এই পথে সন্তোষজনক ফললাভের আশা করবার একটি সঙ্গত কারণও আছে। ব্রহ্মসূত্র একটি বিশেষ ধাঁচে গড়া বস্তু। তার ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে উপনিষদের রূপকে ফোটাবার চেষ্টা করতে হলে, সেই ধাঁচটি বজায় রাখবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কথাটি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে বোধ হয় সুবিধা হতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, আমাদের কর্তব্য হল একটি কোনো বিশেষ বস্তুকে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে হবে। যে স্থানে এনে তাকে রাখব তার যদি কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকে, তা হলে আমাদের কাজে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু রাখবার স্থানটি যদি স্বল্পপরিসর হয়, তা হলেই আমাদের কর্মটি জটিল হয়ে পড়ে। আমাদের স্থাপনের বস্তুটি যদি তুলনায় বড় হয় তা হলে আর তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সেখানে স্থাপন করতে পারি না। আমাদের তখন চেষ্টা হবে তাকে সংকুচিত ক'রে তার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে, সেই স্বল্পপরিসর স্থানেই তাকে স্থাপন করা।

উপনিষদের দর্শনকে গড়ে তোলা এমনিতেই দুরূহ কাজ। তার ওপর তাকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্য দিয়ে পেতে চেষ্টা করলে, কাজ হয়ে পড়বে আরও কঠিন। সুতরাং তার প্রকৃত রূপটিকে পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন উপনিষদ হতে সোজাসুজি তার দর্শনের উপাদান সংগ্রহ করা। এইরূপে আলোচনার অবাধ স্বাধীনতার পরিবেশেই উপনিষদের দার্শনিক রূপটি স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্তি লাভ করবে। উপনিষদের ব্যাখ্যায় এই পথই অবলম্বন করব।

কথা উঠতে পারে উপনিষদের দর্শনকে নূতন ক'রে গড়ে তোলবার কোনো প্রয়োজন আছে কি? তার উত্তর আমাদের দেশের বর্তমান যুগের এক বিশিষ্ট মনীষী দিয়ে গেছেন। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতটি এই সূত্রে স্থাপন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাচীন উপনিষদ যে ভাবধারার বাহক তা শুধু উৎকৃষ্ট মননশীলতার পরিচয় দেয় না, তার মধ্যে একটি সঞ্জীবনী শক্তিও আছে। সেই কারণে, বর্তমানের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেছেন,

"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শ-

রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা, এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা বিপত্তি, দুর্গতি সুখ্যাতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"[১৬]

এই সঞ্জীবনী ভাবধারার সহিত বর্তমান ভারতের সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন এবং সেই কারণে উপনিষদের বাণীর প্রচার চেয়েছিলেন। কারণ, ভারতীয় ভাবধারার মূল সূত্রগুলির উৎপত্তি হয়েছে উপনিষদের বাণীতে। তিনি তাই লিখেছিলেন,

"আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃত বার্তা।"[১৭]

উপনিষদগুলিকে অবলম্বন ক'রে সত্যই এমন কয়েকটি ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল যা সত্য, প্রেম ও মঙ্গলকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করেছে। সেই কারণেই তার মধ্যে আনন্দ এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তার একটি পাবনী শক্তি আছে। তার সংস্পর্শ মানুষের মনকে একটি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনতা, হিংসা প্রভৃতির কলুষ স্পর্শ হতে মুক্ত করতে পারে। উপনিষদের দর্শনের প্রচারের সেই কারণে প্রয়োজনীয়তা আছে। এই যুক্তিকেই যথেষ্ট মনে ক'রে আমরা উপনিষদের সমগ্র রূপটি ফুটিয়ে তোলবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করব।

---

[১৬] রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, পৃ ৪০৪
[১৭] রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, নৈবেদ্য, পৃ ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদ নির্বাচন

[নির্বাচনের সমস্যা—সংখ্যার বহুলতা, শ্রেণীর বিভিন্নতা। প্রাচীন উপনিষদগুলি পৃথক্ করণের উপায়—আভ্যন্তরীণ প্রমাণ—প্রত্নতাত্ত্বিক রীতি। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার চারটি স্তর—বেদের স্তর, উপনিষদের স্তর, ষড়্দর্শনের স্তর, পুরাণের স্তর—যারা উপনিষদের স্তরে পড়ে না তারা বর্জনীয়। দ্বিতীয় প্রমাণ—বেদের সহিত অঙ্গাঙ্গী সংযোগ—শংকর লিখিত ভাষ্যে তার সমর্থন।

উপনিষদের মূল ভাবধারা তিনটি: পরাবিদ্যায় আকর্ষণ, সর্বেশ্বরবাদ, শ্রেয় বনাম প্রেয়ের নীতি।]

আমরা বর্তমানে যতগুলি উপনিষদ দেখতে পাই তাদের সংখ্যা অনেক। এই অনুমান করবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে প্রাচীনকালে উপনিষদের সংখ্যা ছিল সামান্য এবং ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে উপনিষদের জন্ম হয় বৈদিক যুগে এবং ব্রাহ্মণের অঙ্গ হিসাবে। ঠিক বেদের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় আমরা যতগুলি উপনিষদ পাই তাদের সংখ্যা মাত্র সাতটি। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শংকর যে যে উপনিষদ হতে বচন উদ্ধৃত করেছিলেন ডয়সেন তার একটি তালিকা করেছিলেন। তাতে তিনি ষোলটি উপনিষদের নাম উল্লেখ করেছেন।[১] তার মধ্যে দুটি উপনিষদ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৪টি থাকে। সম্ভবত শংকর যে সময় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন তখন উপনিষদের সংখ্যা ছিল মাত্র চোদ্দখানি। কথিত আছে সম্রাট সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো উপনিষদে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং পঞ্চাশখানি উপনিষদ সংগ্রহ করেছিলেন।[২] সম্ভবত তাঁর যুগে উপনিষদের সংখ্যা পঞ্চাশে সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমানে উপনিষদের সংখ্যা তার দ্বিগুণেরও অধিক হয়ে গেছে। মুক্তিক উপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নামের উল্লেখ আছে। বোম্বাই-এর নির্ণয়-সাগর প্রেস হতে পণ্ডিত বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যে উপনিষদগুলি প্রকাশ করেছেন, তাতে আমরা ১১২ খানি উপনিষদ পাই। মুক্তিক উপনিষদে যে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ পাই তারা ত আছেই: সেই সঙ্গে তিনি তাদের চারটি উপনিষদের প্রত্যেকটিকে দুই খণ্ডে ভাগ করেছেন। 'এইভাবে তিনি চারটি অতিরিক্ত উপনিষদ পেয়েছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় তাদের

১ Deussen, *The System of the Vedanta*, p. 37.
২ Das Gupta, *History of Indian Philosophy*, Vol. I, p. 28.

প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। এইটুকু স্মরণ রাখলেই হবে যে যার সংখ্যা প্রথমে মাত্র ছিল সাতটি তা বেড়ে এখন ১১২ খানিতে দাঁড়িয়েছে।

মানব-সমাজে কোনো বস্তু নিজগুণে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে আভিজাত্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়, এইভাবে তার অনুকরণ হয়ে থাকে। গল্পে পাই ময়ূর দেখলে দাঁড়কাকের মত কুশ্রী পাখীরও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ ক'রে নিজেকে ময়ূর বলে প্রচার করবার ইচ্ছা হয়। সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখি এমন অনাচার প্রায়ই ঘটে থাকে। বাজারে কোনো পণ্যদ্রব্য যদি প্রতিষ্ঠালাভ করে, তার নাম চুরি ক'রে গুণেতে নিকৃষ্ট অনুরূপ পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা এর অতি সাধারণ একটি দৃষ্টান্ত।

এই ধরনের বিভ্রাট উপনিষদের সম্পর্কে খুব বেশী রকম ঘটেছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগের উপনিষদ সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তার উৎকর্ষের জন্য পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব মতকে উপনিষদ নামে প্রচার করতে চেষ্টা করা খুব স্বাভাবিক দুর্বলতা। এই কৌশল অবলম্বন করলে জনসমাজে তার বহুল প্রচারের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এটাই ছিল প্রেরণা। এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে অধিকসংখ্যক প্রচলিত উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

ফলে আমাদের প্রাথমিক কাজ কিছু বেড়ে গিয়েছে। উপনিষদের দর্শন রচনা করতে হলে বেদের যুগের প্রাচীন উপনিষদকেই ভিত্তি করতে হবে। এখন সমস্যা হল, সেগুলি সংগ্রহ করা যায় কি করে? পরবর্তী কালে উপ-নিষদের নামে যেগুলি প্রচারিত হয়েছিল সেগুলি পৃথক্ করব কি ক'রে? এই প্রাথমিক নির্বাচনের কাজটা আমাদের বিশেষ জটিল হয়ে পড়ে। এ বিষয় সাহায্য করবার একাধিক সূত্র সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে।

তার পূর্বে এই বিভিন্ন উপনিষদগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য এতগুলি উপনিষদের প্রত্যেকটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন নেই। এই বিভিন্ন উপনিষদগুলিকে কতকগুলি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেই শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচিত হলেই আমাদের চলবে।

উপনিষদগুলিকে যে কয়টি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তা হল এই:

(১) ব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী;

(২) যোগবাদী ও সন্ন্যাসবাদী;

(৩) ভক্তিবাদী বা পৌরাণিক দেবতা-পন্থী।

তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া গেল:

(১) ব্রহ্মবাদী উপনিষদগুলির বৈশিষ্ট্য হল তারা ব্রহ্ম বা আত্মার বিষয় নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে। পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মকে জানাই তাদের

উদ্দেশ্য। তার অতিরিক্ত কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। ব্রহ্ম-সম্পর্কিত যে আলোচনা পাই তাকে সেকালে পরাবিদ্যা বলা হত। এই পরাবিদ্যাই এই শ্রেণীর উপনিষদের আলোচ্য বস্তু।

(২) যোগপন্থী বা সন্ন্যাসবাদী উপনিষদগুলিকে একই শ্রেণীতে ফেলা যায়, কারণ উভয়ের আদর্শ অনেকখানি এক। যোগ যদিও সাংখ্য দর্শনের সহিত সংযুক্ত তার বৈশিষ্ট্য হল পরম সত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে তা যে বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তাই। যোগদর্শন পরম সত্তা সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞানলাভে সন্তুষ্ট নয়। তা চায় সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করতে। সেই প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের জন্য যোগদর্শন একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তার উদ্দেশ্য দেহ ও মনের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে পরম সত্তার ধ্যানে মনকে নিবিষ্ট করা। পরম সত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করে বলেই তার নাম যোগদর্শন।

যোগদর্শন যে পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিল তা ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীর মনকে যোগারূঢ় হবার অবস্থায় উন্নীত করে। শিক্ষার্থীর সর্বপ্রথম করতে হবে সংসারবন্ধন ত্যাগ। তারপর কতকগুলি আসন ও মুদ্রা অভ্যাস ক'রে নিজের শরীরের সকল অঙ্গগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হয়। তার পর আসে মনের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। চিত্তকে বিশেষ বিষয়ের ধ্যানে নিমগ্ন রেখে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে অভ্যাস করা হয়। এই ক্ষমতায় অধিকার এলে মনকে সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি হতে মুক্ত ক'রে সমাধিস্থ অবস্থায় আনবার চেষ্টা করা হয়। এই অবস্থাতেই পরম সত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন সম্ভব। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় যোগদর্শনের এই বিশেষ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন'।

এই সূত্রেই এসে পড়ে সন্ন্যাসবাদের সঙ্গে যোগপন্থীর ঘনিষ্ঠতা। কৃচ্ছ্র-সাধন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সকল প্রকার ভোগ পরিহার, নারীর সহিত সম্পর্ক ছেদ— এইগুলি হল সন্ন্যাসবাদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। উভয়ের আদর্শগত অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। তবে যোগের বিশেষ আকর্ষণ পরম সত্তার সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপন এবং সন্ন্যাসবাদের বিশেষ আদর্শ হল বৈরাগ্যকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ ক'রে জন্ম-বন্ধন হতে মুক্তিলাভ। এখানেও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় তার আদর্শ হল, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'। যোগপন্থীর যেমন উদ্দেশ্য হল দেহ ও মনকে শাসনে আনা, সন্ন্যাসবাদীর তেমন উদ্দেশ্য হল তাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন করা। মানুষের মনের ভোগের বিষয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক আসক্তি আছে। মনই ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে। কাজেই মন আকৃষ্ট হলে ইন্দ্রিয়ও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মন যখন আকৃষ্ট হয় তখন ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করবার কেউ থাকে না। সেই কারণে সন্ন্যাসবাদীর বিশেষ উদ্দেশ্য মনকে বিষয়ের প্রতি আসক্তি-বিহীন করা।

কেউ স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্তি বা শান্তি পায় না। কেউ কোনো মানসিক আঘাত-হেতু বৈরাগ্য-সাধনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। কেউ সাধনার অঙ্গ হিসাবে ইন্দ্রিয়ের সংযম অভ্যাস করে। এই ধরনের সকল মানুষেরই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। তাদের কর্তব্য তখন হয়ে দাঁড়ায় ইন্দ্রিয়কে ভোগের বিষয় হতে নানা ভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং মনের মধ্যে এমন এক বৈরাগ্যের ভাব সৃষ্টি করা, যাতে মানসিক অবস্থা কৃচ্ছ্রসাধনের অনুকূল হয়। এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয় দুটি ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে। ইন্দ্রিয়ভোগে যে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, তা ক্ষণভঙ্গুর, প্রথম এটি প্রতিপন্ন করা। দ্বিতীয়ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হিসাবে যা কিছু সুন্দর ও মধুর বলে ঠেকে তাকে কুৎসিত ও অসুন্দর প্রতিপন্ন ক'রে তার প্রতি মানসিক বিতৃষ্ণা জাগান। মোটামুটি এই দুই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ। তাদের আদর্শ হল সকল প্রকার ভোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করা। এই আদর্শের সপক্ষে যত কিছু যুক্তি সম্ভব তাও তারা প্রয়োগ ক'রে থাকে।

বাস্তবিক বলতে কি সন্ন্যাসবাদীরা মানুষের মনে বৈরাগ্য উদ্রেক করবার সপক্ষে এমন একপেশে যুক্তি নেই যা গ্রহণ করেন নি। তার দু-একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা শুধু ইন্দ্রিয়-সংযমই শিক্ষা দেন নি। তাঁরা দেখেছেন মানুষের দেহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগের উপায়স্বরূপ। কাজেই, ইন্দ্রিয়ভোগ হতে মানুষকে বিরত করতে হলে দেহের ওপর ঘৃণা জাগানর বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে সেইরূপ নারীর আকর্ষণ পারিবারিক জীবনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। কাজেই একই মনোবৃত্তি-প্রণোদিত হয়ে তাঁরা নারী সম্বন্ধে হীনতম ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন, যাতে স্বাভাবিক আকর্ষণ শিথিল হয়ে গিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের বিতৃষ্ণা আসে।

মৈত্রেয়ী উপনিষদ মনুষ্য দেহ সম্বন্ধে যা বলে তার সবটা উদ্ধৃত করা সম্ভব হবে না। তার যে অংশটুকু একান্ত রুচিবিরুদ্ধ নয় তা বলে, "এই শরীর অস্থি দিয়ে বাঁধা, মাংস দিয়ে লিপ্ত, চর্মের দ্বারা আবদ্ধ এবং বহু আবর্জনা দিয়ে তা পরিপূর্ণ।"[৩]

পরিব্রাজক উপনিষদে বলা হয়েছে, "কোনো নারীকে সম্ভাষণ করতে নেই, পূর্বে দৃষ্টা কোনো নারীকে স্মরণ করতে নেই। তাদের সঙ্গে কথা বর্জন করতে হবে, এমন কি তাদের প্রতিকৃতিও দর্শন করতে নেই।"[৪]

[৩] শরীরমিদং.........অস্থিভিশ্চিতং মাংসেনাভিলিপ্তং
চর্ম্মণাবদ্ধং বিন্মূত্রবাতপিত্তকফমজ্জামেদোবসাভিরন্যৈশ্চ
মলৈর্বহুভিঃ পূর্ণম্ ॥ মৈত্রেয়ী ॥ ৩ ॥

[৪] ন সংভাষেৎ স্ত্রিয়ং কাংচিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাংচ ন স্মরেৎ।
কথাং চ বর্জয়েৎ তাসাং ন পশ্যেৎ লিখিতামপি ॥
নারদ পরিব্রাজক ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নারী সম্বন্ধে এমন কঠোর নিষেধ বাণীর কারণ কি? কারণ হল আর কিছুই নয়, তা হলে সন্ন্যাস সংরক্ষণ সহজ হয়ে পড়ে। তার সম্বন্ধে মনকে বিরূপ করতে পারলে, মনের তার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে। এই যুক্তি প্রকাশ্যে প্রচার করতেও সন্ন্যাসবাদের আপত্তি নেই। তাই মহ উপ-নিষদে বলা হয়েছে,

"যার স্ত্রী আছে তারই ভোগের ইচ্ছা জন্মায়, যার স্ত্রী নেই, তার ত ভোগের বিষয় নেই। কাজেই স্ত্রীকে ত্যাগ করলে জগৎকে ত্যাগ করা হয় এবং জগৎ ত্যাগ করলেই সুখী হওয়া যায়।"[৫]

যাতে মানুষ সুখ পায় তা হতে নিজেকে বঞ্চিত করা কষ্টকর। তার কারণ, যা সুখ দেয় তার প্রতি মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যা দুঃসাধ্য, যা কষ্টকর, তার প্রতিও মানুষের একটা আকর্ষণও থাকে। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মানুষ কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কৃচ্ছ্রসাধন এমনি কিছু দোষের জিনিস নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা খেলার প্রস্তুতি হিসাবে অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে সংযম অভ্যাস করেন। জ্ঞান আহরণের জন্য বৈজ্ঞানিক নানা দুর্গম স্থানে গমন ক'রে এবং বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়ে জীবনকে বিপদাপন্ন করেন। সেখানে এই দুঃখভোগের একটা অর্থ আছে, তা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। কৃচ্ছ্রসাধন এখানে গৌণ জিনিস। কিন্তু সন্ন্যাসবাদীর কৃচ্ছ্রসাধনের সার্থকতা কৃচ্ছ্রসাধনের জন্যই, তার সহিত স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সংযুক্ত নেই। কৃচ্ছ্রসাধনই একমাত্র এবং মুখ্য উদ্দেশ্য।

(৩) যে শ্রেণীর উপনিষদগুলি সংখ্যায় সব থেকে ভারি তারা পৌরাণিক দেবতাপন্থী। পুরাণের যুগের বৈশিষ্ট্য হল পুরাণগুলি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বর এখানে ভক্ত হতে স্বতন্ত্র। ভক্তি দিয়ে ভগবানকে লাভ হয় এবং সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়, এই বিশ্বাস হল পৌরাণিক যুগের হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। ষড়্‌দর্শনের যুগে মুক্তির উপায় হিসাবে জ্ঞানই উৎকৃষ্ট মার্গ বলে পরিগণিত হত। কিন্তু পুরাণের যুগে জ্ঞানমার্গ বর্জিত হয়ে ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠলাভ করেছিল।

এই যুগের প্রধান দেবতা হলেন বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। সেই কারণেই বোধ হয় বেশীসংখ্যক পুরাণ-পন্থী উপনিষদ হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, না হয় শৈব সম্প্রদায়ের মতের পরিপোষক। এ ছাড়া ছোট দেবতারাও স্থান পেয়েছেন, যেমন ব্রহ্মা, শক্তি, সূর্য ইত্যাদি। এই শ্রেণীর সকল উপনিষদেরই সাধারণ নীতি হল দেবতাকে ভক্তি পুরুষার্থ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ত্রিপাদ-বিভূতি-

---

[৫] যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃস্ত্রীকস্য ক ভোগভূঃ ॥
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ মহ ॥ ৩ ॥ ৪৮

মহানারায়ণ উপনিষদে এই সাধারণ নীতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তা' বলে,

"ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কখনো লাভ হয় না। সেই জন্য তুমি এই সমস্ত পথ বর্জন ক'রে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। ভক্তিনিষ্ঠ হও। ভক্তির দ্বারা সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়।"[৬]

উপনিষদগুলির প্রাথমিক নির্বাচনের কাজে যে উপায়টি সব থেকে ভাল ফল দেবে তাকে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক রীতি বলে বর্ণনা করতে পারি। এই নামকরণের যথার্থতা উপলব্ধি করতে হলে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন বিভিন্ন যুগের মানুষের উৎপাদিত ব্যবহার্য দ্রব্যের নীরব সাক্ষ্য হতে। কোনো বিশেষ স্থানে হয়ত কোনো বিশেষ যুগের মানুষ একটি বসতি স্থাপন করেছিল। তারা কয়েক পুরুষ ধ'রে সেখানে বাস করল। তাদের ব্যবহারের জন্য তারা নানা সামগ্রী উৎপাদন করল। তার কিছু নষ্ট হয়ে গেল, কিছু বসতির আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে রইল। তার পর হয় ত তারা লোপ পেল, বা সেই স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল। কালক্রমে তার ওপর ধূলা, আবর্জনা, পাতা প্রভৃতির স্তর পড়ে পড়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যের নিদর্শনগুলি চাপা পড়ে গেল।

কালক্রমে ভিন্ন যুগের আর একদল মানুষ সেই ঢিপির ওপর বসতি স্থাপন করল। তারাও কিছুকাল বাস ক'রে তাদের ব্যবহৃত পণ্যের নিদর্শন রেখে চলে গেল। নূতন আস্তরণে তাও আবার ঢেকে গেল। এইভাবে এমনও দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে আস্তরণ পড়ে পড়ে ঢিপি বড় হয়ে ওঠে এবং সেই ঢিপির তলায় বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর নিদর্শন বিভিন্ন স্তরে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

দৈবাৎ যদি কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকের নজরে এমন ঢিপি পড়ে, তিনি তা খুঁড়বার ব্যবস্থা করেন। তার ফলে মাটির বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্য আবিষ্কার হয়। তার ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগের মানবসমাজের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম এক হলেও বা তা একশ্রেণীর হলেও তা কোন্ যুগের জিনিস, সেটা কোন্ স্তরে পাওয়া গিয়েছে তা হতে সহজেই নির্ধারণ ক'রে দেওয়া যায়।

প্রকৃত বৈদিক যুগের উপনিষদ কোন্‌গুলি, তা নির্ধারণ করতেও আমরা প্রত্নতাত্ত্বিকের এই রীতি প্রয়োগ করতে পারি। আমরা জানি এই ১১২ খানি

[৬] ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি॥ ত্রিপাদ-বিভূতি-মহানারায়ণ॥ উত্তরকান্ড॥ অষ্টম অধ্যায়॥

গ্রন্থের প্রত্যেকটি উপনিষদ নাম ধারণ করে। এখন ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের ইতিহাসের কোন্ স্তরে তাদের কোনটি পাওয়া যায় সে বিষয় নিষ্পত্তি হয়ে গেল প্রকৃত বৈদিক যুগের উপনিদষগুলিকে বেছে নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। সুতরাং আমরা এখানে এই প্রত্নতাত্ত্বিক রীতি প্রয়োগ ক'রে দেখতে পারি। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা ক'রে নেওয়া। আমরা এখন সেই চেষ্টা করব।

দেখা যায় ভারতীয় দর্শন তথা ধর্মের ইতিহাসে চারটি মূল স্তর আছে। তাদের প্রথমটি হল (১) বেদের স্তর। এখানে কর্মকান্ড হতে মানুষের মন ক্রমশ জ্ঞানকান্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বহু বিশ্লিষ্ট দেবতা হতে এক অতি-দেবতার ক্রমবিকাশ হয়েছে। (২) দ্বিতীয় স্তরের পরিচয় পাই আমরা ব্রাহ্মণের শেষ অংশে যেখানে অবিমিশ্র দার্শনিক আলোচনাই ধর্মের স্থান নিয়েছে। একে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার স্তর বলতে পারি। ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণই এখানে একমাত্র আকর্ষণ। (৩) তৃতীয় স্তরে আমরা পাই ষড়্দর্শন বা সূত্রের যুগ। এই ছয় দর্শনের যুগে মুক্তিই মানুষের পুরুষার্থ বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভে জ্ঞান-মার্গই উৎকৃষ্ট পথ বলে গৃহীত হয়েছিল। এটিকে আমরা ষড়্দর্শনের স্তর বলতে পারি। (৪) তার পরে আমরা পাই পুরাণের স্তর। এখানেই দেখি প্রকৃত একেশ্বরবাদ প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এবং ঈশ্বরে ভক্তি একমাত্র সিদ্ধির পথ বলে গৃহীত হয়েছে।

ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারায় এই যে চারটি স্তরের কথা বলা হল, তারা যে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক-শূন্য তা নয়। তারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং এও বলা যায় যে তারা একই চিন্তাধারার বিভিন্ন অংশ। একরকম বলতে গেলে এটি একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং এখানে অতীতের যুগের সহিত পরবর্তী যুগের একটি ধারাবাহিকতাও সংরক্ষিত হয়েছে। আমাদের এখন কাজ হবে সেই ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাসটি সংক্ষেপে উদ্ধার করা।

(১) বেদের সংহিতার যুগেই কি ভাবে কর্মকান্ড হতে উপাসকের মন জ্ঞানকান্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আমরা কিছু উল্লেখ করেছি। ঋগ্বেদ সংহিতার ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই প্রথম উৎপত্তি। প্রথম অবস্থায় দেখি বেদের ঋষি প্রকৃতির বক্ষে যেখানে কোনো শক্তি বা সৌন্দর্য বা মাহাত্ম্যের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তার ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। এইভাবে অগ্নি এসেছেন যজ্ঞের দেবতা, বায়ু এসেছেন। অনন্ত আকাশের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ঋষি দ্যৌঃ বলে অভিবাদন করেছেন। প্রভাতের পূর্ব আকাশে রাঙিমা ঢেলে যিনি মানুষের নয়ন-রঞ্জন করেন তাঁকে ঊষা নাম দিয়ে দেবত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এইভাবে কত দেবতা আবিষ্কৃত হয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সংহিতায় স্তুতি রচিত হয়েছে।

সংহিতার মধ্যেই আর এক অবস্থায় দেখি -এত দেবতার ছড়াছড়ি তবু

বেদের ঋষির মনে হয়েছে যে তাঁরা ত ঠিক বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তির অধিষ্ঠান নন, তাঁরা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। তাই তিনি বলেছেন, 'একং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম্' সেই একই সব কিছু হয়েছিলেন।[৭] তখন এই বহু দেবতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক অতি-দেবতার অন্বেষণ সুরু হয়ে গেল। তাঁর কাজ হবে সকল দেবতার কাজের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই অবস্থায় এক একটি বিশেষ দেবতার ওপর এই অতি-দেবত্ব আরোপিত হল। শেষে বরুণ নামে দেবতা স্থায়িভাবে অতি-দেবত্বের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। যিনি হবেন অতি-দেবতা তাঁর কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কাজ হবে বিভিন্ন দেবতার কাজের মধ্যে সংঘর্ষ এড়িয়ে সামঞ্জস্য স্থাপন, তাঁর কাজ হবে বিশ্বকে ঠিক পথে চালিত করা। বরুণের মধ্যে সেই গুণগুলি আবিষ্কৃত হল। ঋষি বললেন, "সূর্য তাঁর চক্ষু, আকাশ তাঁর আচ্ছাদন এবং ঝটিকা তাঁর প্রাণবায়ু।"[৮] তিনি বললেন, "নদী ত তাঁর আদেশেই প্রবাহিত হয়।"[৯] তিনি আরও বললেন, "সূর্য যে কিরণ দেয় এবং চন্দ্র ও তারা তাদের নির্ধারিত কক্ষে চলে, তাঁরই ভয়ে।"[১০] তিনি নিয়মের প্রবর্তক। তাই তাঁকে বলা হল 'ধৃতব্রত'। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিকে শাসনে রাখেন, ঋতের বা ধর্মের পথে রাখেন। তাই তাঁর নাম হল 'ধর্মস্য গোপ্তা'। ঋষি গাইলেন,

"ঊষা ঋতের পথ, সত্যের পথ অনুসরণ করেন, যেন সে পথকে তিনি পূর্ব হতে চেনেন। তিনি সে পথ হতে বিক্ষিপ্ত হন না। সূর্য ঋতের পথ অনুসরণ করেন।"[১১]

কিন্তু বেদের ঋষি এক অতি-দেবতার সন্ধান পেয়েই ক্ষান্ত হলেন না। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে এসে দেখা যায় দেবতার জন্য প্রশস্তি রচনা থেকে বিশ্বের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তাঁর মনের দরজায় বেশী ধাক্কা মারছে। তাঁর মনে প্রশ্ন উদয় হল, এই বিশ্ব কোথা হতে সৃষ্টি হল? 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আ বভূব।' তিনি তার উত্তরও দিলেন। সে উত্তর নাসদীয় সূক্তে লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম অধ্যায়ে তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন বিশ্বের রূপ কি রকম। তার উত্তরও মিলল। তিনি উপলব্ধি করলেন বিশ্ব একই অব্যক্ত শক্তির বিকাশ। এক সর্বব্যাপী সত্তা বিশ্বের সকল কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন। পুরুষ সূক্তে তার ব্যাখ্যা আছে। তাই তিনি বললেন, "এই

[৭] ঋগ্‌বেদ ॥ ৮ ॥ ৫৮ ॥ ২
[৮] ঋগ্‌বেদ ॥ ৭ ॥ ৮৭ ॥ ২
[৯] ঋগ্‌বেদ ॥ ২ ॥ ২৮ ॥ ৪
[১০] ঋগ্‌বেদ ॥ ৮ ॥ ২৫ ॥ ২
[১১] ঋগ্‌বেদ ॥ ১ ॥ ২৪ ॥ ৮
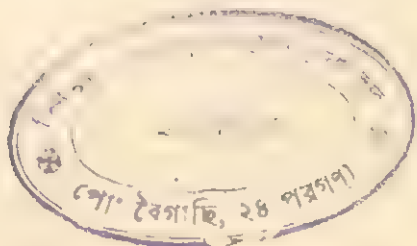
সব কিছু যা আছে, যা হয়েছে এবং যা হবে, সবই সেই পুরুষ।”[১২] এই ভাবে দেখি সংহিতার দশম মণ্ডলে এক-দেবতাবাদ হতে ঋগ্বেদ সর্বেশ্বরবাদের দরজায় এসে পেঁৗছে গেছে।

(২) ঋগ্বেদের সংহিতা অংশে যা হল সুরু ব্রাহ্মণের উপনিষদ অংশে তা বিকাশ লাভ ক'রে সম্পূর্ণ একটি দার্শনিক তত্ত্বের রূপ নিল। তাকে দর্শনের পরিভাষায় সর্বেশ্বরবাদ বলা যায়। ভারতীয় দর্শন তার নাম দিয়েছিল 'অদ্বৈতবাদ', কারণ তা বিশ্বের সকল বস্তুর একত্ব প্রচার করে। তা যে তত্ত্বটি বিশেষ ক'রে প্রচার করতে চেষ্টা করেছে, তা বলে আপাতদৃষ্টিতে যে বিশ্ব বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত মনে হয়, তা বিভক্ত নয়, তা বিচ্ছিন্ন বহু বস্তুর সমাবেশ নয়, তা একই অবিভক্ত শক্তির প্রকাশ, তার মধ্যে একত্বের যোগসূত্র সর্বত্র বিরাজমান। এই ভাবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ, তিনি ব্রাহ্মণের শেষ অংশ উপনিষদে পরিণত হয়েছেন ব্রহ্মেতে। তাঁর আরও একটি নাম দেওয়া হয়েছে, তা হল ভূমা। উভয়েরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক। যিনি সব থেকে বড় তিনি ব্রহ্ম, যিনি সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন তিনি ব্রহ্ম। ভূমারও অর্থ এক-ই।

বৈদিক যুগের ঋষি তাই নূতন সুরে গাইলেন, বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নেই। ঋষি বললেন, “জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।”[১৩] তিনি বললেন, “এই সমস্ত কিছুই হল ব্রহ্ম, তার মধ্যেই তাদের জন্ম, পরিবর্ধন ও বিলয়।”[১৪] তিনি উপলব্ধি করলেন, “মানুষে যিনি আছেন, আর ওই আদিত্যে যিনি আছেন, তাঁরা একই”[১৫] তাই তিনি সেই সর্বব্যাপী দেবতাকে প্রণতি নিবেদন ক'রে গাইলেন,

“যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি সমস্ত ভুবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, যিনি ওষধি ও বনস্পতিতে আছেন, সেই দেবতাকে নমস্কার।”[১৬]

এইভাবে দেখা যায় ব্রাহ্মণের অংশ হিসাবে যে উপনিষদগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

[১২] পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যৎ ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥
ঋগ্বেদ ॥ ১০ ॥ ৯০ ॥ ১

[১৩] ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিংচ জগত্যাং জগৎ ॥ ঈশ ॥ ১ ॥

[১৪] সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি ॥
ছান্দোগ্য ॥ ৪ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

[১৫] যশ্চাসৌ পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ॥
তৈত্তিরীয় ॥ ২ ॥ ২৮

[১৬] যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো
বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ য ওষধীষু
যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর ॥ ২ ॥ ১৭

(৩) ভারতীয় চিন্তাধারার তৃতীয় স্তরে আমরা পাই হিন্দুষড়্দর্শন। তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হলেও তাদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক। এই যুগে জন্মান্তরবাদ একটি সর্ববাদিসম্মত দৃঢ় বিশ্বাসরূপে পরিণত হয়েছে। উপনিষদের যুগে পরজন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আছে, নানা কল্পনাও আছে, কিন্তু পরজন্মবাদ সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নি। এই ষড়্দর্শনের যুগেই প্রথম তা সর্ববাদিস্বীকৃত তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও তা স্বীকার ক'রে নেয়। সেই কারণে এই যুগে মানুষের নিকট পরজন্ম হতে মুক্তিলাভের উপায়ই প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষড়দর্শন সেই উপায়ই খুঁজেছে। তবে তারা সকলেই একই দৃষ্টিভঙ্গি বা লক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারা বলে, পরজন্ম-বন্ধন হতে মুক্তিই হল মানুষের পুরুষার্থ এবং তা লাভের উপায় হল জ্ঞান-মার্গ। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই তাদের মতে মুক্তির একমাত্র পথ।

উপনিষদের যুগে কিন্তু এ প্রশ্ন দেখা দেয় নি। পরজন্ম আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত মীমাংসা না হলে ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। উপনিষদের যুগে মানুষ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, তার কৌতুহল-বৃত্তি চরিতার্থ করবার নিমিত্ত। কৌতুহল চরিতার্থ হলে, তা হতেই একটা আনন্দ মিলত এবং সেই আনন্দই তাদের আকর্ষণের কারণ। উপনিষদের যুগে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা এমন আকর্ষণের বস্তু ছিল যে তাকে চিত্তবিনোদনের উপায় বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিপুল ঐশ্বর্য এবং অফুরন্ত ইন্দ্রিয় ভোগের লোভ বর্জন ক'রেও সেকালের মানুষ পরাবিদ্যায় আকৃষ্ট হত। এই দিক দিয়ে উপনিষদের যুগ এবং ষড়্-দর্শনের যুগের একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের দেশের ষড়্দর্শনের সহিত সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। এদের মধ্যে আবার দুটি দুটিতে এমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের তিনটি জোড়ায় ভাগ ক'রে নেওয়া যায়। প্রথম জুটি সাংখ্য ও যোগকে নিয়ে, দ্বিতীয় জুটি ন্যায় ও বৈশেষিককে নিয়ে, তৃতীয় জুটি পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা নিয়ে। এইভাবে তাদের মধ্যে আমরা তিনটি বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব পাই। আমাদের বর্তমান আলোচনা সম্পর্কে এই তত্ত্বগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হবে না। সংক্ষেপে তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ধারণা ক'রে নিলেই চলবে।

সাংখ্য ও যোগ সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করে কয়েকটি তত্ত্বের সাহায্যে। এই যুগ্ম দর্শনের মতে বিশ্বের উপাদান একটি নয়, বহু। তাদের ভিত্তি হল দুটি মূল স্বতন্ত্র বস্তু; একটি প্রকৃতি ও অন্যটি পুরুষ। সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষ বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান বিশ্ব অদৃশ্য থাকে। সাম্যাবস্থা নষ্ট হলেই প্রকৃতি হতে 'মহৎ' এর উৎপত্তি হয়।

এই 'মহৎ' জ্ঞানও বুদ্ধির সম-স্থানীয়। তা হতে আসে, 'অহংকার' বা ব্যক্তিত্ব-বোধ। এই অহংকারকে ভিত্তি করেই একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভিত্তি হিসাবে আসে 'পঞ্চ তন্মাত্র'। এই 'পঞ্চ তন্মাত্র' হতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। এইভাবে আমরা পঁচিশটি মৌলিক পদার্থ পেলাম। তারাই বিশ্বের উপাদান। তাদের নিয়েই বিশ্ব গঠিত।

এই পর্যন্ত উভয় দর্শন এক পথে চলেছে। তার ওপর যোগদর্শন কিছু অতিরিক্ত তত্ত্ব সংযুক্ত করেছে। সেই অতিরিক্ত তত্ত্বই তাকে সাংখ্য হতে বিশিষ্ট করে। 'পুরুষের' সহিত 'বুদ্ধির' সাধারণ অবস্থায় সংযোগ হবার ফলেই দৃশ্যমান জগতের অনুভূতি জাগে। পুরুষকে বুদ্ধি হতে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে এই অনুভূতির বিলোপ হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'যোগের' ব্যবস্থা। 'যোগ' চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে দ্রষ্টা বা পুরুষকে বুদ্ধি হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বরূপে ফিরিয়ে আনে। এইখানেই যোগের সার্থকতা।

যোগের আর একটি বৈশিষ্টের সহিত আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। সাংখ্য দর্শনের পঁচিশটি পদার্থের সহিত যোগদর্শন আর একটি পদার্থ যুক্ত করেছে। ইনি হলেন 'ঈশ্বর'। ইনি সাধারণ একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের মত সর্বশক্তিমান নন। এঁর ক্ষমতা অনেকখানি সংকুচিত। বহু 'পুরুষের' মধ্যে তিনিও একটি 'পুরুষ'। তবে তিনি বিশিষ্ট। তিনি নিরতিশয় সর্বজ্ঞস্বরূপ। যা ধারণা করা যায় না, এত পরিমাণ জ্ঞান-শক্তি তাঁর বর্তমান। তাঁর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ পুরুষ সুখ দুঃখ বোধ, কর্ম ফল ভোগ প্রভৃতি হতে নিস্তার পায় না। কিন্তু ঈশ্বর এই সকল উপদ্রব হতে মুক্ত। তিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি ক্লেশ হতে মুক্ত, তিনি কর্ম হতে নিবৃত্ত, কর্মফল হতে মুক্ত এবং তামস কর্তৃক অস্পৃষ্ট। এই ঈশ্বরের দৃশ্যমান জগতের উৎপাদনে কোনো কর্তব্য আছে বলে উল্লেখ নেই। তবে ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে সমাধিলাভ সহজ হয় এইরূপ উক্তি আছে। এইসব দেখে মনে হয় যোগের ঈশ্বর নিজ মহিমায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হন নি। বিশ্বের উৎপাদনের ব্যাখ্যায় বহু উপাদানকে স্বীকার করা হয়েছে। তাদেরই মধ্যে এক কোণে ঈশ্বর যেন অনাদরে পড়ে রয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানা হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিভুত্ব তখনো পরিস্ফুট হয় নি।

পরবর্তী জুটিতে আমরা পাই বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন। এঁদের দার্শনিক মত একই। তা যে তত্ত্ব প্রচার করে, তা বলে যে বিশ্ব বহু বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট উপাদান নিয়ে গঠিত। সংখ্যাতীত কণা বা অণু হল বিশ্বের মৌলিক উপাদান। পাশ্চাত্য দর্শনের কণাবাদের সহিত তার মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। বৈশেষিক দর্শন হতে ন্যায়দর্শনকে যা পৃথক্ করে তা হল তার ন্যায়শাস্ত্রের বিবর্ধন। নির্ভুলভাবে কি ক'রে চিন্তা করা যায় তাই হল এর বিষয়বস্তু।

তৃতীয় জুটি হল পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। উভয়েরই বেদের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ সংযোগ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বেদের দুটি মূল অংশ আছে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সংহিতায় আমরা পাই কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ যজ্ঞে যে স্তোত্র আবৃত্তি করা হবে বা গাইতে হবে তাই। পূর্ব-মীমাংসার সম্পর্ক এই কর্মকাণ্ডের সহিত। তা মন্ত্রের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে বিষয়বস্তু করেছে। অপর পক্ষে উত্তর-মীমাংসার বিশেষ সম্পর্ক ব্রাহ্মণের শেষের অংশ বা উপনিষদের সহিত, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের সহিত। তার বিষয়বস্তু হল বৈদিক যুগে রচিত উপনিষদের দর্শন। তাই হল বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র। তার বিষয় ইতিমধ্যে আমরা কিছু আলোচনা করেছি।

এই ছয়টি দর্শনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন হবে। তাদের কেউ বিশ্বের মূল উপাদান সম্বন্ধে বহুবাদে বিশ্বাসী, কেউ সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। একটি ক্ষেত্রে মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়েছে। কেবল যোগদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার হয়েছে। কিন্তু সেই ঈশ্বরও পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদের ঈশ্বর নন। এখানে যেন ঈশ্বরকে স্বীকারের একটা আকুতি আছে, কিন্তু পূর্ণ মহিমায় তাঁর স্বীকৃতি নেই।

(৪) ভারতীয় চিন্তাধারার চতুর্থ স্তরেই প্রথম দেখি একেশ্বরবাদ সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, কিন্তু তিনি ভক্ত হতে বিভিন্ন। তিনি তাঁর সৃষ্টি হতে দূরে, স্বর্গে বাস করেন। ভক্তিদ্বারা তাঁর সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা যায় এবং তাঁর কৃপালাভ হলে সালোক্য সম্ভব। ঈশ্বর এখানে নানারূপে কল্পিত হয়েছেন, তবে তাঁর প্রধান দুটি রূপ হল শিব ও বিষ্ণু। বিভিন্ন পুরাণ নিজ নিজ দেবতার মহিমা বর্ণনা করে। পুরাণের মধ্যেই একেশ্বরবাদ পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিই এখানে সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই হল পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

ব্রাহ্মণের যুগের সর্ব-ব্রহ্মবাদের পর কেমন ক'রে পৌরাণিক যুগের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করল আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি। সে অনুমান সম্ভবত সত্যের কাছাকাছি যাবে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের যেন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে মনে হয়। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম যেন এইখানে এসে পরস্পরের অতি নিকটবর্তী হয়েছে। একদিকে আমরা দেখি যে বৈদিক যুগের উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের স্থান নিয়েছে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বিগ্রহ উপাসনা। উপনিষদের জ্ঞান-মার্গ পরিত্যাগ ক'রে হিন্দুর মন বিগ্রহের পূজায় আকৃষ্ট হয়েছে। অপর পক্ষে আমরা দেখি ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা পরিত্যাগ ক'রে তাঁর মূর্তিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁর পূজায় বৌদ্ধদের মন আকৃষ্ট হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মে পূজার কোনো অবকাশ ছিল না। এক উচ্চ আদর্শের নৈতিক আচরণই সেখানে

ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছিল। এই বিপর্যয়ের ইতিহাস বড় বিস্ময়কর। এখন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ভগবান বুদ্ধের রাজকুলে জন্ম হয়েছিল। রাজকুমারের ভাগ্যে যা কিছু সুখ, যা কিছু ঐশ্বর্য সম্ভব, সবই তাঁর আয়ত্ত ছিল। রমণীয় প্রাসাদ, বিচিত্র ভোগের বস্তু, পরিজন, দাসদাসী, সুন্দরী স্ত্রী—সবই তাঁর ছিল। ভবিষ্যৎ ছিল রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। তার পর পত্নীর কোলে এসেছিল তনয়। ব্যক্তিগত জীবনে সুখের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সবই যেন ভাগ্য ভিন্ন ভিন্ন ক'রে সংগ্রহ ক'রে এনে, তাঁর জীবনের পাত্রটি ভরে দিয়েছিল। তবু সেই পরিপূর্ণ সুখের ইঙ্গিতে পূর্ণ পাত্রটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কেন? নিজে ত তিনি জীবনে কোনো আঘাত পান নি। স্নেহশীল পিতা তাঁর কোমল মনকে বেদনার আঘাত হতে রক্ষা করবার জন্য কত না যত্ন নিয়েছিলেন। তবু সংসার তাঁকে ধরে রাখতে পারল না, তিনি গৃহত্যাগী হলেন। এই সংকল্প নিয়ে তিনি গৃহত্যাগী হলেন যে মানুষের জীবনের যত দুঃখ যত তাপ, তাকে তিনি নির্বাপিত করবেন। সংসারের বক্ষে মানুষের জীবন যেন দুঃখের ক্রীড়নক। তার ব্যাধি আছে, তার জরা আছে, তার মৃত্যু আছে, সর্বোপরি আছে দুঃখের অহরহ কষাঘাত। সকল মানুষের দুঃখ দূর করতে তিনি সংসারত্যাগী হলেন, তিনি নিজে দুঃখের ব্রত গ্রহণ করলেন। এত করুণা ছিল তাঁর হৃদয়ে। তাই ত সেকালের মানুষ তাঁকে নাম দিয়েছিল পরম কারুণিক মহর্ষি।

সংসার ত্যাগ ক'রে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনে তৎপর হলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর আত্মনিগ্রহের ফলে তাঁর দেহ এত নিস্তেজ হয়ে গেল যে চিন্তা করবার ক্ষমতা পর্যন্ত তিনি হারাতে বসলেন। তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে এ পথ ঠিক পথ নয়। মনের আশ্রয় দেহ। দেহ ক্ষীণ হলে, দেহ দুর্বল হলে, মনও তার কর্মক্ষমতা হারায়। মন যদি কাজ করবার ক্ষমতা না রাখে, তা হলে তিনি কি দিয়ে তাঁর সংকল্প পালন করবেন? তখন সুজাতা এলেন তাঁর সেবা করতে। তাঁর প্রদত্ত পায়সান্ন তিনি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলেন, শরীরের হৃত শক্তি উদ্ধারের জন্য। সুস্থ দেহের সঙ্গে সবল মন পেয়ে তিনি সুরু করলেন দীর্ঘ সাধনা, মানুষকে দুঃখ হতে পরিত্রাণের সাধনা। বহু সাধনা, বহু চিন্তার পর একদিন এক পুণ্যমুহূর্তে এক বটবৃক্ষের তলে বসে তিনি সেই পরাজ্ঞানের অধিকারী হলেন, যা তাঁকে মানুষের দুঃখ হতে মুক্তির পথের সন্ধান এনে দিল। তিনি তখন বুদ্ধত্ব পেলেন।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বারাণসীতে তিনি প্রথম যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে যে গভীর সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাই। তিনি জেনেছিলেন শরীর-নিগ্রহ কখনো ধর্মের অঙ্গ হতে পারে না। তিনি তাই বলেছিলেন,

"শরীরকে সুস্থ রাখা মানুষের কর্তব্য, কারণ অন্যথায় আমরা জ্ঞানের প্রদীপকে উজ্জ্বল রাখতে পারব না এবং আমাদের মনকে সতেজ ও নির্মল রাখতে পারব না।"[১৭]

তখনকার প্রচলিত ধর্ম হতে এ উপদেশ এতই স্বতন্ত্র যে তাঁর অনুগামী শিষ্যের দল লজ্জায় এবং ঘৃণায় তাঁকে বর্জন করল। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি যাকে সত্য বলে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তার প্রচার হতে তাঁকে বিরত করতে পারল না। তিনি তাঁর বাণী প্রচার ক'রে চললেন।

সেদিন ভারতের ধর্মজীবনে বড় অনাচার ঢুকেছিল। পরম শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতিই ধর্মের মূল। বৈদিক যুগের আড়ম্বরবিহীন সরল যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথা সেদিন লোপ পেয়েছিল। উপনিষদের যুগের মানুষ সর্বব্রহ্মবাদের অঞ্জন চোখে মেখে বিশ্বকে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে উপলব্ধি করেছিল। তার দিশাও সেকালের মানুষ হারিয়ে বসেছিল। নিষ্ঠুর পশুহত্যাকে অঙ্গ ক'রে আচার ও অনুষ্ঠানের দিকটাই সেদিন বড় হয়ে উঠেছিল। হিংসা মানুষের মনকে অধিকার ক'রে বসেছিল। হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নানা নীচতা মানুষের মনকে অতৃপ্ত করে তুলেছিল। শুধু স্থূল বিষয়ের আসক্তি মানুষের মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তার সুন্দর বর্ণনা পাই :

"ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয়
তাপ দহন দীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ,
খিন্ন অপরিতৃপ্ত।"[১৮]

তাই ভগবান বুদ্ধ সে দিন যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে তৃষ্ণার জলের মতই মধুর হয়ে উঠেছিল আর্ত নরনারীর কাছে। অশান্ত হৃদয়ের দাহকে শান্ত করবার জন্য তাই তারা দুহাত ভরে পান করেছিল শান্তির বাণী। তাঁর পলাতক শিষ্যরাও মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধানত হৃদয়ে আবার তাঁর অনুবর্তী হয়েছিল।

ভগবান বুদ্ধ যা বলতেন তা সেকালের সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পালি ভাষায়, কারণ তাঁর উপদেশ তিনি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। তাই তাঁর রচিত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর প্রধান শিষ্যসম্প্রদায় তাঁর প্রচারিত বাণী সংগ্রহ ক'রে লিপিবদ্ধ করেন। সেই জন্যই তাঁর বাণীর আস্বাদ পরবর্তী যুগের মানুষের পাবার সুযোগ হয়েছিল। যে গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তার নাম 'ত্রিপিটক'।

[১৭] অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত
[১৮] ব্রহ্মসঙ্গীত—৮২৫

দীর্ঘকাল ধরে এই ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ উপদেশ ও নিয়মাদি পালনই ছিল বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। এ ধর্মে পূজা করবার কোনো দেবতা ছিলেন না, কারণ ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত বাণীতে দেবতা স্থান পান নি। ফলে যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতিও সে ধর্ম হতে নির্বাসিত হয়েছিল। এরূপ ধর্ম পৃথিবীতে পূর্বে বা পরে প্রচারিত হয় নি। তাই তার এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

ভগবান বুদ্ধের দার্শনিক মত যেমন দুরূহ তেমনি অনন্যসাধারণ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক বিচারে তিনি বুদ্ধিশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি গতানুগতিক পথ ধরে চলেন নি। স্বাধীন অবাধ চিন্তাশক্তির সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন তাই গ্রহণ করেছেন। দৃশ্যমান জগতের উপলব্ধির জন্য একদিকে দরকার জ্ঞাতার, অন্যদিকে জ্ঞেয় বস্তুর। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পরস্পরের সংযোগের ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্ব গড়ে ওঠে। ভগবান বুদ্ধ দৃশ্যমান জগতের ব্যাখ্যায় জ্ঞাতার অস্তিত্বের প্রয়োজন বোধ করেন নি। জ্ঞান আছে কিন্তু জ্ঞাতা নেই, অনুভূতি-পরম্পরা আছে, কিন্তু অনুভূতিকে গ্রহণ করতে আত্মা নেই, এই তাঁর মত। সেই কারণে তাঁর দার্শনিক মতকে নৈরাত্ম্য-বাদ বলে।

তখনকার সাধারণ মানুষের মনকে এই দুরূহ অসাধারণ দর্শন মুগ্ধ করে নি, কারণ তা তাদের বোধশক্তির অগোচর। ভগবান বুদ্ধ তা জানতেন। তিনি একবার একমুঠো গাছের পাতা হাতে ভরে নিয়ে শিষ্যদের বলেছিলেন,

"তোমরা বল ত, যে কটি গাছের পাতা এই মুঠোয় ভরেছি, তার বেশী কি তাদের পাতার পুঁজি নেই?"

উত্তরে তারা বলেছিল যে মুঠোর মধ্যে যে কটি পাতা স্থান পেয়েছে তারা ত গাছের অগণিত পাতার মাত্র কয়েকটি; গাছের পাতার ভাণ্ডার গণনা ক'রে শেষ করা যায় না।

তিনি তারপর বলেছিলেন, তিনিও বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, তা অনন্ত। তার সমগ্র ভাণ্ডার সাধারণ মানুষের নিকট উজাড় ক'রে দিয়ে কোনো লাভ নেই, যেটুকু তাদের কাজে লাগবে, সেটুকুই তিনি তাদের উপহার দেবেন।

সেই উপহার হল তাঁর 'আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। দেবতার উপাসনার পরিবর্তে তিনি এক নৈতিক জীবনের অনুশাসন স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন এই আদর্শের নৈতিক জীবনই তাঁর অনুগামী মানুষকে দুঃখ হতে পরিত্রাণের ক্ষমতা রাখে। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজন নেই। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই মার্গের আদর্শ হল এক উন্নত, শান্ত, সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নৈতিক আদর্শ। সর্ব-জীবের প্রতি বুকভরা প্রীতি নিয়ে, বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ হল সেই

আদর্শের মর্মবাণী। তার মূল শিক্ষা হল আত্মসংযম, অহিংসা ও সার্বজনীন কল্যাণসাধন।

এই সহজ, সুন্দর, নির্মল নৈতিক আদর্শ যে সে কালের মানুষকে মুগ্ধ করেছিল, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বিষয় বিষে জর্জরিত মানুষের মন সেদিন এই নূতন নির্দেশের মধ্যে শান্তির ও তৃপ্তির পথের সন্ধান পেয়েছিল। শিষ্যরা দেশময় বিহার প্রতিষ্ঠা করল। রাজা ভোগের পথ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হল। তিনি যে বাণী প্রচার করেছিলেন, দেশের নানা স্থানে প্রস্তরের বক্ষে খোদিত ক'রে তাকে স্থায়ী রূপ দিলেন এক সম্রাট। সাহিত্য-সেবীরাও পশ্চাদপদ রইলেন না। তাঁর রোমাঞ্চকর জীবনকে অবলম্বন ক'রে বুদ্ধ সাহিত্যিকরা নানা গল্প রচনা করলেন। তাদের তাই নাম হল 'থেরি গাথা'।

কিন্তু একদিন এমন এল যখন তাঁর ভক্তেরা তাঁর প্রচারিত ধর্ম পালন বা তাঁর জীবন আলোচনায় তৃপ্তি পেল না। তারা চাইল বাস্তব আকারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। যিনি পরম কারুণিক, যিনি মহর্ষি, যিনি রাজার কুমার হয়েও বিশ্ববাসীর দুঃখ নিবারণের জন্য সর্বত্যাগী, তিনি ত মানুষ নন, তিনি দেবতা। তাই তাঁকে দেবত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ক'রে আরম্ভ হল তাঁর পূজা অর্চ্চনা। দেবতা-বিহীন ধর্মে আবার দেবতা প্রতিষ্ঠিত হলেন। অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিত' লিখে তাঁর দেবত্বের মহিমা প্রচার করলেন। পূর্বে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তার নাম দেওয়া হল 'হীনযান'। কারণ, যা ভগবান বুদ্ধকে দেবতা বলে পূজা করতে শিখাল না, তা নিকৃষ্ট মার্গ বৈকি। আর যে নূতন ধর্ম তাঁকে সোজাসুজি দেবতা বলে পূজা করতে শিক্ষা দিল, তার নাম হল তাই 'মহাযান'।

তখন ভারতের মানুষ নূতন ক'রে তাঁকে নিয়ে মাতল। নির্মিত হল মন্দির দেশের নানা স্থানে। স্থাপিত হল সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি তার মাঝখানে। মহাসমারোহ সহকারে বুদ্ধের উপাসনা প্রবর্তিত হল। ভাস্কর ঢেলে দিলেন তাঁর সকল নৈপুণ্য তাঁর মূর্তিকে পাথরে খোদিত করতে। সাহিত্যিক এলেন তাঁকে নূতন ক'রে অর্ঘ্য দিতে নূতন সাহিত্য রচনা ক'রে। এবার পালি ভাষায় নয়, সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচিত হল। অশ্বঘোষ লিখলেন 'বুদ্ধচরিত'। 'ললিত বিস্তরে' তাঁর জীবনী আলোকিত হল। তাঁকে অবলম্বন ক'রে নানা গল্প রচিত হল 'অবদানশতকে'। আরও গল্প এল 'গাথা সংগ্রহে'। শুধু একটি জন্মের একটি জীবন আলোচনা ক'রে ভক্তের তৃপ্তি নেই। তাই পূর্ববর্তী নানা জন্মের কথা লিখিত হল 'জাতক মালায়'। ভাস্কর এসে স্তূপের তোরণে সেই জাতকের গল্প প্রস্তরে খোদিত করল।

এইভাবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই একটি অন্তর্বিপ্লবের দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সময়টি ঠিক হিন্দু ষড়্দর্শনের পরবর্তী যুগ। তাই বিশেষ সন্দেহ করবার কারণ আছে যে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের সংস্পর্শে এসেই সম্ভবত পৌরাণিক হিন্দু

ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। উভয় ধর্মের এই সমকালীন পরিবর্তনের মধ্যে বেশ আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে।

হিন্দুধর্মের উপনিষদের যুগে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হয় নি। এখানে পরাবিদ্যা চর্চাটাই যেন ধর্মের স্থান নিয়েছে। তার সঙ্গে হীনযান বৌদ্ধ-ধর্মের খানিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ ধর্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নি, আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চ্চনার কোনো ব্যবস্থা নেই, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসারে নৈতিক জীবন স্থাপন সেখানে আচার ও অনুষ্ঠানের স্থান নিয়েছে। হিন্দুধর্মের পরবর্তী যুগে দেখি পরজন্মবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। তখন পরজন্ম হতে মুক্তিই মানুষের পুরুষার্থ বলে পরিগণিত হয়েছে। সে বিষয় জ্ঞানমার্গে সাহায্য করতে ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। এই ষড়্দর্শনের পাঁচটির মধ্যে কোথাও ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই, কেবল একমাত্র যোগদর্শনে তাঁকে একটি স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণ মহিমায় সেখানে স্বীকৃতিলাভ করেন নি। বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় বহু উপাদানকে স্বীকার করা হয়েছে। তাদেরই মধ্যে ঈশ্বর যেন এক কোণে অনাদরে পড়ে রয়েছেন।

এইসব দেখে মনে হয় যেন উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ এবং দ্বৈতের ভিত্তিতে পরবর্তী কালের একেশ্বরবাদের ক্রম বিকাশের মধ্যে যোগদর্শনের অপরিণত ঈশ্বর যেন একটি মধ্যবর্তী অবস্থার নিদর্শন। সর্বেশ্বরবাদ এই অপরিণত ঈশ্বর-বাদের মধ্য দিয়েই ভক্তের একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছিল। এই সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে দেখলে এই বিভিন্ন অবস্থাগুলির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার সূত্র আবিষ্কার করা যায়। পুরাণের ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদের ক্রম বিকাশের পথে যোগদর্শনের পরিকল্পিত ঈশ্বর একটি মধ্যবর্তী অবস্থা।

তার পরের অবস্থায় দেখি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রায় একই সময় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বৌদ্ধধর্মে ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত নৈতিক ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাঁর ভক্তেরা তাঁকেই মন্দিরে স্থাপন ক'রে তাঁর উপাসনাকেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করল। ওদিকে হিন্দু যোগদর্শনের ঈশ্বরকে পূর্ণ ঈশ্বরের মর্য্যাদা দিয়ে ভক্তের ভগবানের পদে অধিষ্ঠিত করা হল। মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের সাড়ম্বরে পূজার পদ্ধতি প্রচলিত হল। সেই দেবতার মহিমা কীর্তনের জন্য পুরাণ এল। ওদিকে বৌদ্ধধর্মে ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন পূর্বতন জীবনের মহিমা কীর্তনের জন্য জাতকের গল্প রচিত হল।

সুতরাং এই ভাবে আমরা ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে প্রাচীনতার দিক হতে ক্রমান্বয়ে চারটি স্তর দেখতে পাই। সর্বপ্রাচীন ও প্রথমস্তর হল বেদের সংহিতার বহুদেবতাবাদ। দ্বিতীয় পরবর্তী স্তরে পাই ব্রাহ্মণের শেষ অংশের সর্বেশ্বরবাদ। তারপর পাই তৃতীয় স্তরে পরজন্ম খণ্ডনের জন্য ষড়্দর্শনের জ্ঞান-মার্গ, আর সবার শেষে চতুর্থ স্তরে পাই পুরাণের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে ভক্তি মার্গ। শেষের স্তরটি মহাযান বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক।

এদের মধ্যে প্রাচীন উপনিষদের যুগ প্রথম দুটি স্তরের সমসাময়িক। তার বৈশিষ্ট্য হল তা সর্বেশ্বরবাদের প্রচার করে। পরজন্মবাদ তখনো জন্মলাভ করে নি। সুতরাং মুক্তির স্পৃহা সে অবস্থায় মানুষের জাগে নি। সন্ন্যাসবাদের কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য আগ্রহাতিশয্যও তখন লক্ষিত হয় নি। তখন আশাবাদী সরল জীবনে মানুষ অভ্যস্ত। সুতরাং যে যে উপনিষদে এই লক্ষণগুলি পাওয়া যাবে তাদের এই শ্রেণীর প্রাচীন উপনিষদের পর্যায়ে ফেলতে পারি। যে যে উপনিষদে তার লক্ষণ পাওয়া যাবে না, তাদের পরবর্তী কালে রচিত বলে ধরে নিতে হবে। এখন আমরা এই প্রত্নতাত্ত্বিক রীতি প্রয়োগ ক'রে আমাদের উপনিষদ নির্বাচনের কাজটি সহজ ক'রে নিতে পারি।

পূর্বে যে ১১২ খানি উপনিষদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। (১) প্রথম, ব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী; (২) দ্বিতীয়, যোগ ও সন্ন্যাসবাদী; এবং তৃতীয় (৩) পৌরাণিক দেবতাপন্থী বা ভক্তিবাদী। এদের মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সহিত, দ্বিতীয়টির যোগ ষড়্দর্শনের যুগের জ্ঞানমার্গের সহিত এবং শেষের শ্রেণীটির যোগ পুরাণের যুগের ভক্তিমার্গের সহিত। সুতরাং যে উপনিষদগুলি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে তারাই আমরা যে উপনিষদগুলি বেছে নিতে চাই—তাই। এই শ্রেণীতে পড়ে এই উপনিষদগুলি :

(১) ঈশাবাস্য	(৭) কেন
(২) ঐতরেয়	(৮) কঠ
(৩) কৌষিতকী	(৯) শ্বেতাশ্বতর
(৪) তৈত্তিরীয়	(১০) প্রশ্ন
(৫) ছান্দোগ্য	(১১) মুণ্ড
(৬) বৃহদারণ্যক	(১২) মাণ্ডুক্য

এই উপনিষদগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এক, বিষয়বস্তু এক এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এক। সব কটি উপনিষদেরই পরাবিদ্যার উপর বিশেষ অনুরাগ। পরাবিদ্যা হল পরমসত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান। এদের আলোচ্য বস্তু হল ব্রহ্ম বা ভূমার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা। এদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সর্বেশ্বরবাদ। ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে অলক্ষ্যে বিরাজমান, তার বাহিরে কিছুই নেই. তার মধ্যেই জীবের জন্ম, মৃত্যু ও পরিবর্ধন—এই হল অল্প কথায় তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই উপনিষদগুলি যে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগের রচনা তার ভিন্ন ভাবে সমর্থক প্রমাণও পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের অংশ হিসাবে রচিত হয়েছে। ঈশাবাস্য উপনিষদের স্থান আমরা উপরের তালিকায় সর্বপ্রথম দিয়েছি। তার একটা কারণ আছে। এইটি হল একমাত্র উপনিষদ যা বেদের সংহিতার অংশ হিসাবে স্থান পেয়েছে। শুক্ল

যজুর্বেদের বাজসেনেয় সংহিতার শেষ অংশে এই উপনিষদটি স্থান পেয়েছে। সেই হিসাবে এটি সংহিতারই অংশ।

উপরের তালিকার আরও ছয়টি উপনিষদ বেদের ব্রাহ্মণের অংশ হিসাবে রচিত হয়েছে। তার বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। ঐতরেয় উপনিষদ ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যকের সহিত সংযুক্ত। কৌষিতকী উপনিষদ ঋগ্‌বেদের শাংখায়ন আরণ্যকের শেষ অংশ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সহিত সংযুক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক আরণ্যকের সহিত যুক্ত। তাই তার নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এই উপনিষদখানি আকারে যেমন বিরাট তেমনি সংযুক্ত হয়েছে সব থেকে বড় ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ। কেন উপনিষদ সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত আরণ্যকের শেষ অংশ। উপনিষদের প্রাচীনতার আর একটি চিহ্ন হল গদ্যে রচনা। এই ছয়টি উপনিষদের একটি বাদে সবগুলিই গদ্যে রচিত, কেবল কেন উপনিষদ আংশিকভাবে পদ্যে রচিত।

উপরের তালিকার বাকি পাঁচটি উপনিষদের সহিত বেদের কোনো ব্রাহ্মণের সংযোগ নেই। তাদের মধ্যে মাণ্ডুক্য ব্যতীত সবগুলি পদ্যে রচিত। এদের প্রাচীনতার প্রমাণ হল এদের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর প্রাচীনতা। তারা সকলেই প্রাচীন উপনিষদের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত। মনে হয়, এদের মধ্যে কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তুলনায় অপ্রাচীন। তাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সর্ব-ব্রহ্মবাদের আলোচনা আছে, তেমন সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের প্রভাবও কিছু পরিমাণ লক্ষিত হয়। কঠ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ দর্শনের 'অব্যক্ত' 'মহান' ও 'পুরুষের' ব্যাখ্যা পাই।[১৯] তেমনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগদর্শনের নির্দিষ্ট পথে পরম সত্তাকে জানবার উপদেশও আছে।[২০] সম্ভবত তারা দুই যুগের সন্ধিক্ষণে জন্মেছে।

এই উপনিষদগুলির প্রাচীনতার সমর্থনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তিনি অনেকগুলি উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখেছিলেন। বর্তমানে এক কৌষিতকী উপনিষদ ছাড়া উপরের তালিকার এগারখানি উপনিষদের উপর তাঁর রচিত ভাষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং শংকরাচার্য্যের সময় এই কয়খানি উপনিষদ যে প্রচলিত ছিল তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের প্রস্তাবিত উপনিষদের সামগ্রিক দর্শনের উপাদান সংগৃহীত হবে

[১৯] মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ কঠ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১১

[২০] তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং
মুচ্যতে সর্ব পাশৈঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬ ॥ ১৩

এই বারোখানি উপনিষদ হতে। কারণ, তাদের মধ্যেই আমরা ব্রাহ্মণের যুগের প্রাচীন উপনিষদের লক্ষণ বর্তমান দেখেছি। তাদের অবলম্বন করেই উপনিষদের দর্শন গড়ে উঠেছিল। তারাই প্রকৃত ব্রহ্মবাদী উপনিষদ।

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে উপনিষদের সমগ্র রূপটি সোজাসুজি পাওয়া দুষ্কর, কারণ তা, বিভিন্ন উপনিষদের বচনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। তাদের সংগ্রহ ক'রে, সুসংবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে তবেই দর্শনের সমগ্র রূপটি পাওয়া সম্ভব। এই সম্পর্কে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে এই দুরূহ কাজ খানিক পরিমাণে সহজ হবে এই কারণে, যে এই প্রাচীন উপনিষদ-গুলিকে অবলম্বন ক'রে কতকগুলি মূল ভাবধারা আত্মবিকাশ লাভ করেছে। সেই মূল ভাবধারাগুলিকে অবলম্বন ক'রে চললে উপনিষদের দর্শনের সামগ্রিক রূপটি পাওয়া সহজ হবে। সুতরাং সেই মূল ভাবধারাগুলির এখানে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে আমাদের আলোচনার পথ সহজ হয়ে আসবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনা সহজবোধ্য হবে।

প্রাচীন উপনিষদগুলির বিভিন্ন বাণীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের অবলম্বন ক'রে তিনটি মূল ভাবধারা আত্মবিকাশ লাভ করেছে। এ যেন ত্রিবেণী সঙ্গমের মত। তারা এমন ভাবে পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে তাদের পৃথক করা যায় না। উপনিষদের বচনগুলি এমনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান যে তাদের সত্যই পৃথক করা শক্ত হয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে অনুসরণ করলে তবেই প্রতি ভাবধারাটির পরিষ্কার রূপ চোখে পড়ে। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই তিনটি মূল ভাবধারার একটি পরিচয় দেওয়া হবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। উপনিষদের এই তিনটি মূল ভাবধারা হল এই :

(১) উপনিষদের যে বৈশিষ্ট্য সবার প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল ব্রহ্ম বিদ্যা সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ। উপনিষদে তার একটি পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে। তা হল পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যার বৈশিষ্ট্য হল এই বিদ্যা অর্জন ক'রে কেউ ব্যবহারিক কোনো সুবিধা লাভ করতে পারে না। জানবার ইচ্ছার নিবৃত্তিতেই তার সার্থকতা।

(২) উপনিষদের দ্বিতীয় মৌলিক ভাবধারা হল তার সর্বেশ্বরবাদ। এখানে যে দার্শনিক তত্ত্ব বিকাশলাভ করেছে তা বলে সকল বস্তু, সকল প্রাণী, সকল মানুষকে ব্যাপ্ত ক'রে একই সত্তা প্রকাশ নিয়েছেন। তাদের মধ্যেই তিনি আছেন, স্বতন্ত্র প্রকাশ তাঁর নেই।

(৩) তৃতীয়ত দেখি এই সর্বব্যাপী সত্তার উপলব্ধির ভিত্তিতে এক নূতন ধরনের নৈতিক আদর্শ প্রচারিত হয়েছে যা প্রীতি ও ভালবাসার বিস্তার দ্বারা স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজেছে।

এইবার আমরা এই তিনটি ভাবধারার পৃথক কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ দেব।

(১) মাণ্ডুক্য উপনিষদে সকল জ্ঞানকে দুটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, পরাবিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা। অপরা-বিদ্যার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি, কিন্তু পরাবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে কি কি বিষয় অপরা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় আছে ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বেদের যুগের মধ্যে এই যে গ্রন্থগুলির নাম করা হয়েছে তার অতিরিক্ত কোনো গ্রন্থ ছিল না। এই দশখানি গ্রন্থই যজ্ঞের কর্মকাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং এদের ব্যবহারিক বিদ্যার সমস্থানীয় বলা যায় এবং পরাবিদ্যাকে পারমার্থিক বিদ্যার সমস্থানীয় বলা যায়।

পরাবিদ্যার মুণ্ডক উপনিষদে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা বলে, "সেই অক্ষরকে জানতে যা সাহায্য করে, তাই হল পরাবিদ্যা।"[২১] এই বিদ্যায় কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটে না, এর সার্থকতা হল পরম সত্তা সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ। এই কৌতূহল মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম। শিশু প্রথম যখন কথা বলতে শেখে তখনই তার মনে এই কৌতূহল জন্ম নেয়। তাই ত তার বাবা মাকে সে তখন 'এটা কেন হয়,' 'ওটা কেন হয়,' এই ধরনের নানা প্রশ্ন তুলে ব্যতিব্যস্ত করে। বয়স হলে সেই কৌতূহলবৃত্তি মানুষকে নানা মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত করে। এমন কি বর্তমান যুগের প্রযুক্তি বিদ্যার চাপেও মানুষের এই স্বভাবজ ধর্ম একেবারে নিষ্পেষিত হয় নি। এখনো দেখি, কেবল অবিমিশ্র জানবার কৌতূহল নিবারণের জন্যও মানুষ অর্থ এবং সামর্থ্য ব্যয় করতে প্রস্তুত। তাই এখনো উইলসন শৈলশিখর বা পালোমার শৈলশিখরে নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে একশত ইঞ্চি বা দুইশত ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হয়। সেই কারণে উপনিষদের যুগে অপরা-বিদ্যা হতে পরাবিদ্যাই সম্মান পেয়েছে বেশী।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই পরাবিদ্যার আকর্ষণ কেবল দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মধ্যেই তীব্রভাবে বর্তমান ছিল। উপনিষদের নানা গল্পের মধ্যে এই সত্যটি ভারি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ধন, সম্পত্তি, প্রতিপত্তি, ইন্দ্রিয় সেবার আকর্ষণ—এদের থেকে, পরাবিদ্যার আকর্ষণ সাধারণ মানুষের নিকটও বেশী ছিল। তারা বলত, "বিত্ত মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না।"[২২] এই পরাবিদ্যা সম্বন্ধে কৌতূহল সেকালের মানুষের মনে এমন তীব্র ছিল বলেই

[২১] অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক ॥ ১ ॥ ১ ॥ ৬
[২২] ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ ॥ কঠ ॥ ১ ॥ ২৭

বোধ হয় দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা সভা সে যুগে একটি আকর্ষণীয় চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

(২) উপনিষদের দ্বিতীয় মূল ভাবধারা হল তার সর্বেশ্বরবাদ। তার সঙ্গে একেশ্বরবাদের পার্থক্য সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের দর্শনে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর কারণের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে; একটি উপাদান কারণ ও অপরটি নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার যখন ঘট গড়ে তখন তার মাটি লাগে। ঘটের মাটি হল উপাদান। তাই এখানে মাটি উপাদান কারণ। সে মাটিকে ঘটের আকার দেয় কুম্ভকার। তাই কুম্ভকার এখানে নিমিত্ত কারণ। গ্রীক দার্শনিক এরিস্‌টটল্‌ এই দুই শ্রেণীর কারণকে স্বীকার করেছেন এবং তার ওপর একটি অতিরিক্ত কারণের কথাও উল্লেখ করেছেন। তার তিনি নাম দিয়েছেন রূপ কারণ। মাটি ত এমনি ঘটের রূপ নেয় না, ঘটের একটি রূপ কুম্ভকারের মনে থাকে। তার চাকা আর হাতের আঙুলের চাপের সাহায্যে এক-তাল মাটিকে কুম্ভকার সেই রূপ দেয় তবেই ত ঘট সৃষ্টি হয়। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে রূপ কারণ। একেশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের পার্থক্য, সৃষ্টির সঙ্গে পরম সত্তার যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান, তা কোন্‌ শ্রেণীর, এই প্রশ্ন নিয়ে।

একেশ্বরবাদ বলে, ঈশ্বরের সঙ্গে সৃষ্টির যে কার্যকারণ সম্বন্ধ তা বাহিরের সম্বন্ধ। ঈশ্বর এখানে সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র। তিনি যেন সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। অবশ্য তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি হতে তিনি পৃথক। একেশ্বরবাদের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে যেহেতু ঈশ্বরের পৃথক সত্তা আছে, তাঁর ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায়। ফলে ভক্তের সহিত ভক্তির সূত্রে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব। সে অবস্থায় ভক্তির বিকাশের ক্ষেত্র বেশ প্রশস্ত হয়।

এইখানে সর্বেশ্বরবাদের সহিত একেশ্বরবাদের পার্থক্য। সর্বেশ্বরবাদ সৃষ্টির সহিত পরম সত্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। তা বলে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একই। ফলে নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ এবং রূপ কারণের শ্রেণী-বিভাগ এ ক্ষেত্রে অর্থবিহীন হয়ে পড়ে। পরমসত্তা সৃষ্টির উপাদান কারণও বটে, নিমিত্ত কারণও বটে এবং রূপ কারণও বটে। এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়ে ওতপ্রোতভাবে এক হয়েছে। স্রষ্টার কোনো স্বতন্ত্র প্রকাশ নেই, সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর প্রকাশ।

উপনিষদ একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। ব্যক্তিত্ব গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে উপাসনার প্রয়োজন উপনিষদের ঋষি অনুভব করেন নি। ভক্তিরসের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল না। সম্ভবত হৃদয়বৃত্তি হতে বুদ্ধিবৃত্তি তাঁদের বেশী প্রবল ছিল। তাই তাঁরা পরমসত্তাকে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে চান নি। বিশ্বের চারিপাশের নানা প্রশ্ন তাঁদের

মনকে কৌতূহলাবিষ্ট করেছিল। তাদের বিষয় জানতেই তাঁরা অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন। তাই পরম সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণই তাঁদের একমাত্র আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল। উপনিষদের আকর্ষণ ঈশ্বর নয় উপনিষদের আকর্ষণ পরাবিদ্যা।

জ্ঞানের মার্গে এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে বিশ্বের সব কিছু জড়িয়ে নিয়ে, সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে এক সর্বব্যাপী সত্তা বিরাজমান। তার বৈশিষ্ট্য হল তার সর্বব্যাপিত্ব। তার জন্যই তার নাম দিয়েছিলেন ব্রহ্ম।

তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বিশ্বের সকল বস্তু, সকল প্রাণী এই সর্বব্যাপী সত্তা হতেই উদ্ভূত। তার মধ্যেই তাদের জন্ম, তার মধ্যেই তাদের বিকাশ এবং তার মধ্যেই তাদের লয়। ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে, "বিশ্বে যা কিছু বিচরণশীল সবই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।"[২৩]

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে,

"এই বিশ্ব সেই অক্ষর হতে সম্ভূত হয়েছে।"[২৪]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, বিশ্বের সব কিছুই তাঁরই উপর প্রতিষ্ঠিত :

"রথচক্রের অরগুলি যেমন রথনাভি ও রথনেমিতে অবস্থিত তেমনি তাঁর উপর সব কিছু নির্ভরশীল।"[২৫]

ছান্দোগ্য উপনিষদে অল্পে এই কথাগুলিরই সারমর্ম বলেছে এইভাবে,

"এই সব কিছু ব্রহ্ম, তাতেই তাদের জন্ম, স্থিতি ও বিলয়।"[২৬]

এই সিদ্ধান্তে কার্য ও কারণ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো বিভেদ নাই। যে শক্তি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে তা হতে তা স্বতন্ত্র নয়, তার মধ্যেই তার প্রকাশ। তা কারণও বটে, কার্যও বটে, তা একাধারে উপাদান, নিমিত্ত ও রূপ কারণ। তা নির্ব্যক্তিক সত্তা, তা সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত।

উপনিষদের এই সর্বেশ্বরবাদের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তা বিশ্বের দুটি বিভিন্ন অবস্থার কথা স্বীকার করে। তার একটি প্রকট, অপরটি অপ্রকট; একটি স্থিতিশীল, অপরটি চঞ্চল; একটি অমর্ত্ত্য, অপরটি মর্ত্ত্য; একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের জগৎ, অপরটি ইন্দ্রিয়াতীত ও অপ্রকট। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে,

---

[২৩] ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ ॥ ঈশ ॥ ১

[২৪] অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ মুণ্ডক ॥ ১ ॥ ৭

[২৫] যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি......সর্বে লোকাঃ......সমর্পিতাঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫

[২৬] সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥ ১

"ব্রহ্মের দুটি রূপ, প্রকট এবং অপ্রকট, মর্ত্ত্য এবং অমৃত, স্থিতিশীল ও চঞ্চল।"[২৭]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চঞ্চল, গতিশীল জগৎ হল ব্রহ্মের প্রকট রূপ। উপনিষদের মতে তা ছাড়াও ব্রহ্মের একটি অপ্রকট, স্থিতিশীল অবস্থা আছে। স্থান ও কালের জগতে তার প্রকাশ নেই। এটি ব্রহ্মের অদ্বৈত অবস্থা।

ব্রহ্মের প্রকট রূপটি আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপে প্রতিভাত। এখানে ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব খণ্ডিত হয় এবং একটি দ্বৈতভাব আসে। এই দ্বৈতভাব হতেই আমাদের বিশ্বের অনুভূতি আসে। এই দ্বৈতভাবের একটি দিক হল জ্ঞাতা এবং অপরটি হল জ্ঞেয়। তাদের পরস্পরের সংঘাতেই গড়ে ওঠে চঞ্চল দৃশ্যমান জগৎ। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে,

"যেখানে দ্বৈতের মত হয় সেখানেই এক অপরকে জানে, এক অপরকে দেখে, এক অপরকে স্পর্শ করে ইত্যাদি।"[২৮]

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব যেন তাঁতে বয়ন হচ্ছে এমন একখানি বস্ত্র। তার টানা আছে, পোড়েন আছে; মাকু চলেছে টানা ও পোড়েনকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ক'রে। তবেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে বিচিত্রিত বিশ্বরূপ বসনখানি রূপ নিচ্ছে। জ্ঞাতা যদি টানা হয়, জ্ঞেয় হবে পোড়েন। তাদের পারস্পরিক সংযোগই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব।

অপ্রকট রূপে যিনি অদ্বৈত, প্রকট রূপে তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপী দুই গায়কের দ্বৈত সঙ্গীত। দুটিই ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ, কোনোটি নিকৃষ্ট নয়। উপনিষদের দর্শনের মূল কথা হল দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে যে দৃশ্যমান বিশ্ব প্রকট হয়েছে তা একই সর্বব্যাপী সত্তার মূর্তরূপ। তার মর্মবাণী হল সব কিছুই একই সত্তার প্রকাশ, যা অণু হতে অণীয়ান্ এবং যা মহৎ হতে মহীয়ান্, উভয়ে মূলত একই, উভয়েই একই সত্তার প্রকাশ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,

"যিনি এই মানুষে আছেন আর যিনি এই আদিত্যে আছেন, উভয়েই এক।"[২৯]

(৩) উপনিষদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার নৈতিক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য। এই সর্বেশ্বরবাদের একত্ববোধ হতেই উপনিষদের নৈতিক আদর্শের জন্ম। উপনিষদের একটি মূল সমস্যা হল স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব। মানুষ নিজেকে

---

[২৭] দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ
মর্ত্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৩॥ ১

[২৮] যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি
ইতর ইতরং জানীতে......॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ১৪

[২৯] স যশ্চায়ং পুরুষে॥ যশ্চাসাবাদিত্যে॥
স একঃ॥ তৈত্তিরীয়॥ ২॥ ৮

সব থেকে বেশী ভালবাসে। তাই স্বভাবতই মানুষ স্বার্থপর হয়, অপরের সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ হলে সে যেটা নিজের অনুকূল সেই পথ গ্রহণ করে।

উপনিষদ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছে নূতন পথে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই তার সমাধান খুঁজেছে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ধন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের ভিত্তিতে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার বিস্তারে। এই পথেই মানুষের স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে। ঠিক কথা বলতে কি মানুষ সকল সময়েই যে স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে, তা নয়। এমন কি সাধারণ মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থত্যাগ করতে সক্ষম এবং পরার্থ সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। প্রয়োজন হলে বন্ধু বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ করা আনন্দের বিষয় মনে করবে। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। যেখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, সেখানে এমন ত্যাগ নেই, যা মা করতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরার্থবৃত্তি দুর্লভ নয়।

কেন এমন হয়? উপনিষদে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে এই ভাবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গল্প আছে যে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী তাঁকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই যে জায়ার নিকট পতি প্রিয় হয়, তা পতির জন্য নয়, পতির নিকট যে জায়া প্রিয় হয় তা জায়ার কারণে নয়, মাতার নিকট যে পুত্র প্রিয় হয়, তা পুত্রের কারণে নয়। তবে কিসের কারণে তাঁরা এত প্রিয় হয়? তিনি বলেছেন, "আত্মার কারণে সকলে প্রিয় হয়ে ওঠে।"[৩০] আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, সাধারণ মানুষ, সকলকে ব্যাপ্ত ক'রে আত্মা বিরাজমান। সেই কারণেই, মানুষের নিকট মানুষ এমন প্রিয় হয়ে ওঠে, সেই কারণেই মানুষের হৃদয় পানে হৃদয় টানে। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তিই হল এক সর্বব্যাপী একত্বের উপলব্ধি। এই ঘনিষ্ঠতাবোধই ভালবাসা, মায়া, মমতার বিস্তারকে সম্ভব করে। আমরা সকলে একই বিরাট সত্তার অন্তর্ভুক্ত, এই বোধ জাগলে ভালবাসার বিস্তার আত্মীয়, বন্ধু বা গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা সকল মানুষ, সকল জীবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। একত্ববোধ বা ঘনিষ্ঠতাবোধ নিশ্চিত ভালবাসার বিস্তারকে সাহায্য করে। এ সত্য উপনিষদের ঋষি আবিষ্কার করেছিলেন। এই কারণে ঘনিষ্ঠতাবোধের ভিত্তিতে আত্মীয়তাবোধের উদ্রেক এবং আত্মীয়তাবোধের ভিত্তিতে স্বার্থান্বেষণে সংযম অভ্যাস করতে তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাই ঈশ উপনিষদ বলে, মানুষ ভোগ করুক, কিন্তু এমন সংযমের সহিত করুক যাতে অন্যের স্বার্থের হানি না হয়। তার কারণ, অন্যের স্বার্থের হানি

[৩০] আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬

নিজের স্বার্থের হানিরই সামিল হবে। কারণ, আমাদের সকলকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ত একই সত্তা বিরাজমান। সেই জন্যই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, "সব কিছুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই ত্যাগের সহিত ভোগ করা উচিত।"[৩১] এই নীতি অনুসারে ভোগে বাধা নেই, অন্যের স্বার্থ হানি ক'রে ভোগে বাধা আছে। এ কথা খুবই সত্য যে হৃদয়বৃত্তির বিস্তারে স্বার্থকে শোধন করা যায়। যখন আমরা কোনো অপরিচিত মানুষকে দেখি, তার প্রতি সোজাসুজি আমরা আকৃষ্ট হই না। কিন্তু কথা কইতে কইতে যদি কোনো যোগ সূত্রের আবিষ্কার হয়ে পড়ে, তখনই পরস্পরের সহিত বিশেষ রকম আকৃষ্ট হই। এক জায়গায় বাড়ী বা এক কলেজে পড়তাম, বা একটি বিশেষ মানুষের উভয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা আছে, এইরূপ একটি পরোক্ষ সম্বন্ধ আবিষ্কার হয়ে গেলে পরস্পরের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। উপনিষদের নীতি বলে সকলেই যে আমাদের একান্ত আপন জন এই সত্য যদি উপলব্ধি হয়, তা হলে কারও অপরের স্বার্থহানি করবার প্রবৃত্তি আসবে না। সন্তানের স্বার্থ যেমন ভালবাসার ভিত্তিতে মায়ের স্বার্থের সহিত একীভূত হয়ে যায়, তেমন সকলের একত্ববোধ আমাদের স্বার্থকে পরার্থের সহিত সংযুক্ত করবে।

এই সামগ্রিক কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের পথই হল শ্রেয়ের পথ। স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বকে উপনিষদে যথাক্রমে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রেয় বলে, কেবল নিরবচ্ছিন্ন ভোগের পথে যাও, অন্যকে বঞ্চিত ক'রেও ভোগ করতে দ্বিধা বোধ কোরো না। তা আপাত-দৃষ্টিতে মধুর, কিন্তু সামগ্রিক কল্যাণের সহিত যুক্ত নয় বলে পরিশেষে বিপদ ঘটায়। সকলকে আপন জন বলে জেনে পরার্থের দ্বারা স্বার্থকে শোধিত ক'রে নেওয়াই শ্রেয়ের পথ। শ্রেয় বলে সকলেই তোমার আপন জন, সকলের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোগ কর, ভাগ ক'রে ভোগ কর। এখানে ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত কর্ম সামগ্রিক কল্যাণের সহিত সংযুক্ত, তাই তা নিজেরও কল্যাণ আনে।

---

[৩১] ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ॥
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ॥ ঈশ॥ ১

তৃতীয় অধ্যায়

পরাবিদ্যা

[অপরা-বিদ্যা—কর্মকাণ্ডের সমস্থানীয়। পরাবিদ্যা—জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মবিদ্যার সমস্থানীয়। উপনিষদে পরাবিদ্যার আকর্ষণ—আদেশ কাকে বলে—শ্বেতকেতুর গল্প—নচিকেতার গল্প—মৈত্রেয়ীর গল্প—যাজ্ঞবল্ক্যের গল্প। পরাবিদ্যা উৎকৃষ্ট চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থারূপে পরিগণিত—জনক ও অজাতশত্রুর বিতর্ক সভা—জনকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ঘনিষ্ঠতা।]

উপনিষদের যুগের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তির বিদ্যা আহরণের প্রতি সুনিবিড় অনুরাগ। অবিদ্যার সংস্পর্শ এবং অজ্ঞানের অন্ধকার তাঁদের কাছে অতি ঘৃণার বস্তু ছিল এবং সেই পরিমাণে তাদের পরিবর্জন করবার জন্য মানসিক সংকল্পও গভীর ছিল। উপনিষদের ঋষির প্রার্থনায়, কথায়, উপদেশে অবিদ্যার প্রতি এই সুগভীর বৈরাগ্যের অভিব্যক্তির নিদর্শন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পেয়ে থাকি। উপনিষদের ঋষির একটি সুপরিচিত প্রার্থনা আছে এইরকম,

"মিথ্যা হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও,
অন্ধকার হতে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও,
মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও।"[১]

উপনয়নান্তে ব্রাহ্মণ বালক যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ ক'রে থাকে, তারও মূল সুর একই। সেখানে স্রষ্টার নিকট ধন, বা অর্থ, বা সম্পত্তি প্রার্থনা করা হয় নি, প্রার্থনা করা হয়েছে ধী শক্তির, যাতে তাঁকে সেই ধী শক্তির সংযোগে ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রার্থনাটির বচন এই রকম,

সেই স্রষ্টার বরণীয় জ্যোতিকে
যাতে আমরা বুঝতে পারি,
তিনি আমাদের ধী শক্তিযুক্ত করুন।"[২]

সেইরূপ যারা অবিদ্যায় রত, সত্য এবং বিদ্যার পথ হতে ভ্রষ্ট তাদের প্রতি

---

[১] অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥ বৃহদারণ্যক॥ ১॥ ৩॥ ২৮

[২] তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৬॥ ৩॥ ৫

উপনিষদের ঋষি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন এবং পরলোকে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছেন। ঈশ উপনিষদে আছে,

"যারা অবিদ্যার উপাসনা করে
তারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে।"[৩]

বৃহদারণ্যক উপনিষদ অন্ধকারে তাদের পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তাদের জন্য পরলোকে আরও ভয়াবহ শাস্তির বিধান করেছে। সেখানে বলা হয়েছে,

"যারা অ-পন্ডিত এবং বিদ্যাহীন মানুষ
তারা মৃত্যুর পরে সেই লোকেতে গমন করে
যার নাম অনন্দ এবং যা গভীর অন্ধকারে আবৃত।"[৪]

যে লোকে তারা যাবে তা শুধু অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়, সেখান হতে আনন্দ সম্পূর্ণ নির্বাসিত। তাই তার নাম অনন্দ।

বিদ্যাহীন মানুষ শুধু ঘৃণার পাত্র নয়, অনুকম্পার পাত্রও বটে, কারণ তার বিদ্যার অভাব তার শক্তি ও সামর্থ্যকে অত্যন্ত সংকুচিত করে। ব্যবহারিক জগতেও বিদ্যাহীন মানুষ আমল পায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে,

"বিদ্যা এবং অবিদ্যা বিভিন্ন বস্তু।
মানুষ যা বিদ্যার সাহায্যে করে,
তাই শক্তিপুষ্ট হয়।"[৫]

একদিকে যেমন অবিদ্যাকে বর্জন ক'রে বিদ্যার প্রতি তাঁদের পক্ষপাত দৃষ্ট হয়, অপরদিকে তেমন বিদ্যার মধ্যেও তাঁদের এক শ্রেণীর বিদ্যার প্রতি পক্ষপাত তুলনায় বেশী ছিল। তাঁরা সমগ্র বিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, একটি অপরা-বিদ্যা এবং অন্যটি পরাবিদ্যা। দুটি বিদ্যার পার্থক্যের পরিচয় উপনিষদেই পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে মুন্ডক উপনিষদের এই বচনটি লক্ষ্য করা যেতে পারে,

"ব্রহ্মবিদ্‌রা বলে থাকেন যে দুটি বিদ্যা আমাদের অর্জন করতে হবে, পরা এবং অপরা। অপরা হল ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। আর পরা হল তাই যার দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়।"[৬]

---

[৩] অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে॥ ঈশ॥ ৯

[৪] অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা
স্তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাবুধো জনাঃ॥
বৃহদারণ্যক॥ ৪॥৪॥ ১১

[৫] নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি
শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি॥ ছান্দোগ্য॥ ১॥ ১॥ ১০

[৬] দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥
মুন্ডক॥ ১॥ ১॥ ৫—৬

উপরে অপরা-বিদ্যা কাকে বলে তার উত্তর পাই না, পরিবর্তে অপরা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির একটি তালিকা পাই। অপরপক্ষে পরাবিদ্যার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার তাৎপর্য বুঝাতে আমাদের এই বিষয়গুলির একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। সে কালের বিদ্যার মূল বিষয়গুলি বেদকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। আমরা বর্তমানে সরস্বতী পূজার দিনে যে মন্ত্রটি পাঠ ক'রে সরস্বতীকে অঞ্জলি দিয়ে থাকি, তার সহিত অনেকেই সুপরিচিত। তার যা বচন তা এই বৈদিক যুগের সাহিত্যের মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়। তা বলে,

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোনমঃ
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।

এই স্তোত্র সরস্বতীকে ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই, আরও করে সকল বিদ্যায়তনকে এবং কয়েকটি গ্রন্থকে। সেই গ্রন্থগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হল বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্ত। চারটি বেদের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বেদান্ত উপনিষদের সমার্থবোধক শব্দ। আর বেদাঙ্গ হল যে ছয়টি গ্রন্থের নাম চারটি বেদের অতিরিক্তভাবে মুণ্ডক উপনিষদের অপরা-বিদ্যার তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে, তাই। তাদের যে বেদাঙ্গ বলা হত, তা অকারণে নয়। কারণটি হল তারা বৈদিক ক্রিয়াবিধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একথাটি বুঝতে হলে এই বেদাঙ্গগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হবে।

(১) প্রথমে পাই শিক্ষা। বেদপাঠ অভ্যাস করতে হলে বেদের সংহিতার পদগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তা করতে সংহিতার পদগুলির পরস্পরের সহিত সন্ধি-বিচ্ছেদ ক'রে পড়তে হয়। তাকে বলা হয় পদপাঠ। শিক্ষাগ্রন্থের বিষয় হল তাই। শিক্ষা সংহিতাকে পাঠ করতে শিক্ষা দেয়।

(২) কল্প কতকগুলি সূত্র-আকারে রচিত। তাদের চারটি ভাগ আছে। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। বেদে যে সব যজ্ঞের বিবরণ আছে শ্রৌতসূত্রে তাদের সুসংবদ্ধ পরিচয় দেওয়া আছে। গৃহ্যসূত্রের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। আমাদের যে দশবিধ সংস্কারের ব্যবস্থা আছে আধুনিককালেও তাদের মধ্যে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সহিত আমরা পরিচিত। এই সংস্কারগুলিতে যে যজ্ঞবিধি পালন করতে হ'য় তার ব্যবস্থা দেওয়া আছে গৃহ্যসূত্রে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলি কত প্রাচীনকালের জিনিস। ধর্মসূত্রে আমরা পাই সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ। আমাদের বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থাকে নিয়ে তা আলোচনা করে বলে তা ধর্মসূত্র। শুল্বসূত্রগুলির ঘনিষ্ঠতা শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে। যজ্ঞ করতে বেদি করতে হয়। বিভিন্ন যজ্ঞের বিভিন্ন আকারের বেদি সম্বন্ধে এখানে নির্দেশ দেওয়া আছে।

(৩) ব্যাকরণের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। আমাদের দেশে ব্যাকরণের চর্চা সুরু হয়েছিল বহু প্রাচীনকাল হতে। আমরা পাণিণির ব্যাকরণের নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মানুষ।[৭] তিনি ৬৪ জন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন। বেদ পাঠের জন্যও যে ব্যাকরণের ব্যব্যহার ছিল তা বেশ অনুমান করা যায়। তা না হলে ব্যাকরণকে বেদাঙ্গের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে কেন?

(৪) নিরুক্ত হল বর্তমানকালে আমরা যাকে অভিধান বলি তার প্রাচীন রূপ। বেদে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের তালিকাকে বলা হত নিঘণ্টু। তাতে শব্দই থাকত, তার অর্থ দেওয়া হত না। নিরুক্ত দেয় সেই শব্দগুলির ব্যাখ্যা। সুতরাং নিরুক্তকে বৈদিক শব্দের অভিধান বলতে পারি।

(৫) যজুর্বেদ ছাড়া সংহিতার অধিকাংশই পদ্যে রচিত। বিভিন্ন স্তোত্র-গুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ প্রভৃতি নানা বৈদিক ছন্দের আমরা নাম শুনেছি। ছন্দ নামে বেদাঙ্গে এই বিভিন্ন ছন্দের পরিচয় মেলে।

(৬) জ্যোতিষেরও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বিভিন্ন যজ্ঞ বিভিন্ন ঋতু, বিভিন্ন কাল এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হত। তাই পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন সংবৎসর প্রভৃতি, গ্রহনক্ষত্রের গতির উপর নির্ভর-শীল বিষয়গুলির সঠিক নির্দ্ধারণের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই যজ্ঞের আনুষঙ্গিক সহায়ক বিদ্যা হিসাবে জ্যোতিষ বেদাঙ্গটি গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং দেখা যায় যে অপরা-বিদ্যার তালিকায় যে যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ পাই, তারা বৈদিক যুগের মূল গ্রন্থ। তার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই চারটি বেদ এবং তাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছয়টি বেদাঙ্গের সম্পর্ক বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত। অর্থাৎ এদের সম্পর্ক হল ধর্মাচরণের দিকটির সহিত। গৃহ্য ও ধর্মসূত্র কল্পের অঙ্গ। সেখানে ধর্মবহির্ভূত নানা সামাজিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। মোটামুটি তা হলে তাৎপর্য হল এই যে বৈদিক সাহিত্যের যে অংশ বৈদিক ধর্মাচরণের বিষয়ের সহিত জড়িত, তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিদ্যা বলে পরিগণিত হয়েছে। তার স্থান হয়েছে সামাজিক জীবনে যে বিদ্যা কাজে লাগে তার সহিত এক সঙ্গে। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে এদের ব্যবহারিক বিদ্যার সমস্থানীয় বলা যেতে পারে। যে বিদ্যা ধর্ম-আচরণের সহায়ক, যে বিদ্যা সমাজ জীবনযাপনে সহায়ক, উভয়েই অপরা-বিদ্যা বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিদ্যা।

পরাবিদ্যার যা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা বলে, তার বিষয়বস্তু নিয়েই তার

[৭] Belvelkar, System of Sanskrit Grammar, p. 15 দ্রষ্টব্য।
বেরিডেল কীথের মতে পাণিণি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর A History of Sanskrit Literature, p. 426 দ্রষ্টব্য।

বৈশিষ্ট্য এবং তার বিষয়বস্তু হল অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞান। অক্ষর অর্থে বুঝি ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্ম, তিনি সব কিছু জড়িয়ে বিদ্যমান। তাঁর মধ্যে ধ্বংস আছে সৃষ্টি আছে, মৃত্যু আছে জন্ম আছে, কিন্তু সব জড়িয়ে নিয়ে বিশ্ব আছে। অংশের বিনাশ আছে, সমগ্রের বিনাশ নাই। তাই ব্রহ্মের বিনাশ নাই, তাই তিনি অক্ষর।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মের পরিবর্তে আর একটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সেটি হল ভূমা। যা সব থেকে বিরাট, সব থেকে বড়, তাই হল ভূমা। যা সব থেকে বড়, তা সকল বস্তুরই আধার। ব্রহ্ম অর্থেও তাই বুঝি। যিনি বিস্তৃত হয়ে সব কিছু পরিব্যাপ্ত ক'রে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষদ বলে সব কিছু জড়িয়ে ব্রহ্ম, তাতেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূমারও একই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ভূমা হল তাই, যা সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে সর্বত্র বিরাজমান। সেখানে বলা হয়েছে,

"তাই হল নীচে, তাই উপরে, তাই পশ্চাতে, তাই সামনে, তাই দক্ষিণে, তাই উত্তরে—তাই হল বিশ্বে যা কিছু আছে সে সমস্ত।"[৮]

এই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এবং একই অর্থে আর একটি শব্দের বহুল ব্যবহার আমরা উপনিষদে পেয়ে থাকি। এই শব্দটি হল 'আত্মন্'। এই আত্মা শব্দের পরবর্তীকালে এবং বর্তমানে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। তাকে জীবাত্মা বা ব্যক্তিবিশেষের আত্মার সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার আত্মন্ শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং মানুষের আত্মা নির্দেশ করতে তাকে জীবাত্মা বলা হয় ও ব্রহ্মকে নির্দেশ করতে তাকে পরমাত্মা বলা হয়। উপনিষদে কিন্তু এই শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার হয় নি। সেখানে জীবাত্মা বা পরমাত্মা বলে কোনো শব্দের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। সেখানে 'আত্মন্' শব্দটি ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পাই, উষস্ত যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করছেন,

"যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সবার অভ্যন্তরে আত্মারূপে বিরাজমান তাঁকে বুঝিয়ে দিন।"[৯]

ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা আত্মা ও ব্রহ্মের একই অর্থে ব্যবহার দেখতে পাই। সেখানে আছে, একবার মহাশ্রোত্রিয়গণ মীমাংসা করতে প্রবৃত্ত হলেন, "আত্মা কি, ব্রহ্ম কি?"[১০]

ঐতরেয় উপনিষদে এবিষয় আরও স্পষ্ট উক্তি আছে। সেখানে বলা

---

[৮] স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭॥ ২৫॥ ১

[৯] অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্কোহিতি হোবাচ্ যদ্ সাক্ষাৎ পরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তন্ মে ব্যাচক্ষ ইতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৩॥ ৪॥ ১

[১০] কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৫॥ ১১॥ ১

হয়েছে, "পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিল, আর কিছু ছিল না।"[১০(ক)] সুতরাং উপনিষদে অক্ষর, ব্রহ্ম, ভূমা ও আত্মা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপনিষদে যাকে পরাবিদ্যা বলা হয়েছে তার আলোচ্য বিষয় হল পরম সত্তা। এ বিষয়ও উপনিষদের একটি বিশেষ নির্দেশ ছিল। শুধু দার্শনিক জ্ঞান উপনিষদের যুগের মানুষকে সন্তুষ্ট করত না। তাঁরা চাইতেন এমন জ্ঞান যা দার্শনিক তত্ত্বের সারমর্মটুকু এনে দেবে। তা হবে এমন জ্ঞান যাকে জানলে আর কিছু জানবার থাকবে না, বিশ্ব সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্বটুকু জানা হয়ে যাবে। তাঁদের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি উপনিষদের নানা বচন ও গল্পের মধ্যে বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আরুণি ও শ্বেতকেতুর গল্পটি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। আরুণি পিতা আর শ্বেতকেতু ছিলেন তাঁর পুত্র। পুত্র শ্বেতকেতু দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস ক'রে, বিদ্যা অর্জন শেষ ক'রে গৃহে ফিরে এলেন। তাঁর নিশ্চয় ধারণা ছিল তিনি খুব পণ্ডিত হয়ে এসেছেন। তা না হলে অহংকারে তাঁর এমন বুক ফুলে উঠবে কেন যে বাড়িতে কারও সঙ্গে আলাপ করতেই তাঁর কুণ্ঠাবোধ হবে?

তাঁর সেই উন্নাসিকতা-ভাব পিতারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তখন তিনি স্পষ্ট তাঁকে বললেন,

"শ্বেতকেতু, তুমি অহংকারে নিজেকে মানী লোক মনে ক'রে চুপ ক'রে রয়েছ। তুমি 'আদেশ' কাকে বলে জেনে এসেছ?"[১১]
ভাবটা হল তোমার যে এত অহংকার দেখছি, তোমার বিদ্যার দৌড় কতখানি?

শ্বেতকেতু তখন আকাশ থেকে পড়লেন। জানা ত দূরে থাক, তিনি 'আদেশের' কথাই শোনেন নি। তাই পিতা আরও ব্যাখ্যা ক'রে বললেন,

"আদেশ হল তাই যা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, যার সম্বন্ধে ধারণা নাই তার ধারণা হয়, যা অবিজ্ঞাত তা বিজ্ঞাত হয়।[১২]

তখন শ্বেতকেতু বললেন, আমার গুরু এ বিষয় কিছু জানতেন না, জানলে কি আর এ বিষয় আমাকে কিছু না বলতেন? এতক্ষণে পুত্রের অহমিকাবোধ চূর্ণ হল। খেয়াল হল যে পিতা এমন তত্ত্ব জানেন যা তাঁর গুরুর অগোচর। তখন পিতাকেই গুরুত্বে অধিষ্ঠিত ক'রে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে চাইলেন।

গল্পটির তাৎপর্য এই যে 'আদেশ' হল সেই ধরনের জ্ঞান যা জানা হয়ে গেলে অন্য বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান লাভ হয়ে যায়। এই সম্পর্কে আরুণি তাঁর কথাটি বোঝাবার জন্য একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। আমরা অনেক

১০(ক) আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ চন মিষৎ ॥ ঐতরেয় ॥ ২ ॥ ১

১১ তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনানূচানমানী স্তব্ধোঽসি উত তমাদেশমপ্রাক্ষ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৫ ॥ ১॥ ২

১২ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬ ॥ ১ ॥ ৩

দ্রব্য দেখি যার উপাদান হল মৃত্তিকা, যেমন কলসী, সরা, হাঁড়ি, গামলা ইত্যাদি। কুম্ভকারের হাতে তারা বিভিন্ন রূপ পেয়েছে এবং সে রূপের বিভিন্নতা বোধগম্য করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম পেয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যা মৌলিক সত্য তা হল, সবই মৃত্তিকা হতে উদ্ভূত, মৃত্তিকাই তাদের উপাদান। তাদের পার্থক্যটা বাহিরের পার্থক্য, রূপের পার্থক্য এবং নামের পার্থক্য। আরুণি তাই পুত্রকে বলেছেন,

"হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানলে সকল মৃন্ময় বস্তু সম্বন্ধে জানা হয়ে যায় যে তাদের রূপগত বিকারটি নাম দিয়েই ঘটেছে, তাদের সম্পর্কে মূলগত সত্য হল যে তারা মৃন্ময়, আদেশও সেইরকম।"[১৩]

বিশ্ব সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান কি তাই জানতেই উপনিষদের ঋষি উৎসুক ছিলেন। মৌলিক জ্ঞান হল তাই যা জানলে কোনো বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ হয়ে যায়, যেমন মৃণ্ময়—বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে তাদের মৃত্তিকা উপাদান। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিশ্ব সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান কি ভাবে পেতে হবে সে বিষয় একটি নির্দেশ আছে। কোনো বাদ্যযন্ত্র যদি বাজান হয় তা নানা শব্দ উৎপাদন করে। সেই বিভিন্ন শব্দগুলিকে আয়ত্ত করতে এখন আমরা যদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি আমাদের চেষ্টা বৃথা হবে। অপর পক্ষে বাদ্যযন্ত্রটিকে যদি আয়ত্ত করি শব্দ উৎপাদনের ক্ষমতা আমার হাতে এসে যায়। তাই বলা হয়েছে,

"দুন্দভিকে আঘাত করলে তার উৎপাদিত বাহ্য শব্দ দিয়ে তাকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভিকে গ্রহণ করলে দুন্দুভি বাদনের শব্দ গৃহীত হয়।"[১৪]

বিশ্বের মূলে যে তত্ত্ব তাকেই ধরতে হবে, তাকে জানলেই অন্য সব জানা হয়ে যায়, এই হল যুক্তি।

তাই উপনিষদে বলে,

"যা হতে এই বিভিন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে, যার সাহায্যে জন্মলাভ ক'রে তারা জীবন ধারণ করে, যেখানে শেষে ফিরে গিয়ে বিলীন হয়, তাই জিজ্ঞাসা কর, তাই ব্রহ্ম।"[১৫]

এইভাবে উপনিষদ তার প্রতিপাদ্যে এসে পড়ে। ব্রহ্ম সকল কিছুর মূলে, কাজেই ব্রহ্মকে জানলেই সব জানা হয়ে যায়। সেই কারণে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দর্শনগত মৌলিক জ্ঞান।

[১৩] যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ এবং সৌম্য স আদেশো ভবতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৫॥১॥ ৪—৬

[১৪] স যথা দুন্দুভের্হন্যা মানস্য ন বাহ্যাং শব্দাং শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ৭

[১৫] যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ যেন জাতানি জীবন্তি॥ যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি চ॥ তদ্বি জিজ্ঞাসস্ব॥ তদ্ ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়॥ ভৃগুবল্লী॥ ৩॥ ১

সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে যা জ্ঞান দিতে পারে তাই হল পরাবিদ্যা, আর সকল বিদ্যাই বাহ্যিক। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে গল্প আছে যে ভবঘুরে নারদ মুনি একদিন সনৎকুমার ঋষির কাছে এসে বিদ্যাচর্চা করতে চাইলেন। তখন সনৎকুমার বললেন, সে ত উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু তার আগে নারদ কি কি পড়েছেন জানলে সুবিধা হবে। তা হলে পরে তিনি তার পর হতে উচ্চতর বিষয় পড়াতে পারবেন। তখন নারদ যত কিছু পড়েছিলেন তার যা লম্বা তালিকা দিলেন তা হল এই : ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে বিদ্যা, দেবতা সম্বন্ধে বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেববিদ্যা, জলবিদ্যা।

তখন সনৎকুমার বললেন, তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছ সব কিছুই হল নাম। অর্থাৎ এরা সবই হল অপরা-বিদ্যা, এরা নিকৃষ্ট বিদ্যা। এরা মূলতত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মূলতত্ত্ব কি, সে বিষয় তিনি এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তিনি মূলগত তত্ত্বের অন্বেষণে বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে পরীক্ষা ক'রে, যে বিষয়টি সবার মূলে আছে তাকে বলেছেন ভূমা। এই ভূমা হল সবার মূলে এবং তাকেই জানতে হবে।

সেকালের মানুষের পরাবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ কি গভীর ছিল তা হৃদয়ঙ্গম হয় যখন দেখি তা জনসাধারণের একটি উৎকৃষ্ট চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থারূপে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্তবিনোদনের একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হল ফুটবল খেলা। এই খেলায় আকর্ষণ নেই এমন মানুষ বোধ হয় বাংলা দেশে কমই আছে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ এমন কি মহিলারাও ভাল খেলা হলে গড়ের মাঠ ছেয়ে ফেলে।

সেকালে প্রাচীন রোমে 'এরেনা' বা প্রেক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা থাকত। সেখানে রাজা আসত, প্রজা আসত, সকলে মিলে পশুতে মানুষে লড়াই দেখত। রোমানদের মধ্যে তাই ছিল সব থেকে চিত্তাকর্ষক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।

উপনিষদের যুগে আমাদের দেশে তার স্থান নিয়েছিল দার্শনিক বিতর্ক-সভা। উন্মুক্তস্থানে সভা বসত। সেখানে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। রাজা স্বয়ং আসতেন। কিন্তু তামাসার জন্য সেখানে পশুর লড়াইএর ব্যবস্থা ছিল না। চিত্তবিনোদনের জন্য যে রস-পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। সেখানে বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত আসতেন। তাঁদের মধ্যে নানা দার্শনিক বিতর্ক হত। সেই তর্কে যিনি জিততেন রাজা তাঁকে পুরস্কার দিতেন। সেকালে সাধারণ মানুষ দার্শনিক বিতর্ক শুনে চিত্তবিনোদন করত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ বিতর্কের বহু উদাহরণ আমরা পাই। বিদেহ রাজ্যের রাজা জনক এইরূপ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে বহু সভা ডাকতেন। সেকালের বিশিষ্ট দার্শনিকরা সেই সভায় যোগ দিতেন। তাঁদের

মধ্যে যিনি সব থেকে বিখ্যাত ছিলেন তাঁর নাম যাজ্ঞবল্ক্য। আমরা সেকালের বিদুষী নারী হিসাবে গার্গীর নাম শুনেছি। সেই গার্গী এইরূপ এক বিতর্ক সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে যে তর্ক করেছিলেন তার বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।

শুধু কি তাই? এইরূপ বিতর্কসভা নিয়ে রাজায় রাজায় সেকালে বেশ প্রতিযোগিতা চলত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার উল্লেখ আছে। বিদেহের রাজা জনকের এই বিতর্কসভার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তিনি রামায়ণের রাজর্ষি জনক, কারণ সীতার আর এক নাম বৈদেহী, আর জনক বিদেহ রাজ্যের রাজা ছিলেন বলে তাঁকে বলা হত বৈদেহ। অজাতশত্রু নামে এক প্রতিবেশী রাজার কাছে সে সংবাদ পৌঁছালে পরে তিনি ভারি রাগ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল তিনি জনকের সঙ্গে এ বিষয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই কারণে দৃপ্তবালাকি নামে এক ঋষি যখন তাঁর কাছে ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা সভার এক প্রস্তাব করলেন, তিনি সে প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন,

"লোকে কেবল জনক জনক বলে তাঁর কাছে ছোটে, এই কাজে আমি সহস্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি।"[১৬]

এই অজাতশত্রু নিশ্চয় বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু নন, কারণ, তিনি ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক। ইনি হলেন রাজর্ষি জনকের সমসাময়িক। এঁর কাশ্য বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত তাঁর পিতার নাম ছিল কশ।

এই পরাবিদ্যার আকর্ষণ সেকালের মানুষের জীবনে কতখানি ব্যাপক ছিল তা উপনিষদের মধ্যে যে সব গল্প আছে তাতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তার দু একটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পগুলি হয়ত অনেকের পরিচিত। তবু তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার একটি সার্থকতা আছে। গল্প এখানে বড় নয়, গল্পের তাৎপর্যই বড়।

কঠ উপনিষদে আমরা নচিকেতার গল্প পাই। নচিকেতা বয়সে নবীন। তাঁর পিতার নাম ছিল উশন্। উশন্ একবার গরু দান করতে আরম্ভ করলেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় যেমন হয়ে থাকে, দানের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যয় সংকোচের ইচ্ছার সংঘর্ষ ঘটল। তিনি বেছে বেছে দুগ্ধহীন, বৃদ্ধ গাভীগুলিকে দান করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পিতার কাণ্ড দেখে নচিকেতার বিবেক দংশন করল। তিনি ভাবলেন একাজ ত ভাল নয়। তাই ক্ষোভে পিতাকে প্রশ্ন করলেন,

আমায় কাকে দান করবেন?

পিতা কাজে ব্যস্ত, প্রশ্নটিও বিরক্তিকর। তাই তিনি উত্তর দেন না।

[১৬] স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি হ বৈ জনা ধাবন্তীতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ১॥ ১

একবার, দুবার, তিনবার তিনি প্রশ্ন করলেন। পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং উত্তেজনার বশে এমন অবস্থায় যা হয়ে থাকে, পিতা হয়েও বলে বসলেন,

'মৃত্যবে তা দদামীতি,' তোমায় মৃত্যুকে দেব।

যেমন বলা, ঘটলও তাই। তা মনের কথা না হলে কি হবে? নচিকেতা যমের গৃহে আনীত হলেন। হয়ত মনের দুঃখেই হবে, নচিকেতা সেখানে অন্নস্পর্শ করলেন না, উপবাসী রইলেন। একদিন, দুদিন, তিনদিন গেল, তবু তিনি অন্নস্পর্শ করলেন না। একে ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি। যম আর থাকতে পারলেন না। তাঁর উপবাস ভঙ্গ করতে তিনি উদ্যোগী হলেন। নচিকেতা কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন তিনি পুরস্কার দেবার লোভ দেখালেন, বললেন,

তুমি যদি উপবাস ভঙ্গ কর, তোমায় তিনটি বর দেব।

নচিকেতা সম্মত হলেন। তিনি এক এক ক'রে বর চাইতে সুরু করলেন।

পিতা তাঁর ওপর রাগ ক'রে তাঁকে যমের বাড়ী পাঠালে কি হবে? নচিকেতার পিতার ওপর টান তখনও অক্ষুণ্ণ। তিনি তাই প্রথমেই বর চাইলেন,

আমার পিতার আমার ওপর বিরক্তি চলে যাক এবং তিনি যেন মনে শান্তি পান।

যম বললেন, তাই হক।

একরকম অগ্নি ছিল যম যার অধিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বর হিসাবে নচিকেতা চাইলেন যম তাঁকে এই অগ্নির কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। যম খুশী হয়ে বিবরণ ত দিলেনই, অধিকন্তু বলে দিলেন যে ভবিষ্যতে এই অগ্নি নচিকেতার নামেই প্রচলিত হবে। তার নাম হল তাই নাচিকেতা অগ্নি।

এইবার তৃতীয় বর চাইবার পালা। এই অপরিণত বয়স্ক নবীন বালক এবার যা বর চাইলেন তা যমের ধারণারও অতীত, তা যমকে ভীষণ সমস্যায় ফেলে দিল। নচিকেতা বললেন,

"এই যে প্রেত সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ, কেউ বলে তার অস্তিত্ব থাকে, কেউ বলে থাকে না, এই বিদ্যা বিষয় আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। এই হল আমার তৃতীয় বর-প্রার্থনা।"[১৬(ক)]

যম তখন এ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বললেন,

এই বিষয়টির কিছুমাত্র অংশও সুবিজ্ঞেয় নয়। নচিকেতা, তুমি অন্য বর চাও। আমাকে এ বিষয় অনুরোধ কোরো না।

১৬(ক) যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়ক স্তীতি চৈকে এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ কঠ॥ ১॥ ২০

কিন্তু বালকটি বয়সে নবীন হলেও বুদ্ধিতে প্রবীণ। তিনি যমের মুখের উক্তিকেই যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ ক'রে বললেন,

"দেবতারাও এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং আপনি স্বয়ং মৃত্যু বলছেন এটি সুবিজ্ঞেয় নয়। অপরপক্ষে এ বিষয় আপনার মত বক্তাও ত লাভ করা যাবে না। সুতরাং, এর তুল্য আর কোনো বর ত হতে পারে না।"[১৭]

যম তবু রাজী হন না। তিনি নচিকেতাকে নিরস্ত করতে ভিন্ন পথ ধরলেন। তিনি বালকটিকে নানা লোভ দেখাতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন,

তোমার জন্য পরিপূর্ণ ভোগের ব্যবস্থা ক'রে দিতে রাজী আছি। যে কামনাগুলি মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ, একে একে তা প্রার্থনা কর, আমি পূরণ করব। শতায়ু পুত্র, পৌত্র তুমি নাও, বৃহৎ ভূমির অধীশ্বর তুমি হও, যতদিন চাও আয়ু ভিক্ষা কর। কিন্তু মরণের বিষয় আমাকে তুমি প্রশ্ন কোরো না।

এই লোভনীয় বস্তুর বিপুল তালিকাও নচিকেতার মন ভুলাতে পারল না। যম তখন একবার শেষ চেষ্টা করলেন, তিনি বললেন,

"এই যে মেয়েগুলি দেখছ এদের মত রমণী মানুষের ভাগ্যে মেলে না। অশ্বযুক্ত রথসহ আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাদের নিয়ে তুমি আনন্দ কর। মরণের বিষয় আমাকে প্রশ্ন কোরো না।"[১৮]

কিন্তু সে চেষ্টাও বৃথা হল। নচিকেতা বললেন,

যতদিন আপনি বাঁচিয়ে রাখতে চান, বাঁচব, যা এমনি পাবার পাব। তার অতিরিক্ত কিছু চাই না। কিন্তু এ বিষয় আমার মতি পরিবর্তিত হবে না। আমার তৃতীয় প্রার্থিত বর এইটিই রইল। কারণ,

"জীবন যতই দীর্ঘ হক, তার শেষ আছে। এই অশ্ব, এই নৃত্যগীত—এরা সব আপনারই থাক। বিত্তের দ্বারা মানুষের তৃপ্তিলাভ হয় না।"[১৯]

তা হলে এখানে এই তাৎপর্য পাই যে পৃথিবীর সকল লোভনীয় বস্তু একদিকে ও একটি দার্শনিক বিদ্যা অপরদিকে। এখন তাদের একটিকে নির্বাচন করতে হবে। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বালক নচিকেতা, বয়সে নবীন নচিকেতা, অপরিণতবুদ্ধি নচিকেতা পরাবিদ্যার গলায়ই বরমাল্য দিয়েছিলেন। সামান্য বালকেরও মনে পরাবিদ্যার জন্য গভীর আকর্ষণ!

মানুষের অন্তরের তৃপ্তি যে বাস্তব সুখ ভোগে নয়, জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য বিদ্যা আহরণে, এর থেকে বড় সত্য কিছু নাই। তার মনে শাশ্বত

[১৭] বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥ কঠ॥ ১॥ ২২

[১৮] ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ॥ আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতা মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ কঠ॥ ১॥ ২৫

[১৯] অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ॥ কঠ॥ ১॥ ২৬-২৭

জিজ্ঞাসা কৌতূহলী হয়ে অনুক্ষণ বসে রয়েছে। সত্য সন্ধানের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজ ধর্মস্বরূপ। ঠিক বলতে গেলে এই নিয়েইত মানুষের অন্য জীবেদের সঙ্গে প্রভেদ। অন্য জীবের সকল শক্তি ও সামর্থ্য কেবলমাত্র নিজের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার কার্যেই পর্যবসিত হয়। সে কাজ সম্পাদন করতেও তাদের বিশেষ বুদ্ধি শক্তির সাহায্য নিতে হয় না। তারা অন্তরে গ্রথিত বৃত্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই সুবশ শৃঙ্খলার সঙ্গে জীবজীবনের এই দুটি মৌলিক কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ তাদের জীবনধারণের জন্য যেটুকু বুদ্ধির ব্যবহারের বা চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, সেটা জীববিশেষ সম্পাদন করে না, প্রকৃতি দেবীই তাদের হয়ে সে চিন্তার ভার গ্রহণ করেন। তাই হল জীবের অন্তরে নিহিত বৃত্তি সমুদয়।

মানুষের জন্য কিন্তু ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। যে শক্তি বিশ্বের নাট্যমঞ্চে মানুষকে স্থাপন করেছেন, তিনি মানুষের ভাববার বোঝা নিজস্কন্ধে বহন করতে চান নি। তাঁর বিধান হল মানুষ চিন্তার ভার নিজেই বইবে। তাই মানুষ একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় পৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত হল। শীত হতে পরিত্রাণের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য অন্য জীবের ছিল নানা ব্যবস্থা। শীত হতে পরিত্রাণের জন্য তারা পেল লোমশ পোষাক। আত্মরক্ষার জন্য তাদের কেউ পেল প্রখর নখর, কেউ পেল দংষ্ট্রা, কেউ বা শিং। আর যে তার কোনোটাই পেল না, সে পেল অন্তত ক্ষিপ্রগতি, কিম্বা নিজেকে লুকিয়ে রাখবার একটা উপায়। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে এসব কিছুই জুটল না। সে পেল মস্তিষ্কভরা প্রচুর বুদ্ধি-শক্তি, আর পেল দুই পায়ে চলবার ক্ষমতা, যার ফলে তার হাতদুটি মুক্ত হয়ে, তার বুদ্ধিশক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে।

তার ইঙ্গিত হল, মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন সমস্যার নিজেই সমাধান ক'রে নেবে। এইভাবে সামান্য জীবন ধারণের মৌলিক অভাবগুলি দূর করবার জন্যই যখন তার বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ল, সত্য বলতে কি, তখনই তার ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হল। মানুষের বুদ্ধিশক্তি নিজেকে প্রয়োগ করবার এই বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়ে দিন দিন তীক্ষ্ণতা লাভ করল। ফলে তা এমন বিকাশ লাভ করল যে কেবলমাত্র জীবনধারণের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়ে তা আর তৃপ্তি পেল না। জীবনের যুদ্ধে অন্য জীবদের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ ক'রে, যেমনি মানুষ নিজেকে একটি নিরাপদ এবং শান্তির আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপন করবার সুযোগ পেল, অমনি সেই ধী শক্তি নব নব পথে নিজের পূর্ণতর বিকাশলাভের সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল। এইভাবেই দার্শনিক জ্ঞানপিপাসা মানুষের মনে প্রথম জাগতে সুরু করেছিল।

এই যে পারিপার্শ্বিক বস্তু সন্দর্শনে বিস্ময় এবং কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তির লীলা চলেছে, তাকে জানবার প্রয়াস, এটি মানুষের অতি স্বাভাবিক বৃত্তি। এ বৃত্তির মূল চলে গেছে তার সত্তার অন্তরতম দেশ পর্যন্ত।

তা যে মানুষের মধ্যে কত গভীর এবং কত শক্তিশালী, তা যে কোনো শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হব। যে কোনো শিশুই একটু বুঝবার বা দেখবার ক্ষমতা হলে, তার পিতা, মাতা বা অন্য নিকটবর্তী আত্মীয়দের পারিপার্শ্বিক নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে একান্ত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। এটা কি জন্য হয়, ওটা কেন হয়, সেটা কি, ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন তার কৌতূহলী মনে সর্বদা জাগে। কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। অন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত নয়। কেবল জানা নিয়ে তার কাজ, জ্ঞান সঞ্চয় হলেই তার পরিসমাপ্তি, কোনো পরোক্ষ উদ্দেশ্য তার পশ্চাতে নিহিত নাই।

শিশুর সম্বন্ধে যে কথা খাটে, বয়স্ক মানুষ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কোনো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সাধনা করেন, তখন তাঁরা অবিমিশ্র জ্ঞান আহরণ ব্যতীত কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন না। জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষের বৈশিষ্ট্যই হল সে আপনাকে জানতে চায়। যা রহস্য, যা অজ্ঞাত, তার প্রতি তার ধী-শক্তির একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। জানবার চেষ্টাতেই এখানে আনন্দ, জানতে পারাটাই এখানে পুরস্কার। তাই ত দেখি সেই প্রাচীন কালে বেদের যুগেও মানুষ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আ বভুব।'

আধুনিক কালে বাস্তব জগতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক সুখ সুবিধার সরঞ্জাম জুগিয়েছে। যেমন রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, বেতারবার্তা প্রভৃতি। প্রয়োজনের চাপে পড়েও মানুষ অনেক সময় অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আঘাতের বা রোগের চিকিৎসার তাগিদে পেনিসিলিন জাতীয় জীবাণু নাশক ঔষধ উদ্ভাবিত হয়েছে। বড় পরমাণু ভেঙে বা ছোট পরমাণুর সঙ্গে বৈদ্যুতিক কণা যোগ ক'রে মানুষ আণবিক বোমা উদ্ভাবন করেছে।

এইসব দেখলে আপাতদৃষ্টিতে একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনের তাগিদেই বৈজ্ঞানিকগণ এইসব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু আদৌ তা সত্য নয়। এখানে দুটি বিভিন্ন অবস্থা আছে। প্রথমে, তত্ত্ব আবিষ্কারের অবস্থায় বৈজ্ঞানিকের একমাত্র প্রেরণা জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করা। তার পরের অবস্থায় যে তত্ত্ব আবিষ্কার হল তাকে ব্যবহার ক'রে ব্যবহারিক কাজে সুবিধামত লাগানর যে চেষ্টা হয়, তার ফলে উদ্ভাবিত হয় নানা যন্ত্রপাতি। এটি হল আবিষ্কৃত তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রথম-টিকে বলা হয় অমিশ্র বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় প্রযুক্তি বিদ্যা। যন্ত্রাদি উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ, দুটি বিভিন্ন জিনিস। প্রথমটির

নিয়ন্ত্রকশক্তি নিশ্চয় মানুষের ব্যবহারিক সুখসুবিধা। কিন্তু দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রকশক্তি কেবলমাত্র মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানপিপাসা। ষ্টিফেন যখন আবিষ্কার করলেন যে জল বাষ্পের আকারে পরিণত হলে নিজের সম্প্রসারণ সাধনের চেষ্টায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে, তখন তিনি কেবলমাত্র তাঁর জ্ঞান পিপাসাই চরিতার্থ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জানা, কেন কেটলির ঢাকনি ওপরে ওঠে! বাষ্পের এই আত্মস্ফীতির শক্তিকে ভিত্তি ক'রে, তাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, যখন জেমস্ ওয়াটস্ বাষ্প চালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবিত করলেন, তখনি তা কাজে লাগান হল। তারই ফলে পেলাম পরিবহনের জন্য রেলগাড়ী ও ষ্টীমার এবং কলকারখানার শক্তিসঞ্চারী যন্ত্র। এই দ্বিতীয় অবস্থাতেই ব্যবহারিক প্রয়োজন ক্রিয়া করে, প্রথম অবস্থায় নয়।

সুতরাং নচিকেতা যখন যমকে বললেন যে অবিমিশ্র বাস্তব ভোগসুখে মানুষের মন তৃপ্তি পায় না, তার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ না হলে তার তৃপ্তি নেই, তখন তিনি মানুষের এই স্বাভাবিক ধর্মের কথাই বলেছিলেন। বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ ক'রে তার সাহায্যে সত্য তত্ত্ব আবিষ্কারই হল মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তাকেই উপনিষদ সব থেকে মহৎ বৃত্তি বলে ধরে নিয়েছে। ঠিক সেই কারণেই, উপনিষদের ঋষির কাছে অপরা-বিদ্যা অপেক্ষা পরাবিদ্যার আকর্ষণ বেশী। ব্যবহারিক জগতে যে বিদ্যা কাজে লাগে, তাই অপরা-বিদ্যা, আর যে বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজে লাগে না, তাই পরাবিদ্যা। নচিকেতার কাছে পরাবিদ্যার আকর্ষণ বাস্তব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ অপেক্ষা অনেক বেশী।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অনুরূপ একটি গল্প পাই। এই গল্প যাজ্ঞবল্ক্য আর তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীকে নিয়ে। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হয়েছে। জনকের বিতর্ক সভায় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই যাজ্ঞবল্ক্যের আর একজন পত্নী ছিলেন। তাঁর নাম কাত্যায়নী এবং সাধারণ নারীর মত তিনি ঘর-সংসারে খুব অনুরাগী ছিলেন।

সেই যুগে আমাদের দেশের লোকেরা আশ্রম-ধর্ম পালন করত। সমগ্র জীবনটিকে চারটি আশ্রমে ভাগ করা হত—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও যতি। জীবনের আরম্ভে বাল্যকালে মানুষ গুরু গৃহে গিয়ে বিদ্যা অর্জন করত। তাই হল ব্রহ্মচর্য আশ্রম। তারপর গৃহে ফিরে এসে সে সংসারী হত। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে সস্ত্রীক সে বনে আশ্রয় গ্রহণ করত। তাই হল বাণপ্রস্থ। সবার শেষ আশ্রম ছিল যতি। অতি পরিণত বয়সে মানুষ তখন মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রব্রজিত হত।

যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক করলেন তিনি প্রব্রজিত হবেন। তার পূর্বে তাঁর কর্তব্য ছিল দুই পত্নীর মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ ক'রে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মৈত্রেয়ীকে একদিন ডেকে বললেন, আমি প্রব্রজিত হব। এস, কাত্যায়নী এবং তোমার মধ্যে আমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিই।

মৈত্রেয়ী তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন,

"যদি এই সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পূর্ণ হয় এবং তা আমার অধিকারে আসে, তাতে কি আমি অমৃতা হব?"[২০]

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বললেন, না, তা হয় না, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নেই।

তাই শুনে মৈত্রেয়ী তাঁর মন ঠিক ক'রে ফেললেন। তিনি বললেন,

"যাতে আমি অমৃতা হব না তা নিয়ে আমি কি করব? আপনি যা জানেন তাই আমাকে বলুন।"[২১]

এখানেও দুটি বিভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে একটি নির্বাচনের প্রশ্ন এসে পড়ে। একদিকে ঐশ্বর্যপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী ও অপর দিকে দার্শনিক জ্ঞান বা পরাবিদ্যা। নচিকেতার মত মৈত্রেয়ীও পরাবিদ্যার গলায়ই বরমাল্য দিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী দার্শনিক, পরাবিদ্যার থেকে বড় সম্পদ তাঁর বিবেচনায় আর কিছু ছিল না। কাজেই এই উত্তর তাঁকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিল। তিনি তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন,

"তুমি সত্যই আমার প্রিয়, তাই এমন প্রিয় কথা বলেছ। এস, বস, ব্যাখ্যান করছি।"[২২]

এই দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্যই সে কালের সমসাময়িক রাজা জনকের অতি প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। একজন দেশের রাজা, অপর জন দার্শনিক। তাঁরা ভিন্ন জগতের মানুষ। তাঁদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল উভয়েই সমধর্মী ছিলেন বলে। উভয়েরই পরাবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল সুগভীর। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারও সবিস্তার বর্ণনা আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই।

প্রথমে রাজর্ষি জনক দার্শনিক আলোচনার জন্য সভা ডাকতেন। সেই সভায় অন্যান্য অনেক দার্শনিকের মত যাজ্ঞবল্ক্য আসতেন এবং বিতর্ক সভায় যোগ দিতেন। ফলে, ক্রমশ সর্বত্র তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তিনি যে সেকালের 'ব্রহ্মিষ্ঠ' বা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তা সর্ববাদিমতে স্বীকৃত হল। এই সূত্রেই যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে জনকের পরিচয়ের সূত্রপাত। পরে দেখি এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। এখন যাজ্ঞবল্ক্য জনকের প্রাসাদে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। জনক তাঁকে নানা দার্শনিক প্রশ্ন

---

[২০] যন্নু মে ইয়ং ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ২

[২১] যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ৩

[২২] প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষসে এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥৪॥ ৪

করেন এবং সন্তোষজনক উত্তর পেলে খুসি হন। খুসি হয়ে পুরস্কার দিতে চান। বলেন,

আপনাকে সহস্র হস্তী ও অশ্ব দেব।

যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু বিদ্যা দান ক'রে তার পরিবর্তে পারিশ্রমিক নিতে স্বীকৃত হন না। পিতার নিকট তিনি যে ভিন্ন শিক্ষা পেয়েছেন। তাই তিনি বলেন,

"আমার পিতা বলে গিয়েছেন বিদ্যা দান ক'রে কিছু প্রতিদান গ্রহণ করতে নেই"[২৩]

এই অদ্ভুত দার্শনিকের এমন নির্লিপ্ত আচরণ দেখে জনক নিশ্চয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কারণ, দেখা যায় যে এর পর থেকে তিনি নিজেই যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট গিয়ে, নানা দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করলেন। জনক হলেন দেশের রাজা, আর যাজ্ঞবল্ক্য হলেন এক নির্ধন দার্শনিক। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? পরাবিদ্যার আকর্ষণ যে তাঁকে টানে। একসময় যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক করলেন, তাঁর সঙ্গে কথাই বলবেন না। জনক কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। একদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বর দিতে চাইলেন। সেই সুযোগে তিনি 'কামপ্রশ্ন' বর চাইলেন। অর্থাৎ, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ইচ্ছামত তাঁর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার থাকবে এবং যাজ্ঞবল্ক্য সে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন। অগত্যা যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে সেই বর দিতে বাধ্য হলেন।

এর ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সত্যই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে পরিণত হল। তখন থেকে জনক এসে এসে তাঁর নানা দার্শনিক প্রশ্নের ব্যাখ্যান শুনতেন। এক-একদিন যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনা তাঁর মর্মকে এমন স্পর্শ করত যে আবেগের আতিশয্যে তিনি বলে বসতেন,

"ভগবন্, আপনাকে বিদেহ রাজ্য অর্পণ করলাম এবং সেইসঙ্গে নিজেকে দাসরূপে দিলাম।"[২৪]

যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা দেখে তাঁর প্রতি জনক এমন শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের দাস্য গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছিলেন।

সে কেমন এক সময় ছিল সত্যই ভাববার বিষয়। রাজা রাজ্য ত্যাগ ক'রে দার্শনিকের দাস্য স্বীকার করতে চান পরাবিদ্যার আকর্ষণে। সামান্য বালক অনন্ত সৌভাগ্যের লোভকে প্রত্যাখ্যান ক'রে মৃত্যুর পর কি হয় জানতে উৎসুক হয়। সাধারণ নারী পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য হতে পরাবিদ্যাকে শ্রেয়সী মনে করেন। ধন্য এমন কাল, ধন্য এমন মানুষ, ধন্য এমন দেশ।

---

[২৩] পিতা মেঽমন্যত নানুশিষ্য হরেতেতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ১॥ ৭

[২৪] সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়েতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ৪॥ ২৩

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বেশ্বরবাদ

[বিশ্বের রূপ—তা এক না বহু, বিচ্ছিন্ন না সংবদ্ধ? বহুবাদ, একেশ্বরবাদ, একবাদ। অবিমিশ্র একবাদ—মায়াবাদ, মিশ্র একবাদ—সর্ব্বেশ্বরবাদ। নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, এবং রূপ কারণ এখানে একীভূত। ব্রহ্মের দুটি রূপ—প্রকট ও অপ্রকট, চঞ্চল ও স্থির। অপ্রকট অবস্থায় অদ্বৈত রূপ, দ্রষ্টৃত্ব অবিনাশী। প্রকট অবস্থায় দ্বৈত-বোধ, দৃশ্যমান জগতের বিকাশ—তার মধ্যে সুখ-দুঃখ জড়িয়ে ব্রহ্মের আনন্দরূপের প্রকাশ।]

আধুনিক যুগের কোনো কারখানার মাঝখানে যদি বিজ্ঞানের সংস্পর্শ বর্জিত গ্রামের কোনো অজ্ঞ মানুষ স্থাপিত হয়, তার দশাটা কি-রকম হবে ভেবে দেখবার বিষয়। ধরা যাক্ তাকে একটা চিনির কারখানার মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে প্রথম দৃষ্টিতে সে যা দেখবে তাতে নিজেকে একান্তই বিভ্রান্ত বোধ করবে। এক দিকে দেখবে গাদা গাদা আখ পড়ে, আর একদিকে দেখবে অনেকগুলি নানা আকারের চৌবাচ্চা সাজান। এখানে দেখবে রসের তরল স্রোত নল বেয়ে ছুটে চলেছে, ওখানে দেখবে বস্তা বস্তা চিনি একটা বিরাট চোঙা বেয়ে নীচে নেমে আসছে। আবার কোথাও দেখবে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, কোথাও বা উত্তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে আসছে। এমনি নানা অদ্ভুত দৃশ্যের নানা স্থানে সমাবেশ। তাতে যে তার চিত্ত একান্তই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে তা নিশ্চিত।

সেই নানা বিচিত্র শক্তির বিকাশকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করা তার পক্ষে সময় ও বুদ্ধি সাপেক্ষ। ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে তার পর হয়ত তার হৃদয়ঙ্গম হবে যে এটা নানা বিক্ষিপ্ত শক্তির সমাবেশ নয়। তার খেয়াল হবে যে একটা বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য এই নানা বিভিন্ন শক্তির একত্র সমাবেশ হয়েছে। তারা বিভিন্ন অবস্থায় সেই বিশেষ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য, বিভিন্নরূপে তাতে অংশগ্রহণ করছে। আগুন উৎপাদন করছে বাষ্প, বাষ্প দিচ্ছে শক্তি, যা নানা চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সেই শক্তি কারখানার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করছে। কোথাও আখ নিষ্পেষিত হয়ে রস বাহির হচ্ছে, কোথাও সেই রস নল বেয়ে নানা চৌবাচ্চার ভিতর দিয়ে গিয়ে শোধিত হয়ে, তারপর উত্তাপ পেয়ে গুড় হচ্ছে। অন্যত্র সে গুড় দানা বাঁধছে, সেই দানা বাঁধা গুড় হতে চিনি উৎপাদিত হচ্ছে। তা শোধিত হয়ে শাদা রং পাচ্ছে, বাতাসে শুকিয়ে চিনিতে পরিণত হচ্ছে এবং সর্বশেষে বস্তায় বোঝাই হচ্ছে।

তখন আর তার সন্দেহ থাকবে না যে এই বিভিন্ন কর্মশীল অংশ নিয়ে একটি বিরাট যন্ত্র এখানে বিরাজমান, যাকে আমরা চলতি ভাষায় কারখানা বলি। নানা বিভিন্ন শক্তির বিশৃঙ্খল সমাবেশ তা নয়, নানা সুসংবদ্ধ অংশ দিয়ে গঠিত এক বিরাট বস্তু মাত্র।

তার শৈশবের যুগে মানুষ যখন চোখ মেলে এই বিশ্বের চারিপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, তখন বোধ করি তার অবস্থা এই গ্রাম্য অজ্ঞ লোকটি হতে স্বতন্ত্র ছিল না। সে তখন দেখেছিল প্রকৃতির বক্ষে অহরহ বিভিন্ন শক্তির খেলা। তার কোনোটি হয় ত তার স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে, কোনোটি হয়ত করে না। মোটামুটি সবগুলিই যেন তার চোখে বিশ্লিষ্ট বা বিক্ষিপ্ত বলে বোধ হয়েছিল। এক্ষেত্রে তার এরূপ অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত ছিল না যে জগৎ নানা বিশ্লিষ্ট এবং বিভিন্ন শক্তির লীলাভূমি।

মানুষের ইতিহাসে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব যে এই ধরনের একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে আমাদের বৈদিক সাহিত্যে। এ বিষয় পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা তার আলোচনা করেছি। তার পুনরুল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই।

পরবর্তীকালে মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পেলে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির পরস্পর প্রভাবের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কাজেই, চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের ফলে, সে অচিরে সেই আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন শক্তি-গুলির মধ্যে পরস্পরের প্রভাব এবং সম্বন্ধ আবিষ্কার করল। সূর্যের কিরণে মেঘ সৃষ্টি হয়, মেঘ হতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হতে হয় ফসল, ফসল হতে অন্ন, তাই হয় জীবদেহের পুষ্টি। প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সে নানা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করতে সুরু করল। যে প্রকৃতির বুকে সে একদিন দেখেছিল নানা বিশ্লিষ্ট শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা, সেখানে সে খুঁজে পেল শৃঙ্খলা। নানা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সে নিয়ম পরিবর্তনশীল নয়, সে নিয়ম সকলকেই মানতে হয়। সুতরাং এই নূতন অভিজ্ঞতার ফলে সে অনুমান করল যে শক্তি বিভিন্ন নয়, তার প্রকাশ নানারূপে। সে হৃদয়ঙ্গম করল প্রকৃতি একই শক্তির লীলাভূমি, সেখানে বিশৃঙ্খলা নেই, সেখানে আছে নিয়মের রাজত্ব।

এই অবস্থায় আসলে পরে মানুষ ভগবানের একত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। তখন তার প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে বিশ্ব একই শক্তির অধীন এবং একই শক্তির সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিশক্তি এইটুকু হৃদয়ঙ্গম ক'রেই তৃপ্তি পায় না। সে আরও নিবিড়তর একত্বের সন্ধানে ফেরে। আমরা আর একবার সেই চিনির কলের কথা স্মরণ করতে পারি। তার বিভিন্ন অংশের সহিত ভালরকম পরিচয় ঘটবার পর সেই গ্রাম্য লোকটির এইরকম ধারণা করা সহজ হবে যে সমগ্র বস্তুটি একই লোকের ইচ্ছা পূরণ করতে নির্মিত হয়েছে। সেই ব্যক্তিবিশেষটি হল তার

মালিক। এই মালিক বা নির্মাতার সঙ্গে কিন্তু তার বাহিরের সম্পর্ক। সেই মালিক বা নির্মাতা সেই কলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, তার বাহিরে সে থাকে। তার সঙ্গে কোনো আঙ্গিক সম্বন্ধ না রেখেই নানা বস্তু সংগ্রহ ক'রে সে এই কল সৃষ্টি করেছে।

মানুষ যা কিছু রচনা বা সৃষ্টি করে তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এই ধরনের। সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, বাহিরের ভিতরের নয়। সে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করে। নানা দেশ হতে পাথর সংগ্রহ করে, মাটি পুড়িয়ে ইট করে, পাথর গুড়িয়ে সিমেণ্ট বানায়, তা পুড়িয়ে চুন করে। এইভাবে নানা সামগ্রীর সংযোগে তার অট্টালিকা নির্মিত হয়। সে নির্মাতা বটে, কিন্তু তার স্থান বাহিরে। সে মটরগাড়ির মত বিস্ময়কর যন্ত্র নির্মাণ করে। কিন্তু সেখানেও সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সম্পর্ক বাহিরের। যে উপাদানে তা নির্মিত হয় তা হয়ে যায় তার অঙ্গীভূত। কিন্তু যার বুদ্ধি এবং যার হস্ত তাকে রূপ দেয় সে বাহিরে থেকে যায়। এই রূপ স্রষ্টাকে তাই বলা হয় নিমিত্ত কারণ।

যে শক্তি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক কি এই ধরনের? মানসিক পরিণতির এক অবস্থায় মানুষ তাঁর উপর এইরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতাই আরোপ করেছিল। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এই জগৎ হতে তিনি ভিন্ন, এই ধরনেরই একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গত কারণ আছে। মানুষ যা জানে তাই দিয়েই সে অজানাকে বুঝতে চেষ্টা করে। তাই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার সম্পর্ক নিজের অভিজ্ঞতায় সে যেমন দেখেছে তা হতে স্বতন্ত্র সম্পর্কের কথা তার মনে হয় নি। কাজেই নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে নিজের ধরনেরই ঈশ্বরের স্রষ্টা রূপটি কল্পনা করেছে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হেতু তাঁকে জগতের সংস্পর্শ হতে দূরে রাখতে মানুষের ইচ্ছা হয়েছে। মর্ত্ত্যে যে পাপ আছে, দুঃখ আছে, আবর্জনা আছে, সেখানে যে মানুষ বাস করে। সেখানে কি আর ঈশ্বরের স্থান হতে পারে? তা যে তার ধারণারও অতীত। সেইজন্য তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে স্বর্গে, যেখানে সে কল্পনা ক'রে নিয়েছিল দুঃখ নেই, শোক নেই, মৃত্যু নেই। এ ধারণার উপর যেন মানুষের জীবন ব্যবস্থার প্রভাব দেখা যায়। এখানেও যে অবস্থায় সে অভ্যস্ত তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঈশ্বর সম্বন্ধে সে ধারণা ক'রে নিয়েছে। তখনকার দিনে সামাজিক জীবনে মানুষে মানুষে ছিল বড় রকম ভেদের প্রাচীর। একদিকে ছিলেন রাজা, অপর দিকে তাঁর প্রজা। রাজা শাসক, প্রজা শাসিত। তাই রাজায় প্রজায় অনেক ভেদ। রাজা থাকতেন প্রাসাদে, প্রজা কুটীরে। এই সামাজিক জীবন-গত ভেদের আদর্শেই যেন ঈশ্বর নির্বাসিত হলেন স্বর্গের রাজপ্রাসাদে। আর তাঁর সৃষ্ট জীব পড়ে রইল নীচে মর্ত্ত্য-লোকে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের এই ধারণাটিই সাধারণ প্রচলিত ধর্মের ভিত্তি।

এখানে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতে পৃথক, তাঁর অবস্থিতিও পৃথক। এ ব্যবস্থায় একটি সুবিধাও আছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তি একটি প্রবল বৃত্তি। ঠিক বলতে গেলে তার হৃদয়বৃত্তিই তার ধর্মবোধের ভিত্তি। যে শক্তি বিশ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানুষ নানাভাবে তাঁর হিতৈষণার পরিচয় পায়। বিপদে স্মরণ করতে, অভাবে প্রয়োজন মিটাতে তাঁর পরম শক্তিমত্তার ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁর ওপর নির্ভর করতে শেখে। যে স্বার্থরক্ষণ বা স্বার্থবর্দ্ধনে উৎসুক নয়, সেও তাঁকে অপরিমিত কল্যাণের উৎস হিসাবে দেখে তাঁর প্রতি ভক্তি-নিবেদনের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে তার অনুভূতি শক্তিই প্রধানত ক্রিয়া করে এবং তাকে অভিব্যক্তি দেওয়া খুব সহজ হয় এই ধরনের সৃষ্টি ও সৃষ্ট জীব হতে পৃথক সর্বশক্তিমান ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের পরিকল্পনায়। এখানে ঈশ্বর যেন এক হিসাবে নাগালের মধ্যে এসে যান। তিনি যেন অতি-মানব, তিনি তাই পুরুষোত্তম, বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকা যায়, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করা যায়, হৃদয়ে ভক্তি উদ্বেল হয়ে উঠলে তাঁকে তা নিবেদন করা সহজ হয়। এর আকর্ষণ কত তীব্র, পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা তার আলোচনা করেছি। তার দুর্নিবার আকর্ষণেই বুদ্ধের ভক্ত তাঁর নিজের স্থাপিত ঈশ্বরবিহীন ধর্মত্যাগ ক'রে তাঁকেই দেবতার পদে অধিষ্ঠিত ক'রে মহাযান ধর্ম প্রবর্তিত করেছিল। তার আকর্ষণেই হিন্দু ভক্ত জ্ঞানমার্গ ত্যাগ ক'রে পুরাণের ভক্তিমার্গ বরণ ক'রে নিয়েছিল।

এই বিষয়টি সম্পর্কে গীতায় একটি সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গীতায় চারশ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ আছে। তারা হল আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত ও জিজ্ঞাসু[১]। কারও সন্তান হয়ত গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তার জীবন হয়ে পড়েছে বিপন্ন। সে তখন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর করুণা ভিক্ষা ক'রে প্রার্থনা করে তিনি যেন তাঁর সন্তানকে রোগমুক্ত করেন। এইশ্রেণীর মানুষ হল আর্তশ্রেণীর ভক্ত। আবার এমনও হয় যে কোনো বিপদ আসেনি কিন্তু একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার কারও ইচ্ছা হয়েছে। হয়ত চাকুরীতে উন্নতি বা সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্য তার কামনার বস্তু। সে ভগবানকে প্রার্থনা জানায় তার কামনা পূরণ করতে অনুরোধ ক'রে। এটি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তের উদাহরণ অর্থাৎ অর্থার্থীর। আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন যাঁর ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এত গভীর যে ভক্তি ক'রেই তাঁর তৃপ্তি। ইঁনিই প্রকৃত ভক্ত। মীরার ভক্তি এই ধরনের ভক্তি। আর যিনি জিজ্ঞাসু তিনি ঠিক ভক্ত নন। তিনি পরম সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। হৃদয়বৃত্তি হতে বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর বেশী প্রবল।

[১] চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা॥ ৬॥ ১৬

মানুষের জিজ্ঞাসু মন কিন্তু একেশ্বরবাদের ঈশ্বরকে বেশীদিন প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে নি। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র যেমন প্রসারলাভ করতে থাকে, তার একেশ্বরবাদের পরিকল্পনা নাড়া খেতে থাকে। এককালে মানুষ ধরে নিয়েছিল ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন এবং সেই স্বর্গ ঊর্দ্ধলোকে কোথাও অবস্থিত হবে। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সে জানে যে ঊর্দ্ধলোক বলে কিছু নেই। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ওপরটা যদি ঊর্দ্ধলোক হয়, পৃথিবীর উল্টোদিকে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেটা অধোলোক। ভারতবাসীর যেটা অধোলোক, আমেরিকাবাসীর সেটা ঊর্দ্ধলোক। শুধু কি তাই? গোলমাল আরও আছে। আমরা বর্তমানে জানি যে পৃথিবী তার অক্ষের ওপর ঘুরছে। সুতরাং আমাদের মাথার উপরকার ঊর্দ্ধলোকও প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই স্বর্গের ঊর্দ্ধলোক কোনটা, তার দিশা পাওয়া যায় না। তারপর এখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। আমেরিকায় মাউণ্ট পালোমারের শিখরে যে দূরবীক্ষণটি স্থাপিত হয়েছে তার দেখবার কাচ খানির ব্যাস হল দুইশত ইঞ্চি। তার নাগাল আকাশের অভ্যন্তর ভাগে লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসরের দূরত্ব পর্যন্ত। তার মধ্যে কোথাও ত স্বর্গের দিশা পাওয়া যায় না। সুতরাং ধর্মের অঙ্গ হিসাবে বিশ্বাসের আবরণে তাকে সুরক্ষিত ক'রে না রাখলে একেশ্বরবাদের পরিকল্পনাকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

চিন্তার পথে এইভাবে মানুষ একেশ্বরবাদে আস্থা হারিয়ে ফেলে। মানুষের সহিত তার সৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধ যে ধরনের তারই অনুরূপভাবে এই ধারণাটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষের সন্দেহের সঙ্গত কারণ এসে পড়ে যে, যে শক্তি বিশ্ব রচনা করেছে তা বোধ হয় সেইভাবে কাজ করে না। তার সৃষ্টির রীতি ভিন্ন।

এই সূত্রে আমরা সেই কারখানার মালিকের উপমাটির পুনরুল্লেখ করতে পারি। কারখানার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বাহিরের। নানা স্থান হতে নানা উপাদান নিয়ে এসে সে এই কারখানা গড়েছে। সেই উপাদানগুলি তার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এই কারখানা গড়তে একটা নক্সাও লেগেছে। ইঞ্জিনিয়ার সেই নক্সা করে দিয়েছেন। সেই নক্সার অনুসরণেই কারখানাটি গড়ে উঠেছে। সুতরাং এই কারখানা গড়তে অনেক বস্তুর সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার তার নক্সা করে দিয়েছেন, মিস্ত্রি তা গড়েছে, আর নানা উপাদান দরকার হয়েছে তাকে গড়তে।

এদের পরস্পরের সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা এরিস্‌টট্‌লের বিভিন্ন শ্রেণীর কারণের বিভাগটি ব্যবহার করতে পারি। তা হলে আমাদের এই বিভিন্ন কারণগুলির পারস্পরিক-সম্বন্ধ ধারণা করা সহজ হবে। এরিস্‌টট্‌ল চার শ্রেণীর কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে দুটির সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে তাদের পৃথক করবার দরকার পড়ে না। ফলে আমরা তিন শ্রেণীর

কারণ পাই : উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ ও রূপ কারণ। এই কারখানা গড়তে যত ইট লেগেছে, লোহা লেগেছে, সিমেণ্ট লেগেছে, এরা সব এর উপাদান। তাই এরা উপাদান কারণ। কারখানাকে গড়েছে মিস্ত্রি। সেই ত বিভিন্ন উপাদানকে কারখানার রূপে রূপান্তরিত করেছে। তাই তা নিমিত্ত কারণ। এ ছাড়া কারখানা গড়তে একটা নক্সারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই নক্সাটি ইঞ্জিনিয়ার আগে এ'কেছিল। তারই অনুসরণে ত কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে যে রূপটি আছে কারখানা তারই অনুরূপ হয়েছে। তাই তা রূপ কারণ।

মানুষ যখন কোনো বস্তু রচনা করে তখন তিন শ্রেণীর কারণ বিশ্লিষ্টভাবে কাজ করে। যেটি নিমিত্ত কারণ তাই এদের পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে বস্তুটি গড়ে তোলে। কিন্তু সেখানেও সে বাহিরে থেকে যায়। যে-শক্তি বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল তার রচনা পদ্ধতি কিন্তু স্বতন্ত্র। পৃথিবীর মধ্যে কত বিভিন্ন শ্রেণীর জীব ক্রমবিকাশের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি তাদের কেমন ভাবে গড়েছিলেন? সেখানে নিমিত্ত কারণ কে? সেখানে কি কোনো নক্সার প্রয়োজন হয়েছিল?

এর উত্তরে এক ধরনের মত পাওয়া যায় যা বলে যে এখানে কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত শক্তির ক্রিয়া স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সেইভাবেই চিন্তা করেছেন। তাঁদের মতে যা সৃষ্টি হয়েছে সবই আকস্মিক ঘটনার ভিত্তিতে ঘটে গিয়েছে। একটি বনমানুষকে যদি একটি লেখন যন্ত্র আর কাগজ দেওয়া যায় আর সে যদি যন্ত্রে কাগজ জুড়ে এলো পাতাড়ি তার বোতাম টিপে চলে তাহলে হয়ত সে কালক্রমে একদিন অর্থ বোধ হয় এমন একটি কবিতা রচনা করতে পারবে। সেই রকম প্রকৃতির মধ্যে নানা বিক্ষিপ্ত শক্তির বিভিন্ন সমাবেশের মধ্যেই আকস্মিকভাবে জীব সৃষ্ট হয়ে থাকবে।

এই ধরনের মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরাও এক শ্রেণীর অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। যেখানে কোনো ঘটনার উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মের ফলে হবার সপক্ষে অনেক সঙ্গত যুক্তি আছে, সেখানেও তাঁরা আকস্মিকতাবাদের অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। এ'দের উপহাস ক'রে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক পাউলসেন যে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন;

"কাজেই ধরে নিতে হবে যে কোনো বিশেষ সময়, কোনো বিশেষ স্থানে, শূন্য মাটির বুকে বা কাদায় বা জলে বা বাতাসে যে যে উপাদান দিয়ে একটি ঈগল পাখী বা হাঙর বা সিংহ গঠিত তাদের সবার মিলন ঘটেছিল। ওই সামনে দাঁড়িয়ে সিংহ, তা নানা অণুর সমবায়ে গঠিত হয়ে চর্ম এবং লোমের আচ্ছাদনে শোভিত হয়েছে, তার চোখ আছে, কান আছে, দংষ্ট্রা আছে, নখর আছে, তার হৃৎপিণ্ড আর ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত আছে। অতি বড়

কল্পনাবীর এই ঘটনার কল্পনা করে দেখুন ত। সঙ্গে এটাও মনে রাখতে-হবে যে ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে, সেই একই আকস্মিক ঘটনায় একটি সিংহী সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তাও সেই একই স্থানে; তা না হলে সেই আকস্মিক ঘটনা দুটি নিরর্থক হয়ে যায় যে। আরও প্রয়োজন তেমনি আকস্মিকভাবে একটি হরিণ সৃষ্টি হওয়ার। আরও ভাল হয় এক জোড়া হরিণ হলে, আরও ভাল হয় অনেকগুলি জোড়া হলে যাতে নূতন খাদ্যের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাদের খাদ্যাভাব না ঘটে।"[২]

এতগুলি আকস্মিক ঘটনা-পরম্পরা স্বীকার করা একান্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং একটি উদ্দেশ্য প্রণোদক শক্তি যে এখানে ক্রিয়া করছে তা ধরে নিতে হয়। কিন্তু তা কিভাবে করছে? মানুষের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে সে সৃষ্ট বস্তু হতে স্বতন্ত্র থেকে বাহির হতে কাজ করছে। ডারউইন্ এ বিষয়ে একটি নূতন তত্ত্ব প্রচার ক'রে এই সমস্যার সমাধান দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত তত্ত্বে উদ্দেশ্যের ক্রিয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে, পরিবেশই যেন যন্ত্রচালিতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে, এই ধরনের মত প্রকাশ করা হয়েছে।

ডারউইন্ বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এইভাবে : বংশধারা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে অনুক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। প্রকৃতির বক্ষে যতগুলি শ্রেণীর জীব বংশধারা রক্ষা করতে চায় তাদের সকলের জন্য স্থান নেই। অপর পক্ষে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল জীবই সমানভাবে সজ্জিত নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য রকম ব্যতিক্রমের অধিকারী হয়। সেই ব্যতিক্রম যদি জীবন যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় কাজে লাগে, তাহলে তা শ্রেণী বিশেষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ হয়ে যায়। এইভাবে পরিবেশই ঠিক করে দেয়, যে শ্রেণী জীবন যুদ্ধে জয়ী হবে তার কি কি বিশিষ্টতা থাকবে। এখানে এ কথা স্বীকৃত হয় নি যে জীবের মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোনো শক্তি সেই বিশিষ্টতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যা কোনো বিশেষ পরিবেশে জীবনধারণের সহায়ক হবে। বরং প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পরিবেশের। কোনো বিশেষ পরিবেশে আকস্মিকভাবে লব্ধ কোনো বিশিষ্টতা যদি সুবিধা এনে দেয়, তা হলে যে জীবটির সেই বিশিষ্টতা আছে সেই জীব টিকে থাকবে আর যাদের সে বিশিষ্টতা নেই তারা লোপ পেয়ে যাবে। ফলে যে টিকে রইল তার বংশই সংরক্ষিত হবে। এখানে কোনো উদ্দেশ্য ক্রীয়াশীল নয়, পরিবেশ পরোক্ষভাবে শ্রেণী বিশেষের বিশিষ্টতা গড়ে তোলে।

এই মত অনুসারে ক্রমবিকাশের পথে জীবের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যমূলক

---

২ Paulsen, Introduction to Philosophy, p. 153.

শক্তি ক্রিয়াশীল নয়। জীবের যে পরিবর্তন ঘটে তা পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে খানিকটা যন্ত্রচালিতভাবে। এখানেও কিন্তু যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ সত্ত্বেও জীবের মধ্যে অন্তর্বর্তী উদ্দেশ্যের ক্রিয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে সেই একই মনোভাব প্রণোদিত হয়ে। আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার ভিত্তিতে ব্যাখ্যার প্রতি পক্ষপাত এখানে বৈজ্ঞানিকের মনকে একদেশদর্শী করেছে। জীব-দেহের ক্রমবিকাশের মূল কারণ হল জীবনে জয়ী হবার ইচ্ছা। সে ইচ্ছা কাজ করে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে জীবদেহের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে। অন্ধভাবে যেতে যেতে কেবল মাত্র অক্রিয়ভাবে পরিবেশের সহিত ভাগ্যক্রমে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পেরে জীব ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয় না। একটি সক্রিয় ইচ্ছা এখানে জীবদেহের অভ্যন্তরে কাজ করে। এ সম্পর্কে পাউলসেন এই রকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

"তারা অক্রিয়ভাবে ক্রমবিকাশলাভ করে না, তারা ঠিক স্রোতস্বিনীর মধ্যে পাথরের নুড়ির মত বাহির হতে যান্ত্রিক কারণের প্রভাবে নূতন রূপ গ্রহণ করে না। জীবন রক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্প জীব বিশেষের উপর বাহির হতে আরোপিত হয় না; তারা নিজস্ব ইচ্ছা প্রণোদিত হয়েই সংগ্রাম করে; নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন সংরক্ষণ এবং সন্তান উৎপাদন ও পরিপালনের নিজস্ব ইচ্ছা ব্যতীত বাঁচবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব হয় না।"[৩]

এরিস্‌টট্‌ল বলেন যে বিভিন্ন জীব যে বিভিন্ন রূপ পায় সেখানে বাহির হতে কেহ রূপ আরোপ করে না। সেই রূপ পাবার আকুতি ভিতর থেকেই ক্রিয়াশীল থাকে। অর্থাৎ এখানে রূপ কারণ বাহিরের বস্তু নয়, তা জীবদেহের অভ্যন্তরেই ক্রিয়াশীল। আমরা যে সব সার্বিক সংজ্ঞা ব্যবহার করি তাই এখানে রূপ কারণ। আমাদের মনের মধ্যে 'মানুষ' এই সার্বিক সংজ্ঞাটির একটি চিত্র আছে। সেই চিত্রটি কোনো বিশেষ মানুষের মত নয়, অথচ অতীতে যত মানুষ জন্মেছে ও ভবিষ্যতে যত মানুষ জন্মাবে তাদের সকলেরই মত। সকলের ওপর প্রয়োগ করা যায় বলেই তাকে সার্বিক সংজ্ঞা বলতে পারি। এই সার্বিক সংজ্ঞাই এখানে রূপ কারণ এবং তাই জীবদেহের অভ্যন্তরে থেকে কাজ করছে তার বিভিন্ন কোষগুলিকে এই বিশেষ রূপ দেবার জন্য। এখানে তাহলে জীবদেহ সৃষ্টিতে উপাদান কারণ, রূপ কারণ এবং নিমিত্ত কারণ সবই এক হয়ে যায়। জীব-কোষগুলি উপাদান। অসংখ্য জীবকোষকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে এই সার্বিক সংজ্ঞাই অভ্যন্তরে থেকে জীববিশেষ যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার মতই তার রূপ দেয়।

রূপটি যে নক্সা আকারে জীবদেহের মধ্যেই লুকান আছে, তা বর্তমান জীববিজ্ঞান স্বীকার করে। সে নক্সা জীবদেহের প্রতিটি কোষে বর্তমান। তাকে জীন্ বলা হয়। সেই জীন্ জীবদেহের অভ্যন্তরে থেকে তার রূপ

৩ Paulsen, Introduction to Philosophy, p. 186.

কেমন হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং মানুষ যেভাবে সৃষ্টি করে প্রকৃতির সৃষ্টির রীতি তা হতে স্বতন্ত্র। প্রকৃতির মধ্যে যেখানে সৃষ্টি হয় সেখানে উদ্দেশ্য সৃষ্ট বস্তুর অভ্যন্তরেই ক্রিয়াশীল।

এই অনুমানের ভিত্তিতেই সর্বেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছে। গভীরতর চিন্তার ফলে মানুষ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, যিনি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর সৃষ্টির রীতি মানুষের সৃষ্টির রীতি হতে বিভিন্ন। এখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টা পৃথক নন, স্রষ্টা সৃষ্টির মাঝখানেই অহরহ বিরাজমান। সৃষ্টির প্রবাহ তিনি সৃষ্টির মাঝখানে থেকেই পরিচালিত করছেন।

উপনিষদ মোটামুটি এই ধরনের সর্বেশ্বরবাদকে গ্রহণ করেছে। উপনিষদ সমগ্র সৃষ্টিকে একই সত্তার বিস্তার বলে ব্যাখ্যা করেছে। তাকে কোথাও ব্রহ্ম বলা হয়েছে, কোথাও ভূমা বলা হয়েছে। উভয়েরই অর্থ এক। যা সকল-কিছু ব্যেপে আছে তাই ব্রহ্ম। যা সব থেকে বিরাট তাই হচ্ছে ভূমা। তাকে কোথাও অক্ষরও বলা হয়েছে, কারণ যা সব কিছু জড়িয়ে আছে তার ত কোনো ক্ষয় নেই। তাকে কোথাও আত্মন্ বলাও হয়েছে।

ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করে এমন বাণী প্রায় সব কটি প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেই পাওয়া যায়। ঈশ উপনিষদ আরম্ভই হয়েছে এই কথাটি দিয়ে,

"এই বিশ্বে যা কিছু দৃশ্যমান সবই ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত।"[৪]

কঠ উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই কথাগুলি পাই :

"অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ ক'রে বহুরূপ ধারণ করে, তেমন একই ব্রহ্ম সকল জীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন এবং তার বাহিরেও বর্তমান থাকেন।"[৫]

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে এই উক্তি করা হয়েছে :

"তাঁর পাণি এবং পাদ সর্বত্র, তাঁর অক্ষি, শির এবং মুখ সর্বত্র, তাঁর শ্রবণ-শক্তি সর্বত্র বর্তমান, তিনি সকল বস্তুকে আবৃত ক'রে বিরাজমান।"[৬]

এটি প'ড়ে মনে হয় যেন ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তের ভাবধারার দ্বারা তা বিশেষ রকম অনুপ্রাণিত।

মুণ্ডক উপনিষদেও অনুরূপ ভাবধারা পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বের অনন্ত বিস্তারের মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। উক্তিটি এই,

"সেই অমৃত ব্রহ্মই আমাদের সম্মুখে, ব্রহ্ম আমাদের পশ্চাতে, তিনি দক্ষিণে,

---

[৪] ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ॥ ঈশ॥ ১॥

[৫] অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ কঠ॥ ২॥ ৫॥ ৯

[৬] সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৩॥ ১৬

তিনি উত্তরে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি অধোদেশে; সেই বরিষ্ঠ ব্রহ্মই এই বিশ্বরূপে প্রসৃত।"[৭]

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে এই একই চিন্তাধারার রেশ আমরা খুঁজে পাই। ব্রহ্ম যে বহু ও নানার বৈচিত্র্যময় জগতরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাই নয়। সেখানে আরও দেখান হয়েছে যে তিনি নানা বিভিন্নধর্ম্মী এবং পরস্পর বিরোধী গুণ বিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হলেন। এখানে বলা হয়েছে,

"এই বিশ্বকে সৃষ্টি ক'রে ব্রহ্ম তাতেই প্রবেশ করলেন। ক'রে সৎ এবং অসৎ দুই হলেন......বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হলেন, সত্য এবং মিথ্যা হলেন, সত্য হলেন, এই যা কিছু আছে সব হলেন।"[৮]

এইখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। এখানে একই সঙ্গে বলা হয়েছে ব্রহ্ম সত্য এবং মিথ্যা হলেন এবং সত্য হলেন। তার একটি তাৎপর্য আছে। ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মী পরস্পর বিরোধী বস্তুর সমাবেশেই ত বিশ্ব। তাই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। তাদের উভয়েরই বিশ্বে স্থান আছে। তাই তারা উভয়েই সত্য।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই চিন্তাধারার সবিস্তার উল্লেখ আমরা আরও বেশী পরিমাণে পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উক্তির ইতিমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি। তা বলে,

"এই সব কিছুই ব্রহ্ম, তাতেই তাদের জন্ম, পুষ্টি এবং বিলয়।"[৯]

এই কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্য সূত্রে এই উপনিষদের মধ্যেই আমরা পাই। সে ব্যাখ্যা আছে আরুণি এবং তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর মধ্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায়। সে গল্পের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা পরিচিত হয়েছি। আরুণি পুত্রকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মর্মকথাই হল এই যে জীব, জড় জগৎ, অণু, বিশ্বে যা কিছু আছে তারা সকলেই সত্য এবং সকলেই ব্রহ্ম। তিনি বলেছেন,

"আমরা যে অণু হতে অণু দেখি তাতে ব্রহ্ম বিরাজমান, এই যে বাহিরে যা কিছু দেখি, এরা সবই সত্য এবং তা আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং তুমিও তাই।"[১০]

ব্রহ্ম যে সর্বত্র ছড়িয়ে, সব কিছু জড়িয়ে আছেন এই কথাটি এই উপনিষদের

---

[৭] ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ
অধশ্চোর্দ্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক॥ ২॥ ২॥ ১

[৮] তদনু প্রবিশ্য॥ সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ॥
বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ॥ সত্যং চানৃতং চ॥ সত্যমভবৎ॥
যদিদং কিং চ॥ তৈত্তিরীয়॥ ২॥ ৬

[৯] সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৩॥ ১৪॥ ১

[১০] স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ
সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতোঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৬॥ ১২॥ ৩

সপ্তম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেখানে সনৎকুমার নারদকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন, ভূমাই সব এবং সেই ভূমা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি বলেছেন,

"তিনি উপরে, তিনি নীচে, তিনি পশ্চাতে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, এইসব কিছুই ত তিনি।"[১১]

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সুবিস্তীর্ণ বক্ষে এই চিন্তাধারার সবিশেষ পরিবর্ধন আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে,

"যেমন উর্ণনাভি হতে তন্তু উৎপন্ন হয়, যেমন অগ্নি হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি এই আত্মা হতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল জীব উৎপাদিত হয়।"[১২]

ব্রহ্ম বা আত্মা বিশ্বের সকল বস্তুর, বিশ্বের সকল জীবের কেবল উৎপত্তির কারণ নন, তারা ব্রহ্মের মধ্যেই অবস্থিত, ব্রহ্মের মধ্যেই তাদের প্রতিষ্ঠা, এই কথাটিও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বুঝাবার চেষ্টা হয়েছে। তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে পাই,

"যেমন রথনাভি ও রথনেমিতে রথের চক্রের সমস্ত অরগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরকম এই আত্মার মধ্যেই সকল জীব, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ এবং সকল আত্মা (জীবাত্মা) আশ্রিত হয়ে আছে।"[১৩]

উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন বচনগুলি এই তত্ত্বটি সমর্থন করে যে বিশ্বের যিনি কারণ সেই ব্রহ্ম বিশ্ব হতে পৃথক নয়, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করেই তিনি রয়েছেন। অপর পক্ষে এ কথাও বলা হয়েছে যে সৃষ্টিরূপী বিশ্ব স্রষ্টা হতে বিচ্ছিন্ন হয় না, স্রষ্টার উপরেই তা আশ্রিত হয়ে থাকে। আরও কিছু বচন পাই যা বলে এই ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে মিলিয়ে আছেন যে তাকে সৃষ্টি হতে পৃথক করা যায় না, এমন কি তাঁর সৃষ্ট বস্তু জানতেই পারে না তিনি কোথায় আছেন। এইবার সেই ধরনের দু একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বচনটি আছে,

"যিনি সর্বভূতে অবস্থিত, যিনি সর্বভূতের অন্তর, যাঁকে সকল জীব চেনে

---

[১১] স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭॥ ২৫॥১০

[১২] স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ
ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ
সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ
সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ১॥ ২০

[১৩] তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ
সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতাণি
সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ
সর্ব এব আত্মানঃ সমর্পিতাঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৫॥ ১৫

না, যাঁর সকল জীব হল দেহস্বরূপ, যিনি সর্বভূতের অন্তরে থেকে তাদের পরিচালিত করেন, তিনিই হলেন অন্তর্যামী এবং অমৃত।"[১৪]

ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অলক্ষ্যে বিরাজমান বলেই বোধ হয় তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়। ব্রহ্মের যে বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র কোনো রূপ নেই, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান, এই কথাটি ছান্দোগ্য উপনিষদের আরুণি ও শ্বেতকেতুর গল্পে বেশ সুন্দরভাবে উদাহরণ দিয়ে বোঝান হয়েছে। গল্পটি এইরূপ।

পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন এক খণ্ড লবণ একটি পাত্রে রক্ষিত জলে এক সন্ধ্যায় নিক্ষেপ করতে। পুত্র তাই করলেন। পরের দিন প্রাতে পুত্রকে ডেকে আরুণি বললেন,

কাল যে লবণ জলে ফেলে দিয়েছিলে, তা কোথায় বল দেখি।

শ্বেতকেতু বললেন, তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না।

পিতা বললেন, আচ্ছা, জলের একপ্রান্ত হতে জল নিয়ে আস্বাদ গ্রহণ কর ত।

পুত্র তাই করলে, পিতা প্রশ্ন করলেন, কি অনুভব করলে?

পুত্র বললেন, লবণের আস্বাদ।

তারপর পিতা বললেন, আচ্ছা, মধ্যভাগ হতে জল গ্রহণ ক'রে আস্বাদ ক'রে দেখত।

পুত্র তাই ক'রে দেখলেন, সেখানেও লবণের জলের আস্বাদ।

তখন পিতা বললেন, এবার পাত্রের অপর প্রান্ত হতে জল গ্রহণ ক'রে আস্বাদ ক'রে দেখ ত।

পুত্র এবারও দেখলেন সেই লবণের আস্বাদ।

তাহলে কি শিক্ষা হল? শিক্ষা হল এই যে লবণের আর পৃথক অস্তিত্ব নেই। জলের সহিত লবণ এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে তার যেমন পৃথক অস্তিত্ব নেই তাকে তেমন দেখাও যায় না। জলে লবণের আস্বাদই তার একমাত্র অস্তিত্বের চিহ্ন। ব্রহ্মও সেইরূপ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে মিশে গেছেন যে তাঁকে সৃষ্টি হতে পৃথক ক'রে পাওয়া যায় না, তিনি অদৃশ্য অবস্থায় তাদেরই অভ্যন্তরে বিরাজমান থাকেন।

সুতরাং এখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধে যা কারণ তা কার্য হতে পৃথক নয়। ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণও বটে, ব্রহ্ম সৃষ্টিও বটে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং রূপ কারণের শ্রেণী বিভাগ অর্থহীন। সকল প্রকার কারণই

[১৪] যঃ সর্ব্বভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো
যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতাণি
শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি এষ
ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৩॥ ৭॥ ১৫

ব্রহ্ম এবং সকল কারণগুলি সৃষ্টির অভ্যন্তরে থেকেই ক্রিয়াশীল। এই হল সর্বেশ্বরবাদ। এই হল উপনিষদের সর্বব্রহ্মবাদ।

এই ব্রহ্মের দুটি বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি স্থায়ী রূপ অপরটি চঞ্চল রূপ। এই চঞ্চল রূপটিই রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের জগতরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেয়। এই রূপটি দৃশ্যমান বটে কিন্তু বিনাশশীল এবং অস্থায়ী। ব্রহ্মের আর একটি স্থায়ী রূপ আছে. তা হল স্থির, অচঞ্চল এবং অবিনাশী কিন্তু তা মূর্ত নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,

"ব্রহ্মের রূপ দুটি, মূর্ত এবং অমূর্ত, মর্ত্য এবং অমৃত, স্থির এবং চঞ্চল, স্থায়ী এবং অস্থায়ী"[১৫]

এর একটি ইন্দ্রিয়গোচর বহু ও বিচিত্র বস্তুর সমাবেশরূপী বিশ্বের যে প্রকাশ তাই। অপরটির বাহিরে কোনো প্রকাশ নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বৈশিষ্ট্য হল এখানে দুটি বিপরীত ধর্মী বস্তুর পরস্পর সংঘাত হয়ে থাকে। তার একটি হচ্ছে জ্ঞাতা ও অপরটি হচ্ছে জ্ঞেয়। দৃশ্যমান জগতের আবির্ভাব হয় সেইখানেই যেখানে একদিকে আছে দেখবার মন ও অপরদিকে আছে দ্রষ্টব্য জগৎ। দুয়ের সংযোগ হলেই দৃশ্যমান বিশ্বের উদ্ভব হয়। উপনিষদে একেই বলে দ্বৈতভাব। যেখানে দ্বৈতভাব হয় সেখানেই ব্রহ্মের প্রকট রূপ পাই। তাই হল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের জগৎ। তা হল বহুধা বিভিন্ন বিচিত্র জগৎ। আর যেখানে এই দ্বৈতভাব থাকে না সেখানে বহু ও বিচিত্রে ভরা এই প্রকট জগৎ লোপ পেয়ে যায়। তাই হল ব্রহ্মের অচঞ্চল, স্থির. অমর্ত্য রূপ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,

"যেখানে কেউ কাউকে দেখে না, কেউ কাউকে জানে না, কেউ কাউকে শোনে না, তাই হল ভূমা এবং যেখানে এক অন্যকে দেখে, এক অন্যকে শ্রবণ করে এবং এক অন্যকে জানে তাই হল অল্প। যা ভূমা তা অবিনশ্বর. আর যা অল্প তা মরণশীল।"[১৬]

মাণ্ডুক্য উপনিষদে এই কথাটি আরও পরিষ্কাররূপে বোঝানর চেষ্টা হয়েছে। এই উপনিষদটি আকারে ক্ষুদ্রতম হলেও তার তাৎপর্য খুব গভীর।

[১৫] দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ
মর্ত্ত্যং চা মৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ তচ্চ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৩॥ ১

[১৬] যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি
স ভূমা থ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি
তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৭॥ ২৪॥ ১

তাই তার একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এখানে প্রথমেই ব্রহ্মকে আত্মার সমস্থানীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

"এই যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, আত্মাও ব্রহ্ম এবং এই আত্মা চতুষ্পাৎ।"[১৭]

তারপর আত্মার চারটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রথম তিনটি অবস্থা ভোক্তারূপী আত্মার বর্ণনা এবং চতুর্থ অবস্থাটি অমূর্ত আত্মার বর্ণনা। যেখানে দ্বৈতবোধ আছে সেখানে ভোক্তারূপী আত্মাকে পাই। এখানে ভোগ্যের সঙ্গে আত্মা যুক্ত। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি বিশেষের আত্মার কথা বলা হয়েছে তবে তাও ত ব্রহ্মের মূর্ত রূপ। মোটামুটি এখানে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে যে ভোক্তৃভোগ্য সম্পর্কযুক্ত ব্রহ্মের প্রকাশ সেখানেও ক্রমশ স্তরে স্তরে দ্বৈতবোধ যে শিথিল হয়ে যায় তা দেখান হয়েছে। চতুর্থ অবস্থাটি ব্রহ্মের সম্পূর্ণভাবে দ্বৈতবোধবিহীন অমূর্ত অবস্থা।

প্রথম অবস্থায় পাই জাগ্রত অবস্থার মানুষের বিশ্বকে। এখানে দ্বৈতবোধ সম্পূর্ণরূপে প্রকট। ভোগ্য বিশ্ব ও ভোক্তারূপী ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্ক এখানে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাই তার নিকট রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সমন্বিত বিশ্ব পূর্ণ মহিমায় প্রতিভাত। এখানে তাই বলা হয়েছে জাগরিত অবস্থায় আত্মা 'বহিঃপ্রজ্ঞ'। আত্মা এখানে বহিঃপ্রজ্ঞ, কারণ এখানে বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈচিত্রময় জগৎ পরিপূর্ণরূপে প্রকট।

দ্বিতীয় অবস্থা পাই স্বপ্নে। এখানেও দ্বৈতাবস্থা বর্তমান। কিন্তু তা খানিক পরিমাণ ম্লান হয়ে গিয়েছে। এখানে ভোক্তা আছে, কিন্তু প্রকৃত ভোগ্য এখানে বর্তমান নেই, প্রকৃত ভোগ্যের এখানে স্থান নিয়েছে তার কল্পিত রূপ। সে রূপটি আবার ভোক্তাই সৃষ্টি করে। এখানে যে দ্বৈতবোধ তার সহিত বাহিরের বিশ্বের কোনো সংযোগ নেই। তাই জন্য আত্মাকে এখানে 'অন্তঃপ্রজ্ঞ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থা পাই সুষুপ্তিতে। সে অবস্থায় মানুষ এমন ভাবে ঘুমায় যে তার নিদ্রা কোনো স্বপ্ন দ্বারা ব্যাহত হয় না। তাই তাকে বলা হয় সুষুপ্তি। এই অবস্থায় দ্বৈতভাব সাময়িকভাবে এক রকম লোপ পেয়ে গেছে। ঘুমের গভীরতা কমলে বা ঘুম ভাঙলে দ্বৈতভাব আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু যতক্ষণ সুষুপ্তি অবস্থা বর্তমান ততক্ষণ দ্বৈতভাব থাকে না। তাই জন্য এখানে আত্মাকে 'প্রজ্ঞানঘন' বা একীভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা একীভূত, কারণ দ্বৈতভাব লোপ পেয়ে গেছে। তা কেন প্রজ্ঞানঘন তা বোঝাতে শঙ্করাচার্য্য একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন, নিশীথের নিবিড় অন্ধকারে বহির্বিশ্ব যখন বিলীন হয়ে যায় তখন জ্ঞাতৃরূপী আত্মার জ্ঞানের ক্ষমতা

[১৭] সর্বং হি এতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ মাণ্ডুক্য॥ ২॥

থাকলেও জ্ঞান থাকে না। তাই তা প্রজ্ঞানঘন।[১৮] তবে এখানেও যে আত্মা সকল অনুভূতি শক্তি হারায় তা নয়, কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় একটা নিজস্ব সুখবোধ সম্ভবত আছে। তা না হলে স্বপ্নবিহীন সুপ্তির আনন্দের একটা স্মৃতি ঘুম ভাঙলেও আমাদের থাকে কেন?

চতুর্থ অবস্থায় আত্মা এই তিন অবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথম তিন অবস্থায় দ্বৈতভাব অল্প বিস্তর বর্তমান, কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ রূপে লোপ পেয়েছে। এই অবস্থাটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইরূপ,

"অন্তর সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, বাহির সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, অন্তর-বাহির উভয় সম্বন্ধে জ্ঞানহীন; প্রজ্ঞানঘন নয়, জ্ঞানযুক্ত নয়, জ্ঞানক্ষমতাহীন নয়। তা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, লক্ষণহীন, তা অচিন্ত্য, তা বর্ণনা করা যায় না, সেখানে কেবল একত্ব প্রকট, সেখানে বহু ও নানার জগৎ লোপ পায়; তা শান্ত, শিব এবং অদ্বৈত।"[১৯]

এই চতুর্থ অবস্থায় ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে দ্বৈতভাবমুক্ত। জাগ্রত ও স্বপ্ন, এই দুই অবস্থাতেই দ্বৈতভাব বেশ প্রকট। সেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে অবলম্বন ক'রে জ্ঞানও বর্তমান। সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে সাময়িকভাবে বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ অনুভূতি বর্তমান থাকে, তা না হলে সুষুপ্তির আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা থাকত না। কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে দ্বৈতবোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। সেই জন্য জ্ঞানের সম্ভাবনা এখানে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়ে যায়। এবং সেই জন্য ব্রহ্মকে এখানে একাত্মপ্রত্যয়সার বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অদ্বৈত বলা হয়েছে।

এই রূপটি যে ব্রহ্মের অমূর্তরূপ তা তাঁর বর্ণনা হতেই বেশ বোঝা যায়। ব্রহ্ম এখানে অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য। কঠ উপনিষদে ব্রহ্মের এই অমূর্তরূপের আর একটি সুন্দর বর্ণনা পাই। তা বলে,

"তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, তিনি অরূপ, তিনি অব্যয়, তিনি রসহীন, তিনি নিত্য এবং তিনি গন্ধহীন।"[২০]

দ্বৈতবোধ এখানে নেই, কাজেই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের জগৎ লোপ পেয়ে গেছে।

---

[১৮] যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা বিভজ্যমানং
সর্বং ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞান ঘন এব॥ শঙ্কর ভাষ্য, মাণ্ডুক্য উপনিষদ।

[১৯] নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নো ভয়তঃপ্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্॥
অদৃশ্যমব্যবহার্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়-
সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে
স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ মাণ্ডুক্য॥ ৭

[২০] অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ॥ কঠ॥ ১॥ ৩॥ ৫

এই অদ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্মের দ্বৈতভাব খণ্ডন হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর জ্ঞানশক্তিও কি লোপ পেয়ে যায়? উপনিষদগুলি যেন তা স্বীকার করতে অসম্মত মনে হয়। এক অবস্থায় দেখা যায় ব্রহ্মের প্রকৃতিই জ্ঞানস্বরূপ এই রকম একটা ধারণা উপনিষদের বাণীতে প্রকাশ হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে সত্য, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত বলে।[২১] ব্রহ্ম যে সত্য এবং অনন্ত হবেন তা এমনি বোঝা যায়। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ বলতে কি বোঝান হয়েছে তা ঠিক বলা যায় না। তার অর্থ কি হল এই যে ব্রহ্মের প্রকৃতি হল জ্ঞানজাতীয় বস্তুর মত? এই উপনিষদেই সেই কথার যেন সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে অন্যত্র বলা হয়েছে, "ব্রহ্মকে বিজ্ঞান বলে জানা উচিত।"[২২]

এই চিন্তাধারা কিন্তু পরিণত অবস্থায় আর এক রূপ নিয়েছিল। তখন কেবল মাত্র এই কথাই সাধারণভাবে বলা হল না যে ব্রহ্ম প্রকৃতিতে জ্ঞানস্বরূপ, আরও অতিরিক্ত বলা হল যে তিনি শুধু জ্ঞান স্বরূপ নয়, তিনি সর্ব অবস্থাতেই জ্ঞাতাস্বরূপ। তাঁর সেই জ্ঞাতৃস্বরূপ চিরস্থায়ী এবং অবিনাশী। এই মত অনুসারে যখন দ্বৈতভাব থাকে না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের জগৎ লোপ পায়, তখনও ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব রূপ লোপ পায় না। এক কথায় বলতে গেলে, আমরা উপনিষদের যুগের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক ঋষির সহিত সম্পূর্ণভাবে এই মতটি সংযুক্ত করতে পারি। এ কথাটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ উপনিষদের অন্য কোনো ঋষি সম্পর্কে কোনো বিশেষ মতের এমন সুস্পষ্ট উল্লেখ আমরা আর পাই না। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের বিস্তৃত বক্ষে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁর নিজের উক্তি অনেক স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সেই উক্তিগুলির মধ্যেই ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃরূপের বিশেষ ব্যাখ্যা আমরা পেয়ে থাকি। সুতরাং এই মতটিকে যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষ মত বলে প্রচার করা মোটেই অসঙ্গত হবে না। নানা ক্ষেত্রে, নানা ভঙ্গিতে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাবে এই মতটিকে গড়ে তুলেছেন আমরা এবার তার বিবরণ দেব।

আমরা উপরেই উল্লেখ করেছি যে আত্মা বা ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর প্রকৃতি যে মানসিক বস্তুর ধরনের, এইরূপ একটি মত উপনিষদে পূর্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষ মতটি এই সাধারণ মতকেই ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। ঠিক বলতে গেলে, এই মতটিকে পরিস্ফুট ক'রে তিনি

---

[২১] সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ বল্লী॥ ১

[২২] বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ বল্লী॥ ৫

পরিবর্ধিত করেছেন। কাজেই ব্রহ্মের প্রকৃতি যে বিজ্ঞানময় সে কথা তিনি সুরু হতেই স্বীকার ক'রে নেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণে তিনি বলেছেন,

"এই মহান অজ আত্মা হলেন বিজ্ঞানময়, প্রাণীদের হৃদয়ে যে আকাশ থাকে সেখানে তিনি শায়িত। তিনি সকলের প্রভু সকলের অধিপতি।"[২৩]

শুধু তাই নয়, তার অতিরিক্তও কিছু বলেন। তিনি বলেন যে এই ব্রহ্ম শুধু বিজ্ঞানময় নয়, তিনি হলেন জ্ঞাতৃরূপী। দ্বৈতভাবের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাতার যে রূপ তা ব্রহ্মের স্থায়ী প্রকৃতি। তাঁর সেই রূপ সকল অবস্থায় বর্তমান। বাস্তব জগতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু ও নানার জগতে যেখানে প্রতিনিয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বিরাজমান, সেখানে ত তাঁর জ্ঞাতৃরূপ আছেই। শুধু তাই নয়, যখন দ্বৈতভাব থাকে না, যখন নানা ও বহুর জগৎ থাকে না, কোনো জ্ঞেয় বস্তু থাকে না, তখনও তাঁর জ্ঞাতৃরূপ বর্তমান থাকে, তা লোপ পায় না।

বিদেহ রাজ জনকের সভায় একবার দার্শনিক পণ্ডিতদের বিতর্কের এক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় অনেক দার্শনিক পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিখ্যাত নারী দার্শনিক গার্গী তাঁদের অন্যতম। গার্গী সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, যা সবার শ্রেষ্ঠ বস্তু, যা সকল বস্তুর আশ্রয়, এমন কি আকাশেরও আশ্রয় তা কি?

তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন,

"হে গার্গী, সেই অক্ষর বস্তু হলেন যিনি নিজে অদৃষ্ট হয়েও সবার দ্রষ্টা, যিনি নিজে অশ্রুত, কিন্তু সবার শ্রোতা, যিনি নিজে অমত কিন্তু অপরকে মনন করেন, যিনি নিজে অবিজ্ঞাত কিন্তু সকলের বিজ্ঞাতা; তাঁর থেকে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই, তার থেকে ভিন্ন শ্রোতা নাই, তাঁর থেকে ভিন্ন মন্তা নাই, তাঁর থেকে ভিন্ন বিজ্ঞাতা নাই।"[২৪]

দ্বৈতভাবের মধ্যে এই বিজ্ঞাতৃরূপ যে বজায় থাকবে তা বোঝা অতি সহজ; কিন্তু যখন দ্বৈতভাব থাকবে না তখনো কি ব্রহ্মের এই জ্ঞাতৃরূপ বজায় থাকবে? এই সম্বন্ধেই জাগে প্রশ্ন। সে সম্বন্ধেও যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছেন খুব স্পষ্ট।

---

[২৩] স বা এষ মহান অজ আত্মা যোঽয়ং
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয়
আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ
সর্ব্বস্যাধিপতিঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ৪॥ ২২

[২৪] তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ
অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি
দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ
নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে
গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৩॥ ৮॥১১

তাঁর মতে এই দুই অবস্থায় জ্ঞেয় বস্তুর অভাব ঘটবার অর্থাৎ দ্বৈতভাবের হানি ঘটবার সম্ভাবনা। এক হল মৃত্যুর ফলে এবং দ্বিতীয় হল সমাধিস্থ অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত বিলীন হবার ফলে। কিন্তু এই উভয় অবস্থার কোনোটিতেই ব্রহ্মের জ্ঞাতৃস্বরূপ খণ্ডন হয় না।

এই দুটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমরা পাই যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ীর গল্প হতে। এই গল্প বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুইবার উল্লিখিত হয়েছে।[২৫] সে গল্পের সহিত আংশিক পরিচয় ইতিমধ্যেই আমাদের ঘটেছে। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট পরাবিদ্যার কথা শুনতে চেয়েছিলেন। এই সূত্রে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে এই উক্তিটি করলেন,

"যেমন লবণকে উদকে ফেললে পরে তা উদকেই বিলীন হয়ে যায়, তাকে আর আলাদা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, যেখানকার জল গ্রহণ করা হক, তাই লবণাক্ত, ঠিক সেই রকম এই বিরাট ব্রহ্ম, অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম এই নানা প্রাণী হতে উদ্ভূত হয়ে তাতেই বিলীন হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না।"[২৬]

মৃত্যুর পরে যে সংজ্ঞা থাকে না এই কথাটি মৈত্রেয়ী ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর সন্দেহ হল মৃত্যুর পর বুঝি আত্মার অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যায়। তাই তিনি এ বিষয় আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য তখন বললেন যে যেখানে দ্বৈতভাব থাকে সেখানে পরস্পরের জ্ঞান, আঘ্রাণ, ভোগ ইত্যাদি সম্ভব, কিন্তু যেখানে দ্বৈতভাব খণ্ডন হয়, সেখানে তা সম্ভব নয়। মৃত্যুর ফলে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বৈত-ভাবের লোপ হয়। তাই জ্ঞান সম্ভব থাকে না, কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব লোপ পায় না। তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করা যাক,

"যেখানে দ্বৈতের মত হয় সেখানেই একজন অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দেখে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জানে, আর যেখানে সবই কেবলমাত্র আত্মায় (জ্ঞাতৃরূপে) পরিণত হয়, সেখানে কে কাকে ঘ্রাণ করবে, কে কাকে দেখবে কে কাকে শুনবে, কে কাকে অভিবাদন করবে, কে কাকে মনন করবে,

---

[২৫] দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণে।

[২৬] স যথা সৈন্ধব খিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানু-
বিলীয়েত ন হ অস্য উদ্গ্রহণায় এব স্যাদ্ যতঃ
তু আদদীত লবণমেব এবং বা অরে ইয়ং মহদ্
ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ
সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য
সংজ্ঞাস্তীতি অরে ব্রবীমীতি হোবা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ১২

কে কাকে জানবে? যিনি সব কিছু জানেন তাঁকে কে জানবে, বিজ্ঞাতৃকে কে জানবে?”[২৭]

তা হলে যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত হল এই যে মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ হয় না, কেবল দ্বৈতভাবের খন্ডন হয়, কিন্তু আত্মার যে জ্ঞাতৃরূপ তা বজায় থাকে। কারণ সেটি তার নিজস্ব ও স্থায়ীরূপ, তার বিনাশ নাই। তিনি বলেছেন মৃত্যুর পর দ্বৈতভাব খন্ডন হয়ে কেবলমাত্র আত্মার জ্ঞাতৃরূপ থেকে যায়।

কেন যে এই জ্ঞাতৃভাবের খন্ডন অদ্বৈত অবস্থাতেও হয় না, তার কারণ যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে গুরু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে অবহিত। সুযোগ পেলেই তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ হতে দার্শনিক তত্ত্বকথা শুনে নিতেন। এমনি এক শুভসুযোগে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হতে ধ্যানস্থ আত্মার ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হলে কেমন অবস্থা দাঁড়ায় তার ব্যাখ্যা আদায় ক'রে নিয়েছিলেন। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত এই অবস্থাতেও দ্বৈতভাবের লোপ হয়। কাজেই তিনি কিছুই দেখেন না বা শোনেন না বা জানেন না। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে তখন আত্মার এই দ্রষ্টৃশক্তি লোপ পেয়েছে। তা লোপ পেতে পারে না, কারণ এই দ্রষ্টৃশক্তি অবিনাশী। তবু আত্মা যে এই অবস্থায় কিছু দেখে না, তার কারণ, দ্বৈতভাব লোপ পেয়েছে বলে দেখবার বা শোনবার বা জানবার কিছু থাকে না। নিশীথের গভীর অন্ধকারে সব বস্তু ঢাকা পড়লে চোখের দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্বেও চোখ দেখতে পায় না। এও সেই রকম। যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে বলেছেন,

“এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক সংপরিষ্বক্ত হলে কি বাহিরের, কি ভিতরের কোন কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে না। এখানে পিতা অপিতা হয়, মাতা অমাতা হয়, বিভিন্ন লোক আলোক হয়। পুরুষ যে কিছু দেখে না, তার কারণ, দেখেও তা কিছু দেখবার পায় না; দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না, কারণ তা অবিনাশী তা হতে দ্বিতীয় বিভিন্ন কেউ নেই যাকে সে দেখবে।”[২৮]

[২৭] যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর
ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি
তদিতর ইতরং মন্যতে তদিতর ইতরং জানাতি যত্র বাস্য
সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ
কেন কং শৃণুয়াৎ কেন কমভিবদেৎ কেন কং মন্যেৎ কেন কং
জানীয়াৎ যেনেদং সর্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারম
কেন বিজানীয়াদিতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ১৪

[২৮] এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো
ন বাহ্যং কিং চ ন বেদ নান্তরম্।
অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকাঽলোকাঃ॥
যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি
ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ
ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥৩॥২১—২৩

এইসব আলোচনা করে মনে হয় এক অবস্থায় উপনিষদে ব্রহ্মন্ ও আত্মন্ সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও পরে আত্মন্-এর একটি বিশেষ অর্থ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মন্ বলতে যেন ব্রহ্মের মূর্ত রূপটিকেই বোঝায়, যে রূপ দ্বৈতবোধের ওপর ভিত্তি করে শব্দ, স্পর্শ, গীত ও বর্ণের বহু ও বিচিত্র জগৎরূপে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাকেই জ্ঞাপন করে। অপর পক্ষে ব্রহ্মের অমূর্ত রূপটি জ্ঞাপন করতে আত্মন্ কথাটির বিশেষ প্রয়োগ হয়। এখানে দ্বৈতবোধ লোপ পায় এবং সেইজন্য দেখবার বা শোনবার বা জানবার কিছু থাকে না। কিন্তু তাই বলে আত্মনের জ্ঞানশক্তি লোপ পায় না; কারণ, তা অবিনাশী। শঙ্কর বলেন, সূর্য যেমন মহাকাশে কিরণ ধরবার কিছু থাক বা নাই থাক তবু কিরণ বর্ষণ করে, এই অবস্থায় আত্মাও সেরূপ তার দ্রষ্টৃত্ব হারায় না যদিও দেখবার কোনো বস্তু থাকে না।

এখন ব্রহ্মের এই দুটি রূপের মধ্যে উপনিষদের ভাবধারায় কোন্‌টির প্রতি পক্ষপাত বেশী তা লক্ষ্য করা যায় কি? উপনিষদের বিভিন্ন বাণী আলোচনা ক'রে মনে হয় যেন তা যায়। উপনিষদের পক্ষপাত যেন মূর্তরূপটির প্রতি। ব্রহ্ম যেন নিজেরই গরজে নিজের অবিমিশ্র একত্ব পরিহার ক'রে দ্বৈতের ভিত্তিতে বহু ও বিচিত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সে গরজটি কেন? তার উত্তর উপনিষদের ঋষি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ব্রহ্মের প্রকৃতিই হল এ রকম, যে তিনি রস আস্বাদন করতে উৎসুক। রসের বিকাশের জন্য দ্বৈতভাবের প্রয়োজন। দুই না থাকলে রসের আসর জমে না। দুই হাত না হলে তালি বাজে না, দুই পা না হলে নৃত্যের তাল থাকে না, দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সত্তা না থাকলে জানা জানি, ভালবাসাবাসির সম্ভাবনা নাই। পরম সত্তা রস উপলব্ধি ক'রে আনন্দ পান। তার জন্যই তাঁর বহু হওয়া প্রয়োজন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে,

"তিনি রস স্বরূপ। তিনি রস উপভোগ করে আনন্দ পান।"[২৯]

এখন রস উপলব্ধি হয় কি ক'রে? অদ্বৈত অবস্থার অবিমিশ্র একত্বের মধ্যে রসের উপলব্ধির অবকাশ নেই। রসের ধারা বইতে হলে চাই দ্বৈতভাব, চাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের জগৎ, চাই তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার বিভিন্ন মানুষের বহু মন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, দুয়ের প্রীতি—এদের অবলম্বন ক'রেই ত রসের ধারা বয়। যেখানে একমাত্র দ্বৈতবিহীন সত্তা বর্তমান সেখানে রস বয় না, সেখানে আনন্দ উপলব্ধির অবকাশ নাই।

সেই জন্যই উপনিষদে বলে যে একদা একা থাকলেও তিনি একাকীত্ব আদৌ উপভোগ করলেন না, তাই রসের উপলব্ধির জন্যই তিনি বহু ও

[২৯] রসো বৈ সঃ॥ রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ২॥ ২৭

বিচিত্রের মূর্ত রূপ গ্রহণ করলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে,

"এই সবই আগে এক এবং অদ্বিতীয় রূপে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তিনি আনন্দ পেলেন না। সে জন্যই ত কেহ একাকী আনন্দ পায় না। তাই তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন।"[৩০]

প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় রূপেই ছিলেন; কিন্তু একা থাকলে যে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দরূপ প্রকট হয় না। তাই একা একা তাঁর ভাল লাগল না। সেই কারণেই তিনি দুয়ের ভিত্তিতে প্রকাশ নিতে চাইলেন। তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন। তখন তিনি নিজেকে বহু করলেন। তখন জ্ঞাতা এল, জ্ঞেয় এল, দ্রষ্টা এল, দৃশ্য এল, শ্রোতা এল, শ্রোতব্য এল, ঘ্রাতা এল, ঘ্রাতব্য এল, এই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল।

ব্রহ্মের স্বকীয় তৃপ্তির জন্যই এমনটি ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দ রূপটি প্রকাশ হত না যে। তখন বিশ্ব জুড়ে দ্বৈত সঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বিশ্বসত্তার আপন মাধুরী আপন চক্ষে ধরা পড়ল। তখন পান্নার রঙ হল রাঙা, চুনির রঙ হল সবুজ, মেঘে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের কিরণ সাত রঙে রঙীন হল। তখন বাতাসের স্পর্শ ঠেকল মিষ্টি, রজনীগন্ধার গন্ধ নাকে লাগল ভাল। তখন পাখীর গান কানে লাগল মধুর। তখন মানুষের চোখের সামনে বিশ্বের সুন্দর রূপটি সার্থক হয়ে উঠল। তখনি আনন্দের উৎস উৎসারিত হল। বিশ্ব মধুময় হয়ে উঠল। তখন উপনিষদের ঋষি বললেন,

"এই পৃথিবী সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বরূপ, সকল প্রাণী পৃথিবীর নিকট মধুস্বরূপ।"[৩১]

শুধু কি পৃথিবী? পৃথিবীর প্রাণী, পৃথিবীর নানা বস্তু দ্বৈত সঙ্গীতের সংস্পর্শে এসে তারাও মধুময় হয়ে উঠল। বাতাস হল মধুময়, নদীর বক্ষ ভরে মধুর ধারা বয়ে চলল, রবির রঙে রাঙা হয়ে ঊষাও মধুময় হল, নক্ষত্র খচিত আকাশ নিয়ে রজনীগন্ধার গন্ধভরা রাত্রি মধুময় হল, এমন কি সামান্য ধরণীর ধূলাও মধুময় হয়ে উঠল। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,

"বাতাস মধু ছড়াচ্ছে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করছে, রাত্রি ও ঊষা মধু দিয়ে ভরা, পৃথিবীর মাটি মধুর।"[৩২]

---

[৩০] ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥
স বৈ নৈব রেমে ॥
তস্মাদেকাকী ন রমতে ॥
স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৩

[৩১] ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥
অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১

[৩২] মধু বাতা ঋতায়তে ॥ মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ॥
..........মধু নক্তমুতোষসো ॥ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৬ ॥ ৩ ॥ ৬

এই বাতাস, এই নদী, এই রাত্রি, এই ঊষা, এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর ধূলি—এই সব কিছু নিয়ে, সব কিছু জড়িয়ে, সব কিছুকে মধুসিক্ত করে যে সত্তা প্রকাশ হয়েছেন, তাঁকে উপনিষদের ঋষি অভিবাদন জানালেন, "ব্রহ্মের আনন্দময় ও অমৃতরূপ বলে।"[৩৩]

উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের মূর্ত অবস্থার এই মনোহরণ রূপটি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

"যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ, গন্ধ, গীত করিছে রচনা"[৩৪]

সুতরাং ব্রহ্মের যে রূপটি মূর্ত, যে রূপটি চঞ্চল, সেই রূপটির প্রতিই ব্রহ্মের স্বাভাবিক আকর্ষণ, কারণ সেইটিই তাঁর আনন্দরূপ। যেখানে দ্বৈত-ভাব খণ্ডিত হয় সেখানে ব্রহ্ম শান্ত , ব্রহ্ম একাকী, সেখানে ব্রহ্ম রস পান না। এ দুটি রূপের একটিকে নির্বাচন ক'রে নিতে হলে ব্রহ্ম কোন্‌টিকে বর মাল্য দেবেন ?

এ প্রশ্ন যদি রবীন্দ্রনাথকে করা হত তিনি তার সোজা উত্তর দিতেন, চঞ্চল দ্বৈতভাবমণ্ডিত মূর্ত রূপটিকেই বরমাল্য দেব। তাঁর একটি কবিতার মধ্যে সে উত্তর তিনি দিয়ে গেছেন। ব্রহ্মের যে রূপটি অমূর্ত, যা স্পর্শ করা যায় না, যা দেখা যায় না, যা শোনা যায় না, যাকে নেতিবাচক শব্দের প্রয়োগ ভিন্ন বর্ণনার উপায় নেই, তা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

"তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,—
না, না, না,
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
না আমি, না তুমি
ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়।"[৩৫]

বর্ণনাটি উপনিষদের বর্ণনার সঙ্গে কি সুন্দর মিলে যায়। যিনি অসীম তিনি মানুষের সীমানায় সাধনা করছেন কেন? কারণ সম্পূর্ণ একাকীত্ব তাঁর

৩৩ আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌ বিভাতি॥ মুণ্ডক॥ ২॥ ৭
৩৪ রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা পৃ, ৪১৬
৩৫ রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা পৃ, ৬৮৩

ভাল লাগল না। তাই যিনি অসীম, যিনি ব্রহ্ম, তিনি সাধনা ক'রে দ্বৈতবোধ স্থাপন করলেন। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে,

"তিনি কামনা করলেন আমি বহু হব, আমি জন্মগ্রহণ করব। তিনি তপস্যা করলেন, তপস্যা ক'রে এই সব কিছু সৃষ্টি করলেন।"[৩৬]

দ্বৈতবোধ স্থাপনের জন্য তপস্যা করতে হয় বৈ কি। তা যে দুর্লভ সম্পদ, তাই তা সাধনার জিনিস। সেই তপস্যার ফলে কি হল? উপরে উদ্ধৃত কবিতার পরের অংশে কবি তা বলেছেন,

"সেই আমির গহনে আলো আঁধারে ঘটল সংগ্রাম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে।"

সুতরাং দ্বৈতভাবের মধ্যেই যেন ব্রহ্মের পূর্ণতর রূপটি প্রকাশ পায়। সেই অবস্থাতেই বর্ণ ও বৈচিত্রে ভরা, বহুকে জড়িয়ে নিয়ে, নিরেট বিশ্বের অভ্যুদয় হয়। তা হেলার জিনিস নয়, তা বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সেই জন্যই ত ব্রহ্মেরও তপস্যা করতে হয়। তবেই ত এই বহু দ্বারা খণ্ডিত বিশ্বের বৈচিত্র আত্মপ্রকাশের পথ পায়। এই দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য সমন্বিত দ্বৈত-বোধের বিশ্বের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমাদের মহাকবি বিশেষ সচেতন। তাই ত তিনি একই কবিতায় বলেছেন,

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।"[৩৭]

দ্বৈতভাবের ঐশ্বর্যের রূপটি কেমন তা খুব সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয় দ্রষ্টারূপী মানুষকে বিশ্বের বক্ষ হতে সরিয়ে নিলে। তার এমন সুন্দর একটি ছবি এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন যা কেবল তিনিই পারেন। তা পাই এই কবিতারই শেষ অংশে,

"মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।

---

[৩৬] সোঽকাময়ত॥ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি॥
সতপোঽতপ্যত॥ স তপস্তপ্ত্বা॥
ইদং সর্ব্বমসৃজৎ॥ যদিদং কিং চ॥ তৈত্তিরীয়॥ ২॥ ৬

[৩৭] রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, পৃ., ৬৮৩

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙ্গুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিত তত্ত্ব নিয়ে।"

অদ্বৈত অবস্থার অমূর্ত ব্রহ্ম সত্যই কবিত্বহীন, সে অবস্থায় তাঁর আনন্দরূপ বিলয় হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্বাভাবিক আকর্ষণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে রঞ্জিত মূর্ত রূপের প্রতি না হয়ে যায় কি করে! সেই রূপেইত তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' হলেন।

এখন ব্রহ্মের এই আনন্দ রূপটি কি রকম তার একটি ধারণা করা দরকার। উপনিষদের বিভিন্ন বচন হতে মোটামুটি তার একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। এই আনন্দ রূপের প্রকাশ ব্রহ্মের মূর্তরূপে। আমরা জানি সেই মূর্তরূপের বৈশিষ্ট্য হল তা মর্ত্য, তা চঞ্চল এবং তা অস্থায়ী। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে, স্থান কালের কাঠামোতে তাঁর যে রূপটি ফুটে ওঠে, তা চঞ্চল, তা নিত্য পরিবর্তনশীল, তার মধ্যে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, তার মধ্যে সৃষ্টি আছে ধ্বংস আছে। তাই যদি হয়, তা হলে তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, আনন্দের অবকাশ কোথায়?

তার উত্তরও উপনিষদের ঋষি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতার ওপর। অল্প বিদ্যার ভিত্তিতে সংকুচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেখানে জন্ম আছে মৃত্যু আছে, মৃত্যুর দুঃখ আছে, হাসি আছে কান্না আছে, কান্নার কষ্ট আছে। সেটা হল কিন্তু সুখ দুঃখের জগৎ, সেটা আনন্দের জগৎ নয়। কিন্তু পরাবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে আমাদের অনুভূতি স্বতন্ত্র রূপ নেয়। তখন মৃত্যুতে শোকের দাহ থাকে না, কান্নায় দুঃখ স্পর্শ করে না। সেখানে জন্মের যা মূল্য মৃত্যুর সেই মূল্য, হাসির যা মূল্য কান্নার সেই মূল্য, সুখের যা মূল্য দুঃখের সেই মূল্য।

সেটা কি করে হয়? সেটা হয় তখনি যখন পরম রসিক ব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা বিশ্বকে দেখি। তিনি অমূর্তরূপের নিঃসঙ্গ, স্থিতিশীল একত্ব খণ্ডন ক'রে মূর্ত হলেন লীলার জন্য, মূর্ত হলেন খেলার জন্য। এই খেলার দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হলে মৃত্যু, দুঃখ, কান্না, এরা আনন্দের ব্যাঘাত না হয়ে আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং, এ আনন্দ খেলার আনন্দ, এ আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ। সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, ভাল মন্দ, জন্ম মৃত্যু তার উপাদান, তাদের জড়িয়ে নিয়ে এই আনন্দের প্রকাশ।

কথাটা সত্যই রহস্যের মত শোনায়। তাই পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যে কোনো খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকে।

তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই খেলা জমে ওঠে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারও ভাগ্যে জোটে পরাজয়, কারও ভাগ্যে জয়। যে হারে সে পায় দুঃখ, যে জেতে সে পায় সুখ। কিন্তু এই পরাজিতের দুঃখ এবং বিজয়ীর সুখ, উভয়কে জড়িয়ে নিয়ে খেলা জমে ওঠার যে আনন্দ, তা জোটে সকল নিরপেক্ষ দর্শকের ভাগ্যে। এখানে এই আনন্দের উপাদান হল বিজয়ীর সুখ ও বিজিতের দুঃখ। দুঃখ এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে আনন্দের উপাদান হতে পারে।

সুখের যা বিপরীত তাকে আমরা দুঃখ বলি, কিন্তু আনন্দ ঠিক দুঃখের বিপরীত নয়। নাট্যকার যখন নাটক লেখেন, তখন তিনি কাউকে আঁকেন দুঃখের ভাগী করে, কাউকে দেন বিশ্বের সকল সুখ ও সম্পদ। কাউকে আঁকেন নানা দোষের আধার ক'রে, কাউকে করেন সকল গুণের আকর।। এইভাবে সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ প্রভৃতি জিনিসকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার ক'রে তিনি নাটক গড়ে তোলেন। ফলে নাটকে যে রস ঘনিয়ে ওঠে, তা আনে পাঠকের মনে আনন্দ। এখানেও দুঃখ, মন্দ, কান্না সব হয়ে দাঁড়ায় আনন্দ-রসের উপাদান। আনন্দ দুঃখের বিপরীত বস্তু নয়। বিয়োগান্ত নাটক দেখে আমরা দুঃখ পাই, অনেকে কাঁদিও বটে, তবু নাটকের অভিনয়-নৈপুণ্যের গুণে আমরা আনন্দ পাই।

ব্রহ্মের মূর্তরূপের যে প্রকাশ আমরা পাই, তারও প্রেরণা হল আনন্দ এবং তারও উপাদান হল ভাল মন্দ, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু। আমরা কেউ মন্দ হয়ে গড়ে উঠি, কেউ ভাল হয়ে, কারও ভাগ্যে জোটে দুঃখ, কারও ভাগ্যে সুখ, কারও ভাগ্যে আসে জন্ম, কারও ভাগ্যে মৃত্যু। কিন্তু সকলকে জড়িয়ে নিয়ে ফুটে ওঠে আনন্দের প্রবাহ। তাই হল ব্রহ্মের আনন্দরূপ।

ব্রহ্মের মূর্ত রূপটি চঞ্চল ও অস্থায়ী। তার মধ্যে ভাঙা আছে গড়া আছে, জন্ম আছে মৃত্যু আছে, সুখ আছে দুঃখ আছে। এই ভাঙার আঘাত, মৃত্যুর শোক ও দুঃখের যন্ত্রণা, সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে আছে বৈ কি। তাদের জয় করতে হলে চাই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, লীলার দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি বিশেষের খণ্ডিত স্বার্থের দিক হতে দেখতে গেলে আমরা দুঃখ, কান্না, শোক—এদের এড়াতে পারব না। কিন্তু এই খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ ক'রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সেই খণ্ড সুখ দুঃখ বোধের বিরোধ লোপ পেয়ে যাবে। তখন সুখ দুঃখ আনন্দের উপাদান হয়ে উঠবে।

তাই উপনিষদ বলেছে মৃত্যুর ও শোকের আঘাতকে ব্যাহত করতে হলে, অপূর্ণ সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ ক'রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে হবে। অপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই হল অবিদ্যা। তাকে খণ্ডন করা যায় পরাবিদ্যা লাভ ক'রে। পরাবিদ্যার সাহায্যেই আমাদের মন ব্রহ্মের মূর্ত রূপের বহুর মধ্যে একত্ব উপলব্ধি করতে পারে। তখনি মৃত্যুর দাহিকা শক্তি খণ্ডন হয় এবং

আমরা ব্রহ্মের আনন্দের অধিকারী হতে পারি। তাই কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে,

"মনের সাহায্যেই এটি উপলব্ধি করতে হবে যে এখানে নানা বলে কিছু নেই। যে এখানে নানার মত দেখে সেই মৃত্যু হতে মৃত্যুর শোক পায়।"[৩৮]

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ঠিক অনুরূপ বচন একটি পাই।[৩৯]

খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দুঃখের দাহিকা শক্তি আছে। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুঃখ হয়ে পড়ে আনন্দের উপাদান। তার জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মের মূর্তরূপের বহুত্ব ও বৈচিত্র্যদ্বারা ভ্রান্ত না হয়ে তাঁর একত্ব উপলব্ধি করা। ঈশ উপনিষদ সেই কথাই বলেছে। তাতে আছে,

"যে বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সকল জীব একই আত্মারূপে উপলব্ধি হয়; সেই একত্বের দৃষ্টিভঙ্গি হেতু তাঁর শোকও থাকে না, মোহও থাকে না।"[৪০]

বিশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে যা দুঃখ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা সুখের সঙ্গে জড়িয়ে আনন্দের উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে যা মৃত্যু, তা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ। মৃত্যু আছে বলেই জন্ম আছে, মৃত্যুস্নানে সৃষ্টি শুচিতা লাভ করে, জরা ধুয়ে মুছে গিয়ে নবীন প্রাণের ধারা বয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন,

"ওগো নটী চঞ্চলা অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।"[৪১]

সুতরাং উপনিষদ বলেন ব্রহ্মের যে মূর্ত রূপটি আমাদের নিকট প্রকট তা বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত। তাই আমরা বিভ্রান্ত হই এবং সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি বলে, তার স্বরূপ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করি না। তার জন্য প্রয়োজন তার একত্ব উপলব্ধি করা। ইন্দ্রিয়নিচয় পরম সত্তার যে রূপটি আমাদের কাছে এনে দেয়, সেখানে তিনি নানা রূপে প্রকট। তবু মানুষের কর্তব্য হল সেই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে মনন শক্তির সাহায্যে তার একত্ব উপলব্ধি করা। এই একের সহিত মনকে সংযুক্ত করতে না পারলে বহুর সংঘাতে সে নিজেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। খণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু প্রকট, সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যুর দাহন

---

[৩৮] মনসৈবেদ মাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। কঠ॥ ২॥ ৪॥ ১১

[৩৯] মনসৈবানু দ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন॥
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ৪॥ ১৯

[৪০] যস্মিন সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ॥
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশ॥ ৭

[৪১] রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, পৃ, ৫৪৭

শক্তি নেই। আমরা অল্প নিয়ে থাকি বলেই যা যায় তার দুঃখ আমাদের বুকে বাজে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যু চিরন্তন লীলার ছন্দ মাত্র। তাই মৃত্যুর শোক হতে নিবৃত্তি পেতে, মনকে শান্ত করতে আমাদের একত্বের উপলব্ধি প্রয়োজন।

এ বিষয়ে উপনিষদের চিন্তাধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উপরে উদ্ধৃত তাঁর বিভিন্ন বাণী হতে তা প্রমাণ হবে। এর সপক্ষে তাঁর একটি রচনার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তা যেন উপনিষদেরই ভাষ্যের মত মনে হয় :

"বিশ্ব জগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন, মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখ শান্তি মঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খন্ড খন্ড মৃত্যু দ্বারা আহত, তাড়িত, বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতই কখন জানিয়া, কখন না জানিয়া, কখন বক্র পথে, কখন সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফেরে।"[৪২]

যে জ্ঞান সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি আনে তাই হল অবিদ্যা। যে জ্ঞান ঐক্য উপলব্ধি ক'রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে তাই হল বিদ্যা। পরাবিদ্যাও ঠিক তাই। উপনিষদে বহু স্থানে অমৃতত্বলাভ করার কথা উল্লেখ হয়েছে। সেই অমৃতত্বলাভের অর্থ এই নয় যে ব্যক্তি বিশেষ অমর হয়ে থাকবে, তার অর্থ হল, ঐক্যবোধ মনে গ্রথিত হলে মানুষ মৃত্যুকে আর শোকের কারণ বলে মনে করবে না। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধ্বংস আছে সৃষ্টি আছে, মৃত্যু আছে জন্ম আছে, কিন্তু সেখানে মৃত্যু ও ধ্বংসের দহন শক্তি নেই, কারণ, সৃষ্টিধারায় তারা অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কাজেই 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি'—এই বচনের অর্থ দাঁড়ায় তাঁকে জানলেই মৃত্যুর আর দাহিকা শক্তি থাকে না। এই শ্রেণীর অমৃতত্বেরই পিয়াসী ছিলেন উপনিষদের ঋষি।

এই সূত্রে ঈশ উপনিষদের নীচে উদ্ধৃত বচনটি প্রণিধানযোগ্য।

"অবিদ্যা এবং বিদ্যা যিনি এই উভয়কে জানেন তিনি জানেন ব্রহ্ম বহুও বটে একও বটে। অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে উপলব্ধি ক'রে মানুষ বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্বলাভ করে।[৪৩]

---

[৪২] রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, ধর্ম, পৃ. ৩৬৮

[৪৩] বিদ্যাং চা বিদ্যাং চ যস্তদ্বেদ উভয়ং স হ॥
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতত্বমশ্নুতে॥ ঈশ॥ ৭

সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গিই হল অবিদ্যা। তা বিশ্বের বহু ও নানাত্ব দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। মৃত্যুর দাহিকা শক্তি তার নিকট প্রকট। পূর্ণ বিদ্যা নানার মধ্যে একের যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলে, মৃত্যু তার কাছে আর মৃত্যু বলে প্রতিভাত হয় না, জন্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তা বিশ্ব তালের ছন্দ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু আমাদের শোক তাপ মোহ হতে পরিত্রাণ করে না, তা ব্রহ্মের মূর্ত রূপের যা বৈশিষ্ট্য, তাঁর সেই আনন্দ রূপকে আমাদের নিকট উদ্ভাসিত করে। তখন আমাদের চোখে কে যেন এমন এক মায়া অঞ্জন বুলিয়ে দেয় যা আনন্দলোকের অনন্ত ঐশ্বর্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করে। রবীন্দ্রনাথ যেন সেই আনন্দেরই আস্বাদলাভ করেছিলেন, তা না হলে তিনি এমনভাবে গাইবেন কেন,

> "কি আনন্দ কি আনন্দ, কি আনন্দ
> দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ।"[৪৯]

এ যেন উপনিষদের সেই বচনেরই প্রতিধ্বনি যা বলে,

"যাকে না পেয়ে মনসহ বাক্য ফিরে যায় সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানলে পরে আর কোনো ভয় থাকে না।"[৫০]

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে আনন্দ উদ্ভাসিত হয় তাই হল ব্রহ্মের আনন্দ। তা এত নিবিড়, এত গভীর যে ভাষায় তাকে প্রকাশ দেওয়া যায় না। মন তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ব্রহ্মের এই রূপটিকেই ত উপনিষদের ঋষি 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

ব্রহ্মের আনন্দের প্রতি উপনিষদের ঋষি এমন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তার স্বরূপ তিনি নানা উপায়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তা যে ভাষার অতীত, তা যে বুদ্ধির অতীত তা উপরে উদ্ধৃত বচনেই বলা হয়েছে। তবু অন্যভাবে তার পরিমাপের চেষ্টা হয়েছে। তার একটু বিবরণ এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাপের বৃহদারণ্যক এবং তৈত্তিরীয় এই উভয় উপনিষদেই চেষ্টা হয়েছে। হিসাবের রীতিটি উভয় ক্ষেত্রেই এক ধরণের। সুতরাং তাদের একটি উদ্ধৃত করলেই আমাদের কাজ হবে। তৈত্তিরীয় উপ-নিষদে আনন্দের পরিমাপ নির্ধারিত হয়েছে এই ভাবে :

"ব্রহ্মের আনন্দ এইরূপ। এক সাধু যুবক থাকবেন এবং তিনি হবেন দৃঢ়তম এবং বলিষ্ঠ, সকল আশীর্বাদ তাঁর মিলবে এবং তাঁর জন্য এই সমগ্র

---

[৪৯] রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, অরূপরতন, পৃ. ৮০১

[৫০] যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে॥ অপ্রাপ্য মনসা সহ॥
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্॥ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ তৈত্তিরীয়॥ ২॥ ৯

পৃথিবী ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ থাকবে। এই হল একটি মানুষের আনন্দের পরিমাণ। এইরূপ এক শত মানুষের আনন্দ একটি মনুষ্য-গন্ধর্বের আনন্দের সমান। এইরূপ এক শত মনুষ্য-গন্ধর্বের আনন্দ এক দেব-গন্ধর্বের আনন্দের সমান। এইরূপ এক শত দেব-গন্ধর্বের আনন্দ এক পিতৃলোকের আনন্দের সমান। এইরূপ এক শত পিতৃলোকের আনন্দ এক অজানজ দেবলোকের আনন্দের সমান। এইরূপ একশত অজানজ দেবতার আনন্দ এক কর্মদেবতার আনন্দের সমান। এই এক শত কর্ম দেবতার আনন্দ এক দেবতার আনন্দ। এই এক শত দেবতার আনন্দ এক ইন্দ্রের আনন্দের সমান। এইরূপ একশত ইন্দ্রের আনন্দ এক বৃহস্পতির আনন্দের সমান। শত বৃহস্পতির আনন্দ এক প্রজাপতির আনন্দ। এবং এক শত প্রজাপতির আনন্দ এক ব্রহ্মের আনন্দের সমান।"[৪৬]

এই বিরাট গুণের অংকটি কষতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। কষতে পারলেও তার ধারণা একটা মনে মনে ক'রে নেওয়া বেশ শক্ত হয়ে পড়বে। মোটামুটি এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ অঙ্কে কষা যায় না, তা অনন্ত, তা অপরিমিত, তা হল উপনিষদের ভাষায় যাকে বলা হয় ভূমানন্দ।

---

[৪৬] তৈত্তিরীয় ॥ ২ ॥ ৮

পঞ্চম অধ্যায়

মায়াবাদ বনাম সর্বেশ্বরবাদ

[উপনিষদে কি মায়াবাদের সমর্থন আছে? মায়াবাদের সমর্থক উক্তি, সর্বেশ্বরবাদের সমর্থক উক্তি, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সূচক উক্তি—যিনি অবিমিশ্রভাবে এক ছিলেন তিনি বহু হয়েছেন। উপনিষদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সর্বেশ্বরবাদকে সমর্থন করে, সন্ন্যাসবাদ মায়াবাদের অনুকূল, কিন্তু উপনিষদে সন্ন্যাসবাদের সমর্থন নাই, উপনিষদের আনন্দবাদ সর্বেশ্বরবাদের অনুকূল। উপনিষদে মায়াবাদের বীজ আছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার সমর্থন নেই—শ্রীচৈতন্যের সমর্থন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে মায়াবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের সমন্বয় সাধন—রবীন্দ্রনাথের সমর্থন]

বদরায়ণ উপনিষদের দর্শনকে সূত্রাকারে গ্রথিত ক'রে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন। তার ওপর পাঁচ জন বিশিষ্ট মনীষী ভাষ্য লিখে গেছেন। তাঁরা হলেন শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভাচার্য্য ও নিম্বার্ক। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে উপনিষদের বচনগুলির ওপর সোজা নির্ভর ক'রে বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে প্রশ্নের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল তা এ ভাষ্যগুলি কর্তৃক কতখানি সমর্থিত সে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই ভাষ্যগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যখানিই তুলনায় বেশী প্রসিদ্ধ। তার সঙ্গত কারণও আছে। তিনি এ'দের মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও ভাষ্যের নিজস্ব উৎকর্ষ-গুণে ব্রহ্মের যে রূপটি তাঁর ভাষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়। তিনি কেবল মাত্র ব্রহ্মসূত্রের ওপর ভাষ্য লিখেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে এগারখানির ওপর স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাটি মায়াবাদ নামে বিখ্যাত। প্রতিটি উপনিষদের ব্যাখ্যাতেও এই মায়াবাদকে উপনিষদের বচন হতে তিনি সমর্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

আমরা তাই এই সম্পর্কে অন্য ভাষ্যগুলির প্রতিপাদ্য মতের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিস্তারিত তুলনার প্রয়োজন বোধ করি না। এখানে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার সহিত তুলনাতেই বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবার প্রস্তাব করি। আমরা এই সূত্রে প্রশ্ন তুলব শঙ্করের মায়াবাদ কি উপনিষদে সমর্থিত হয়েছে? এই প্রশ্ন ভারতের মনীষী সমাজে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছিল। এককালে শঙ্করের মায়াবাদ ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। মধ্যযুগে বাংলার যে মহামনীষী বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মজীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেই চৈতন্যদেবকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ বিষয় পরে আবার আলোচনার প্রয়োজন হবে।

ব্রহ্মসূত্রের সব ভাষ্যগুলিই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে রচিত। আরম্ভেই শঙ্করের বিশেষ দৃষ্টিকোণটির সহিত পরিচিত হয়ে নিলে তাঁর মায়াবাদের বৈশিষ্ট্য কি তা বোঝা সহজ হবে। সকল উপনিষদই এ বিষয় একমত যে এই বিশ্ব ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির সঙ্গে ব্রহ্মের এই যে কার্য কারণ সম্পর্ক তা কি ধরনের? এই প্রশ্ন সম্পর্কেই বিভিন্ন ভাষ্যকারের মতের পার্থক্য এসে পড়ে। আমাদের দেশের দর্শনে দুই শ্রেণীর কারণের কথা উল্লেখ আছে। উদাহরণ স্বরূপ ঘটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একপক্ষে ঘটের উৎপত্তি হয়েছে মৃত্তিকা থেকে। এই হিসাবে মৃত্তিকাই তার কারণ। অপর পক্ষে কুম্ভকারও ঘটের কারণ। এইরূপ স্বর্ণালঙ্কারের বিষয়েও সেই কথা খাটে। এক হিসাবে সুবর্ণ তার কারণ, অপর হিসাবে স্বর্ণকার। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম ধরনের যেটি কারণ সেটি হল তার উপাদান; মৃত্তিকা বা সুবর্ণ বিশেষ রূপ গ্রহণ করেই ত ঘট বা অলঙ্কারে পরিণত হয়। এইজন্য এই প্রথম শ্রেণীর কারণকে উপাদান কারণ বলা হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় ধরনের যেটি কারণ সেটি বস্তুর উপাদান নয়; সেটি কেবল উপাদানকে বিশেষ রূপ দিতে সাহায্য করে মাত্র। এই দ্বিতীয় কারণটিকে সেইজন্য নিমিত্তকারণ বলা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে এই সৃষ্ট বিশ্বের ব্রহ্ম কিরূপ কারণ।

শঙ্কর তার উত্তর দেন এইভাবে। তিনি বলেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ব্রহ্ম সৃষ্টির কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র। কারণ, উপনিষদে অনেক উক্তি আছে যা মোটামুটি এইরূপ বলে যে ব্রহ্ম আগে সৃষ্টি করবার ইচ্ছা করলেন, তারপর সৃষ্টি করলেন।[১] এই ধরনের কার্য-কারণ সম্বন্ধ আমরা কার্য হতে বিশ্লিষ্ট কোনো শক্তির উপরেই আরোপ ক'রে থাকি, যেমন ওপরের উদাহরণে, অলঙ্কার বিষয়ে স্বর্ণকার এবং ঘট বিষয়ে কুম্ভকার। ব্রহ্মের উপর এইরূপ কারণত্ব আরোপ করলে একটি অসুবিধা এসে পড়ে। তা হলে ব্রহ্ম আর বিশ্বের একমাত্র কারণ হতে পারেন না, আর একটি স্বতন্ত্র উপাদান কারণেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মকে উভয় শ্রেণীরই যুগপৎ কারণ বলে মেনে নিতে হয়। তিনি এই বিশ্বের উপাদান কারণও বটে নিমিত্ত কারণও বটে। ব্রহ্ম এমন স্বতন্ত্র ধরনের কারণ যে সৃষ্টিকে সম্ভব করতে অন্য কোনো দ্বিতীয় শক্তির উপর নির্ভর করেন না। একাধারে তিনি উপাদান কারণও বটে, আবার সেই উপাদানকে বিশ্বরূপে পরিণত করবার কার্যও নিমিত্ত কারণ হিসাবে তিনিই সম্পাদন ক'রে থাকেন। কাজেই এক্ষেত্রে কুম্ভকারের কারণত্বও ঠিক তাঁর উপর আরোপ করা যায় না। আবার মৃত্তিকার কারণত্ব মাত্রও তাঁর উপর আরোপ করা যায় না।[২]

[১] ব্রহ্মসূত্র; শঙ্করভাষ্য ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬

[২] নিমিত্তত্বং তু অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদান কারণং কুলালসুবর্ণাদীনধিষ্ঠাতৄনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈব ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য ॥

শারীরক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৩

ব্রহ্মকে এই ভাবে উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ বলে যুগপৎ নির্দেশ করায় এ রকম ধারণা জাগা স্বাভাবিক যে ব্রহ্ম বোধ হয় কারণ হিসাবে এক থাকেন এবং কার্যরূপে যখন রূপান্তরিত হন তখন তিনি বহুতে পরিণত হন। সাধারণত এইরূপ ধারণা জাগাই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে, সাধারণত ব্রহ্মকে একটি বৃক্ষের মূল স্বরূপ কল্পনা করা হয় এবং সৃষ্টিকে তার শাখা প্রশাখা রূপ কল্পনা করা হয়। ফলে এক হিসাবে তিনি সমগ্রকে নিয়ে এক হন, আবার অন্য হিসাবে তিনি বহু শাখার সমষ্টিরূপে বহুকেও আশ্রয় দেন। কেউ বা ব্রহ্ম এবং সৃষ্টিকে অনন্ত সমুদ্র এবং তার কোলে অসংখ্য বীচিমালার সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকেন। সেখানেও সমগ্র রূপে দেখতে গেলে ব্রহ্ম এক, আবার ব্যষ্টিরূপে দেখতে গেলে তিনি বহু হয়ে যান। শংকর কিন্তু এই ধরনের মতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে ব্রহ্ম কার্য হিসাবেও এক, কারণ হিসাবেও এক। তাঁর একত্ব তিনি কখনো কোনো অবস্থাতেই পরিবর্জন করেন না। যে ব্রহ্ম কারণ হিসাবে এক থাকেন আবার কার্য হিসাবে বহুতে রূপান্তরিত হন তিনি ত তা হলে সকল অবস্থাতেই এক রইলেন না। তাঁর মতে ব্রহ্ম সকল অবস্থাতেই অবিমিশ্রভাবে এক থাকেন।

সুতরাং শংকরের মতে ব্রহ্ম সকল অবস্থাতেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', একমাত্র এবং দ্বিতীয় বিহীন, কোনো অবস্থাতেই তিনি বহু হন না। আপাতদৃষ্টিতে এখানে একটি অসম্ভব অবস্থা এসে পড়ে। ব্রহ্ম যদি সকল অবস্থাতেই এক থাকেন, অথচ তিনি যদি বিশ্ব সৃষ্টির কারণ হন, তা হলে এই যে বিশ্বে আমরা বহু, নানা বস্তুর সমাবেশ দেখি, তার সঙ্গে ব্রহ্মের অবিমিশ্র একত্ব সামঞ্জস্য রাখবে কি ক'রে?

শংকর কিন্তু তাতে বিচলিত হন না। তিনি বলেন দৃশ্যমান জগত নিশ্চয় ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হতে ভিন্ন তা নয়। তবে বিশ্বের মধ্যে আমরা যে বহু ও নানাকে দেখি সেইটাই ভুল। বিশ্বের কোথাও নানা নাই, বহু নাই, আছেন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তবে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর বিশ্বের মধ্যে আমরা যে বহু দেখি, নানা দেখি, তাকি মিথ্যা? শংকর একরকম তাই বলেন। তাকে ঠিক মিথ্যা বলেন না, তবে বলেন তাকে বহু রূপে দেখাটা ভুল দেখা। তিনি বলেন এই বহু রূপে দেখাটা চোখের ভুল, বিষয়টি আসলে বহু নয়। দৃশ্যমান জগত ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। জগতকে আমরা যখন বহুরূপে দেখি তখন ভুল দেখি, আসলে তা একত্ব হারায় না। এখানে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে তাতে বহুর স্থান নেই। যা কার্য তাই কারণ, মূলত তারা একই। কারণকে আমরা কার্য-রূপে যে বহু দেখি তা হল দেখার ভুল। তিনি বলেছেন,

"এই ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত ব্যবহারিক বিভাগ প্রচলিত রীতির মত গৃহীত হতে পারে বিবেচনায় এই ব্যতিক্রমের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিভাগের পরমার্থত কোনো অস্তিত্ব নাই, কারণ, কার্য ও কারণের মধ্যে কোনো

পার্থক্য নাই। কার্য হল আকাশাদি বহু প্রপঞ্চময় জগৎ, কারণ হলেন পরম ব্রহ্ম, সেই কারণ হতে কার্যের পার্থক্য নাই, আছে অনন্যত্ব, এই বুঝতে হবে।"[৩]

এখন এটা বোঝা সহজ হবে যে শঙ্কর যে অর্থে ব্রহ্ম ও জগতকে কার্য-কারণ সম্বন্ধে জড়িত করেন তা সাধারণ অর্থ থেকে বিভিন্ন। সাধারণত কার্যকে আমরা কারণের পরিণাম বলে নির্দেশ ক'রে থাকি অর্থাৎ কার্যকে কারণের রূপান্তর বলে গ্রহণ করি। শঙ্কর কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টিকে ব্রহ্মের পরিণাম বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন।

তিনি বলেন জগৎ ব্রহ্মের রূপান্তর নয়, সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম একই জিনিস। সৃষ্টির মধ্যে আমরা যে এককে না পেয়ে বহুকে অনুভব করি সেটি আমাদের অনুভূতির দোষ। এখানে পরিণাম ঘটে নি, ঘটেছে বিবর্ত বা বিকৃতি। আমাদের অনুভূতি শক্তির বিকার হেতুই এরকম ঘটে থাকে, যেমন জলের মধ্যে প্রবিষ্ট সোজা লাঠিকেও আমরা বাঁকা আকারে দেখে থাকি। যখন দুধ রূপান্তরিত হয়ে দই হয় তখন আমরা পাই পরিণামকে। আর যখন রজ্জু চোখের দেখার ভুলে সর্প বলে মনে হয়, তখন আমরা পাই বিবর্তকে। এই যে চোখে দেখার ভুল ঘটে থাকে তার কারণ হল মায়া, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করবার যেমন কারণ হল অন্ধকার। 'মায়া' শক্তিটির এমন ক্ষমতা আছে যা আসল জিনিসটিকে আবৃত ক'রে রাখে এবং নকল জিনিসের সৃষ্টি করে। ফলে আমরা আসল জিনিসকে দেখতে পাই না, দেখি তার বিকৃত রূপকে। কাজেই এই যে বহুর জগত, নানার জগত, তা যে একেবারে ভিত্তিহীন তাও বলা চলে না। তা ব্রহ্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই, কিন্তু তাকে দেখার ভুলে আমরা এক দেখি না, বহু দেখি, নানার আকারে দেখি।

ব্রহ্মের সত্যরূপ, আসল অবিকৃত রূপ যা শঙ্কর এঁকেছেন তাতে তাঁর দুটি মাত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সৎ অর্থাৎ আছেন এবং তিনি চিন্ময়, অর্থাৎ জ্ঞাতৃরূপ। আমরা দ্বৈতবোধের ভিত্তিতেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পেয়ে থাকি, জ্ঞেয় না থাকলে জ্ঞাতা থাকে কি ক'রে ভেবে পাই না। শঙ্কর কিন্তু বলেন জানবার কিছু না থাকলেও ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব রূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁর জ্ঞান শক্তির কখনো বিলোপ ঘটে না। এই জ্ঞাতৃত্ব তাঁর গুণ নয়, এ তাঁর স্বভাব, যেমন লবণের স্বভাবই হল তার লবণের আস্বাদ। ব্রহ্মকে তাই তিনি 'নির্বিশেষ চিন্মাত্র' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাশূন্যে কিরণ গ্রহণ করতে কিছু থাক বা নাই থাক সূর্য মহাশূন্যে কিরণ বিকীরণ করে। ব্রহ্মেরও সেইরূপ জ্ঞানের বস্তু কিছু

[৩] অভ্যুপগম্য চৈনং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাসং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতঃ, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি, যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে॥ শারীরক ভাষ্য॥ ২॥ ১॥ ১৪

থাক বা নাই থাক জ্ঞাতৃত্ব শক্তি চির বিরাজমান।[৪] তিনি যে কিছু দেখেন না, তার কারণ দেখবার কিছু নেই। এই সম্পর্কে ঠিক পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতের সহিত এই ব্যাখ্যাটির তুলনা করা যেতে পারে। উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই।

শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার ক'রে গেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওপরে দেওয়া গেল। তিনি ঠিক এমন কথা বলেন না যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহু বস্তু সমন্বিত বৈচিত্র্যময় যে জগতের পরিচয় এনে দেয় তা মিথ্যা। তিনি বরং বলেন যে তাও এই অর্থে সত্য যে তা ব্রহ্মের উপর অধিষ্ঠিত। তবে তাকে দেখার ভুলে আমরা বহু ও বিচিত্র রূপে দেখি। জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও জগৎ একই, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগৎ সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় আমাদের এনে দেয় না।

কথাটা অন্যভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। বিশ্ব কি বহু বিশ্লিষ্ট সম্পর্কহীন বস্তুর সমষ্টি, না একই সত্তার প্রকাশ? এটি হল একটি দার্শনিক প্রশ্ন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে বিশ্ব অসংখ্য, বিশ্লিষ্ট, বিক্ষিপ্ত বস্তুর সমষ্টি মাত্র। আমাদের দেশের বৈশেষিক দর্শন তাই বলে। বহু বিশ্লিষ্ট কণার ভিত্তিতে তা বিশ্বের ব্যাখ্যা করে। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিমোক্রাইটাসও এক অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বহু বিশ্লিষ্ট অণুর সমষ্টি নিয়ে বিশ্ব গঠিত।

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লক্ষ্য করেছে যে বিশ্বে ঠিক বিশ্লিষ্ট নানা বস্তু নাই। যাকে বহু ও বিশ্লিষ্টরূপে আপাতদৃষ্টিতে দেখি, তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যধারা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক চিন্তাধারা এক নূতন পথে যায়। ফলে একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম হয়, যা বলে বিশ্ব জটিলভাবে এক, বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে, কিন্তু সেই বিভাগগুলির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের বহুত্বকে ব্যাপ্ত ক'রে একত্ব প্রকট।

শঙ্কর এই দুই দার্শনিক মতের কোনোটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বহুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই এমনকি বহুবিশিষ্ট জটিল একবাদ—যাকে আমরা সর্বেশ্বরবাদ বলি, তাকেও তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিশ্ব একটি অখন্ড সত্তা স্বরূপ। তার মধ্যে বহুর স্থান নেই। তার মধ্যে বিভাগের অবকাশ নেই।

যিনি অবিভাজ্য রূপে একক সত্তা, তাঁকে কেন তবে আমরা বহু, বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে দেখি? তিনি বলেন তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খানিক

[৪] শারীরক ভাষ্য॥ ২॥ ৩॥১৮

পরিমাণে দায়ী। তারা তাঁর যে পরিচয় আমাদের এনে দেয় তা ভুল পরিচয়। যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই, যা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি, তাকে আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে অথচ যাকে আমরা তার প্রকৃত রূপ হতে ভিন্নরূপে দেখি তাকে আমরা মায়া বলি। স্বপ্নে যা দেখি তা প্রথমটির উদাহরণ, কারণ তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির তপ্ত বালুস্তরে আমরা জল দেখি। তাকে বলি মরীচিকা। তপ্ত বালুস্তরের উপরের বায়ু কাঁপে। তার সেই কম্পনকে আমরা জলের আকারে দেখি। তা ভ্রান্তি নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা না হলে তাকে কেবল তপ্ত বালুস্তরের ওপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। শঙ্করের মতে যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুরূপে দেখি, তা এই ধরনের ব্যাপার। তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা তার অপব্যাখ্যা করি, যেমন তপ্ত বায়ুস্তরে উপরের কম্পনকে আমরা মরীচিকা বলে ভুল করি। যে শক্তি আমাদের অনুভূতিকে এমন বিকৃত করে তাকেই তিনি মায়া বলেছেন।

শঙ্কর প্রচারিত এই মায়াবাদ বিশ্বের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তি প্রয়োগ এবং স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ভাষা তাঁর নৈসর্গিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। এমন বিশিষ্ট দার্শনিকের হাতে যার প্রতিষ্ঠা তা সকলেরই প্রণিধানের বিষয় হবে। এই মায়াবাদের জন্ম হয়েছিল কিন্তু ঠিক তাঁর হাতে নয়, তাঁর প্রায় সমসাময়িক তাঁর অগ্রজ এক দার্শনিকের হাতে। তিনি ছিলেন শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু। তাঁর নাম ছিল গৌড়পাদ। আরও একটা লক্ষণীয় বস্তু হল মায়াবাদ জন্ম নিয়েছে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যার সম্পর্কে।

এই মাণ্ডুক্য উপনিষদ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। সেখানে ব্রহ্মের চারটি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রথম দুটি অবস্থা দ্বৈতাবস্থার বর্ণনা। প্রথমটি জাগ্রত অবস্থা, দ্বিতীয়টি স্বপ্নের অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গোচর জগতের স্থান নেয়, যে মন স্বপ্ন দেখে তারই রচিত একটি জগৎ। স্বপ্নাবস্থার এই বৈশিষ্ট্যই মনে হয় যেন মায়াবাদের মূল প্রেরণা। যে মন সম্পূর্ণভাবে একক সত্তা তা যদি এমনভাবে বহু হতে পারে, তা হলে জাগ্রত অবস্থার বহু ও নানা অনুভূতিও অনুরূপভাবে অসত্য হবে না কেন? এই প্রশ্নই গৌড়পাদের মনে বিশেষ ক'রে জেগেছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন জাগ্রত অবস্থার জগতও স্বপ্নাবস্থার জগতের মত অলীক এবং মায়ার খেলা। তা তাঁর কারিকা হতে নীচে উদ্ধৃত বচনে পরিষ্কার হবে। তিনি বলেছেন,

"যেমন স্বপ্নে দ্বৈতভাবাপন্ন হয়ে মন মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমন জাগ্রত অবস্থাতেও মন মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি সন্দেহাতীত যে মন

একক হয়েও স্বপ্নে দ্বৈতভাবাপন্ন হয়। তেমনি এও সন্দেহাতীত যে জাগ্রত অবস্থায় যা অদ্বয় তা দ্বৈতভাব সংযুক্ত হয়।”[৫]

সুতরাং মায়াবাদ গৌড়পাদের কারিকাতেই জন্মলাভ করেছিল। শঙ্করাচার্য তাকে গ্রহণ ক'রে নানা ভাষ্যের মধ্য দিয়ে যুক্তি ও ব্যাখ্যা দিয়ে পরিবর্ধিত ক'রে তাকে পূর্ণ আকারটি দিয়েছেন। এই মায়াবাদ মধ্যযুগে ভারতের দার্শনিক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তা সত্ত্বেও প্রাচীন উপনিষদগুলি মায়াবাদ সমর্থন করে কিনা, এ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক আছে। অনেক মনীষী স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে উপনিষদ মায়াবাদকে সমর্থন করে। বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে কেমন ক'রে মায়াবাদ সম্পর্কে বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। একবার এক মায়াবাদে বিশ্বাসী পন্ডিতের দল তাঁর ভক্তিরসামৃত প্রচারের নিন্দা করেছিলেন, এই যুক্তিতে যে তা বেদান্তের পরিপন্থী। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁদের ভীষণ বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কের বিষয় ছিল, প্রাচীন উপনিষদগুলি মায়াবাদ সমর্থন করে কি না। শ্রীচৈতন্যের মতে তা করে না। তিনি এই সম্পর্কে এই অনুযোগও করেছেন যে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে উপনিষদের ঠিক ব্যাখ্যা করেন নি।

এই অনুযোগের কি সত্যই কোনো ভিত্তি আছে? এখানে সেই প্রশ্নই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। প্রশ্ন হল প্রাচীন উপনিষদ মায়াবাদকে সমর্থন করে কি না। আমরা কেবল এই প্রশ্নটির জবাব দিতে চেষ্টা করব।

উপনিষদে প্রত্যক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক কোনো বাণী পাওয়া যায় না। তবে পরোক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক বাণী পাওয়া যায়। নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি বচন আছে তা এই রকম,

“ইন্দ্র বড় আকারে মায়াযোগে প্রকাশ হচ্ছেন, তাঁর রথে যুক্ত অশ্বের সংখ্যা দশ শত।”[৬]

শঙ্করাচার্য এই উক্তিটির সহজ অর্থ করেন নি। তাঁর ভাষ্যেতে তিনি মায়াবাদের সমর্থনে তার রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন যে ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে বহুরূপে প্রকাশ নেন এবং সেই অবস্থায় বিভিন্ন জীবের

[৫] যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়॥ গৌড়পাদ কারিকা॥ ৩॥ ৪৩

[৬] ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্ত।
হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৫॥ ১৯

যখন রূপ ধারণ করেন তখন কোথাও তাঁর ইন্দ্রিয় হয় দশ, কোথাও একশত। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে যুক্তি যে খুব শক্তিমতী তা মনে হয় না।

প্রথম, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাই ধরা যাক না। দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট প্রাণী সহজেই মিলবে, কিন্তু একশত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট প্রাণী কোথায় মিলবে জানা নেই। এখানে ব্যাখ্যা করতে কল্পনা শক্তির উপর অত্যন্ত বেশী পরিমাণ নির্ভর করতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ইন্দ্রকে এখানে ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করবার কোনো যুক্তি দেখা যায় না বরং তার বিপক্ষে ভাল যুক্তি পাওয়া যায়। এই উদ্ধৃত বচনটি ঋগ্বেদের সংহিতা অংশেও পাওয়া যায়।[৭] সংহিতায় ইন্দ্র ইন্দ্রই, তিনি বহু দেবতার একজন। সংহিতায় ব্রহ্ম কথাটি তখনো ব্যবহৃত হয় নি। কাজেই সেখানে ইন্দ্রের সরল বর্ণনা হিসাবেই তাকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন সংহিতার অংশ স্থল বিশেষে আরণ্যক বা উপনিষদের মাঝখানে প্রক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত হবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং তার সূক্তের অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসাবে যে সহজ অর্থ হয় তাকে না গ্রহণ ক'রে রূপক অর্থে গ্রহণ করা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না।

তবে সত্যই উপনিষদে এমন বাণী আছে যা মায়াবাদের পরোক্ষভাবে সমর্থন করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার ও নারদের গল্পের সহিত আমরা ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছি। নারদ তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ভূমার ব্যাখ্যা করতে সনৎকুমার এই উক্তিটি করেছেন,

"যেখানে অন্যে দেখে না, অন্যে শ্রবণ করে না, অন্যে জানে না, তাই ভূমা, আর যেখানে অন্যে দেখে, অন্যে শ্রবণ করে, অন্যে জানে তাই অল্প।"[৮]

অনুভূতিকে সম্ভব করতে হলে দুটি ভিন্নধর্মী সত্তার প্রয়োজন। তাই হল দ্বৈতভাব। একটি জানবার ক্ষমতা রাখে এবং অপরটি তার জ্ঞানের বস্তু হবার ক্ষমতা রাখে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধের ভিত্তিতেই বহু ও বিচিত্র বস্তুর সমষ্টি এই বিশ্ব প্রকট হয়। যেখানে এই দ্বৈতবোধ নেই সেখানে এই বিচিত্র বিশ্বের প্রকাশ নেই। দ্বৈতের ভিত্তিতে যা প্রকাশ তার সীমা আছে, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পরের সীমা টেনে দেয়। দ্বৈতের বাহিরে যা প্রকাশ তা সীমাহীন। তাই তা ভূমা। এখানে দ্বৈতের ভিত্তিতে যে প্রকাশ তা যে মিথ্যা ঠিক' সে কথা স্পষ্ট বলা হয় নি।

[৭] ঋগ্বেদ ॥ ৬ ॥ ৪৭ ॥ ১৮

[৮] যত্র নান্যং পশ্যতি নান্যং শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা
অথ যত্রান্যং পশ্যতি অন্যং শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং ॥
ছান্দোগ্য ॥ ৭ ॥ ২৪ ॥ ১

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কিন্তু সে কথা এক রকম স্পষ্টই বলা হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে এই কথাগুলিই একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই সামান্য ভিন্নতার তাৎপর্য অনেক। সেখানে বলা হয়েছে,

"যেখানে দ্বৈতের মত হয় সেখানে এক জন আর এক জনকে আঘ্রাণ করে, এক জন অপরকে দেখে, একজন অপরকে শোনে, কিন্তু যেখানে আত্মা ভিন্ন আর কিছু থাকে না, সেখানে কে কাকে আঘ্রাণ করবে, কে কাকে দেখবে, কে কাকে শুনবে? বিজ্ঞাতাকে কিভাবে জানবে?"[১]

এখানে দ্বৈতমিব কথাটির তাৎপর্য খুব গভীর। 'দুয়ের মত হয়' বলতে মনে হয় যেন যাজ্ঞবল্ক্য বলতে চেয়েছেন দ্বৈতভাবটা ব্রহ্মের প্রকৃত ভাব নয়, তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত। তা যদি হয়, তা হলে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে ব্রহ্মের যে বহুদ্বারা খণ্ডিত ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত বিশেষ রূপের পরিচয় আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়, তা যেন ব্রহ্মের ঠিক রূপটি প্রকাশ করে না। শুধু তাই নয়, দ্বৈতহীন অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে তিনি 'বিজ্ঞাতা' বলে বর্ণনা করেছেন। তা হলে বিশ্লেষণ করলে, তাঁর বচনগুলির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকৃত রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই। প্রথম, তিনি অখণ্ডভাবে এক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত রূপ তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয়। দ্বিতীয়, তাঁর যা অখণ্ড রূপ তা জ্ঞাতৃরূপী।

এই বাণীগুলির মধ্যেই শঙ্করের মায়াবাদের সহিত অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। মায়াবাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের এখানে সমর্থন আছে—ব্রহ্মের অখণ্ডতা, ও চিন্ময়তা। বাকি যে বৈশিষ্ট্যটুকু যা বলে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ তা অসার তা স্বপ্নবৎ, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিমত কিছু না থাকলেও পরোক্ষভাবে তার যেন সমর্থন জুটে যায় আংশিক ভাবে 'দ্বৈতমিব' এই উক্তিটির মধ্যে।

কঠ উপনিষদের আর একটি বচন আছে যা মায়াবাদকে আংশিকভাবে সমর্থন করে। ব্রহ্মের যা মূর্ত রূপ তা পরিবর্তনশীল, তা বিনাশপ্রবণ, আর ব্রহ্মের যা অমূর্ত রূপ তা স্থির তা অচঞ্চল, তা ভোক্তৃভোগ্য সম্পর্ক রহিত। এখানে দেখা যায় যে ব্রহ্মের এমন একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা তাঁর অমূর্ত রূপটিকেই ইঙ্গিত করে। তা হলে একটা পরোক্ষ সমর্থন আসে এই ভাবে যে

[১] যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি
ইতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং শৃণোতি......
যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবা ভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ
কেন কং পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ.........
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ১৪

ব্রহ্মের যে নানা ও বহুরূপে অভিব্যক্ত রূপ তার ওপর অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। সে বচনটি হল এই,

"তিনি অশব্দ, তিনি অস্পর্শ, তিনি অরূপ, তিনি অব্যয়, তিনি অনাস্বাদেয়, তিনি নিত্য এবং তিনি অগন্ধ।"[১০]

এখন প্রশ্ন হল প্রাচীন উপনিষদগুলির বচনে মায়াবাদের সামগ্রিকভাবে সমর্থন আছে কি না। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে উপনিষদগুলির মূল ভাবধারার সহিত তার সঙ্গতি আছে কিনা দেখতে হয়। প্রশ্নটি কয়েকটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলে সুবিধা হবে। সে বিষয়গুলি হল এই:

উপনিষদগুলির যে পরিবেশে জন্ম তার সঙ্গে কি মায়াবাদের সামঞ্জস্য আছে?

উপনিষদগুলির মূল ভাবধারার সহিত কি মায়াবাদের সঙ্গতি আছে?

মায়াবাদের ভিত্তি হল মুক্তিস্পৃহা এবং পার্থিব জীবনের প্রতি অবজ্ঞা। উপনিষদের মূল ভাবধারার কি তার সঙ্গে সঙ্গতি আছে?

এখন আমরা এই তিনটি প্রশ্নের পৃথক ভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

উপনিষদের যে পরিবেশে জন্ম হয়েছে তা মায়াবাদকে সমর্থন করে কি না বিচার করতে হলে, উপনিষদের দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে আমরা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চারটি স্তরের কথা পুনরুল্লেখ করতে পারি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বে এ-বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন হবে না। বর্তমান আলোচনা সম্পর্কে আমাদের কেবল প্রথম দুটি স্তরেরই পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন হবে। তাও আমরা সংক্ষেপে সারব।

এই চিন্তাধারার প্রথম স্তরটি হল বেদের যুগ এবং দ্বিতীয় স্তরটি হল উপনিষদের যুগ। উভয়ের মধ্যে একটি ক্রমবিকাশের যোগসূত্র বর্তমান। বেদে যে চিন্তাধারা অঙ্কুরিত হয়ে বিকাশলাভ করেছিল উত্তরকালে উপনিষদের বক্ষে তা পরিণতিলাভ করেছিল। বেদে যার উৎপত্তি উপনিষদে তার পূর্ণতা সংঘটিত হয়েছিল। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি এখানে আমরা সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করব।

প্রকৃতির বক্ষে যেখানে শক্তির বা সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা গিয়েছে সেখানেই বেদের ঋষি দেবতার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন। এইভাবে দেবতার পদে সূর্য অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অগ্নি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এইভাবে আকাশের দেবতা দ্যৌ এসেছেন, বায়ু এসেছেন। সকালে পূর্বদিকের আকাশ রাঙিয়ে যে সুষমা ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে ঊষা আবিষ্কৃত হয়েছেন। এইভাবেই বৈদিক ধর্মের তথা

---

[১০] অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবৎ চ যৎ॥ কঠ॥ ১॥ ৩॥ ১৫

দার্শনিক চিন্তাধারার যুগপৎ বিকাশ ঘটেছে। এই দেবতারা কিন্তু পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বলবান, কিন্তু কারও মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এইভাবে প্রথম দৃষ্টিতে ঋষির নয়নে বিশ্ব বহু বিক্ষিপ্ত শক্তির অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলে প্রতিভাত হয়েছে।

পরের অবস্থায় দেখা যায় যে এই বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট দেবতা-সমষ্টি বেদের ঋষিকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাঁরা প্রকৃতির বক্ষে শৃঙ্খলার রাজত্ব দেখেছেন; সেই উপলব্ধির সঙ্গে এই অবস্থা ত সঙ্গতি রক্ষা করে না। তাই তাঁরা এমন এক বিশেষ দেবতার সন্ধানে ফিরেছেন যিনি অন্য দেবতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন। তিনি শুধু শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন না, তাঁর অতিরিক্ত কাজ হবে ধর্মের পথে সকলকে পরিচালিত করা। শেষে বরুণের মধ্যে এই গুণগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁকে তাই অতি-দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করা হল। তিনি সকল দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাই তাঁকে বলা হল ধৃতব্রত। এইভাবে বহু বিশ্লিষ্ট দেবতা হতে এক অতি-দেবতার শাসনে বিশ্বকে স্থাপিত করা হল। একেশ্বরবাদ জন্মলাভ করল।

বেদের যুগেই উত্তরকালে এই চিন্তাধারা আরও বিকাশলাভ করেছিল। একেশ্বরবাদের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র, সৃষ্টির বাহিরে তাঁর আলাদা প্রকাশ। এই অবস্থা পরবর্তী যুগের ঋষির মনে সন্তোষজনক ঠেকে নি। তিনি আরও গভীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলেন। তার ফলে তিনি এক নূতন উপলব্ধি লাভ করলেন যা বলল, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তু হতে স্বতন্ত্র নয়, তাঁর আলাদা প্রকাশ নাই, বিশ্বই তাঁর প্রকাশ। ঋগ্‌বেদের শেষের দিকে, বিশেষ ক'রে দশম মণ্ডলে এই উপলব্ধির কথা লেখা আছে। পরিণতিতে পরমসত্তা তাঁর সৃষ্টির সহিত একীভূত হয়ে গেলেন। তাঁর নাম দেওয়া হল 'পুরুষ' এবং বলা হল বিশ্বের সব কিছু জড়িয়ে তাঁর প্রকাশ। ঋষি গাইলেন, "পুরুষ এবেদং সর্বম্।"

বৈদিক যুগে যে চিন্তাধারা অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা এইভাবে দ্রুত বিকাশলাভ করেছিল। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বহু বিশ্লিষ্ট শক্তির মধ্যে বহু দেবতার আবিষ্কার, দ্বিতীয় অবস্থায় তাদের মধ্যে সংযোগ ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে একদেবতাবাদের জন্ম এবং তৃতীয় অবস্থায় সেই দেবতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের নিগূঢ় সম্বন্ধের ভিত্তিতে সর্বেশ্বরবাদের আবির্ভাব। ঋগ্‌বেদের চিন্তাধারায় এইভাবে সর্বেশ্বরবাদের মূল রূপটি ধরা পড়ে গিয়েছিল।

এই পরিবেশের মধ্যেই উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ। অপরিণতরূপে সর্বেশ্বরবাদকে উপনিষদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গিয়েছিল। এই সর্বেশ্বরবাদ উপনিষদের মধ্যে আরও বিকাশলাভ ক'রে পরিণত রূপটি পেয়েছে। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সর্বেশ্বরবাদই উপনিষদের মূল চিন্তাধারা। বহু ও নানা হতে পরস্পর

সম্পর্কিত বহু ও নানাকে জড়িয়ে নিয়ে এক ব্যাপক একত্বের কথাই উপনিষদের মূল চিন্তাধারা বলে। বহু ও নানাকে বর্জন ক'রে অবিমিশ্র একত্বের প্রতি তা আকৃষ্ট হয় নি। অবিমিশ্র একবাদই হল মায়াবাদ। উপনিষদের পরিবেশ বলে উপনিষদ সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি।

উপনিষদের পরিবেশ তার যে পথে গতির ইঙ্গিত করে, উপনিষদের বচন সামগ্রিকভাবে তারই সমর্থন করে। সকল প্রাচীন উপনিষদের বিভিন্ন বচনে একটি মূল ভাবধারা পাওয়া যায়, যা বলে, ইন্দ্রিয়গোচর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শের এই বিচিত্র জগতই ব্রহ্মের প্রকাশ। এই বচনগুলিতে, ব্রহ্মের এই প্রকাশ যে ভ্রান্ত ধারণা বা অপ্রকৃতরূপ, এরূপ কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উপনিষদের কয়েকটি বাণী এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বচনগুলি পূর্বের এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করলেই চলবে।

ঈশ উপনিষদের প্রারম্ভেই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত জগতকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তনশীল দেখি সবই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম। তা বলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি।" এই যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, স্থিতি এবং বিলয়। বহু ও বিভিন্ন বস্তুর জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুকে জড়িয়ে নিয়ে ব্রহ্মকে পাই। এখানে খণ্ডকে অস্বীকার করা হয় নি, বরং তাকে খণ্ডরূপেই ব্রহ্মের কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

এই বাণীরই প্রতিধ্বনি আরও একাধিক উপনিষদের বচনের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখানে বহুকে বাদ দিয়ে নয়, বহুকে জড়িয়ে, সর্বব্যাপী সত্তারূপেই ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। সব জড়িয়ে, সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন বলেই ত তিনি ব্রহ্ম। তাদের দু একটি বচন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যই বলেছেন,

"এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই বিভিন্ন লোক, এই বিভিন্ন জীব, এই সব কিছুই হল সেই আত্মা।"[১১] বহুর মধ্যে বহুকে জড়িয়ে নিয়েই ত ব্রহ্ম বিদ্যমান। ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বই তাদের একত্ব দান করে।

---

[১১] ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা
ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্মা॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৩॥ ৬

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে এই বলে, "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি সকল ভুবনে প্রবেশ করেছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার।"[১২]

ব্রহ্ম সকল জীবে, সকল উদ্ভিদে, সকল অচেতন পদার্থে বিরাজমান বলেই এখানে ঋষি ক্ষান্ত হন নি, তিনি অতিরিক্ত বলেছেন সকল ভুবনে তিনি প্রবেশ করেছেন।

যে তত্ত্ব বলে যে বিশ্বে বহুকে জড়িয়ে একই সত্তার প্রকাশ, একই মহাসত্তা সকল বস্তু, সকল প্রাণী, সকল লোক ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান, তাকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। কারণ, তা পরমসত্তাকে সকল বস্তুর মধ্যে অপ্রকটরূপে বিরাজমান বলে প্রচার করে। তার অবস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট আকারে কোথাও নাই। সর্বত্র ছড়িয়ে তিনি আছেন। উপরের বচনগুলি এই সর্বেশ্বরবাদের সমর্থন করে। তা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের জগতকে পরমসত্তার সহজ প্রকাশ বলেই গ্রহণ করে, তাকে বিবর্ত্তিত রূপ বলে অস্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটিকে উপনিষদের মূল ভাবধারা বলে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। তাই যদি হয়, তা হলে বলতে হয় উপনিষদের মূল ভাবধারার সঙ্গে মায়াবাদের কোনো সামঞ্জস্য নাই।

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে উপনিষদে একটি চিন্তাধারা আছে যা বলে ব্রহ্মের দুটি রূপ, একটি মূর্ত্ত, অপরটি অমূর্ত্ত, একটি স্থির, অপরটি চঞ্চল, একটি স্থায়ী অপরটি অস্থায়ী। যে রূপ অমূর্ত্ত, স্থায়ী এবং স্থির তাই ব্রহ্মের অবিমিশ্র একরূপ এবং যা মূর্ত্ত, অস্থায়ী এবং চঞ্চল তাই হল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, বহু দ্বারা বিভক্ত দৃশ্যমান জগৎ। এর থেকে এমন অনুমান করা যায় যে যা স্থায়ী সেই রূপটিই ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ, অপরটি নয়। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর গুরুর যিনি গুরু ছিলেন সেই গৌড়পাদ এই পথে অগ্রসর হয়েই মায়া-বাদকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপনিষদের বচনে দেখা যায় যে এই মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দিষ্ট করা হয় নি। তাদের উভয়েরই মর্যাদা সমানভাবে অক্ষুণ্ণ। কাজেই যেটি চঞ্চল রূপ, যেটি অস্থায়ী রূপ, তাকে অস্বীকার করার কোনো আকুতিও তাদের বচনে পাওয়া যায় না।

বরং যা পাওয়া যায় তা বিপরীত কথা। যেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম অবিমিশ্রভাবে এক ছিলেন আদিতে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে ব্রহ্মের সেই দ্বিতীয় বিহীন এককরূপ ভাল লাগে নি, তিনি রস পান নি, তাই নিজের তৃপ্তির জন্য তিনি অবিমিশ্র একত্ব পরিহার ক'রে, দ্বৈতের ভিত্তিতে বহু ও বিচিত্রের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

---

[১২] যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ২॥ ১৭

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের সব থেকে প্রকট রূপটি হল তাঁর আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপটি অমূর্ত নয়, সেটি তাঁর মূর্ত রূপ, তা না হলে তাকে বর্ণনা করা হবে কেন সেখানে, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি" বলে?

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ কথার সমর্থন পাই। সেখানে পরমসত্তাকে রস-স্বরূপ বলা হয়েছে। যা হৃদয়বৃত্তিকে পুষ্টি দেয় তাই হল রস। সেখানে বলা হয়েছে,

"তিনি রসস্বরূপ। তিনি রস অনুভব ক'রে আনন্দ পান।"[১৩]

এখন রস উপলব্ধি হয় কি ক'রে? অবিমিশ্র একত্বের মধ্যে ত রসের উপলব্ধির অবকাশ নেই। রসের ধারা বইতে চাই দুজনকে। দুয়ের জানা-জানি, দুয়ের পরিচয়, দুয়ের পারস্পরিক প্রীতি—এদের অবলম্বন ক'রেই ত রসের ধারা বয়। যেখানে একমাত্র দ্বিতীয় বিহীন সত্তা বর্তমান, সেখানে রস বয় না, সেখানে আনন্দ উপলব্ধির অবকাশ নাই। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই উপনিষদের ঋষি বললেন, ব্রহ্ম একদা সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠরূপে এক ছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি রস পেলেন না। সেই জন্য নিজের প্রকৃতিগত বৃত্তির বিকাশের গরজেই তিনি বহু হলেন। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হয় না যে।

সে কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়রূপে ছিলেন। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"। একমাত্র আত্মাই আগে ছিলেন। কিন্তু একা থাকলে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দরূপ প্রকট হয় না। তাই ঋষি বলেছেন, "স বৈ নৈব রেমে।" একা একা তাঁর ভাল লাগল না। সেই কারণে তিনি দ্বৈতরূপে প্রকাশ নিতে চাইলেন। তাই ঋষি বলেছেন, "স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ"। তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন। তখন তিনি নিজেকে দুই করলেন। তখন জ্ঞাতা এল জ্ঞেয় এল, দ্রষ্টা এল দৃশ্য এল, শ্রোতা এল শ্রোতব্য এল, ঘ্রাতা এল ঘ্রাতব্য এল, এই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে রচিত বিচিত্র বিশ্ব এল।[১৪]

ব্রহ্মের স্বকীয় তৃপ্তির জন্যই এমনটি ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হত না যে। তখনই বিশ্বজুড়ে আনন্দধারা ছড়িয়ে পড়ল। তবেই ত তাঁর 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলে বর্ণনা সার্থক হল।

সুতরাং উপনিষদ যেখানে এককরূপের কথা উল্লেখ করেছে সেখানেও সেই অবিমিশ্র একত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। তা বরং আকৃষ্ট হয়েছে বহু ও বৈচিত্র্য দিয়ে গড়া এই দৃশ্যমান বিশ্বের প্রতি। উপনিষদের ঋষির মনখানিকে যেন ব্রহ্মের মূর্তরূপের মাধুর্য বিশেষ ক'রে আকর্ষণ করেছিল। তা যদি হয়,

---

[১৩] রসো বৈ সঃ॥ রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ বল্লী॥ ৭॥

[১৪] বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায় চতুর্থ প্রপাঠক দ্রষ্টব্য।

তা হলে মায়াবাদের অনুকূল চিন্তাধারার উপনিষদের পরিবেশে বিকাশ লাভ করবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না।

আমরা এখন তৃতীয় প্রশ্নটির জবাব দিতে চেষ্টা করব। প্রশ্ন হল, মায়াবাদের ভিত্তি হল মুক্তিস্পৃহা ও পার্থিব জীবনের প্রতি অবজ্ঞা। উপনিষদের মূল ভাবধারার সহিত কি তার মিল আছে?

মায়াবাদের উৎপত্তি হয়েছিল মাণ্ডুক্য উপনিষদে ব্রহ্মের যে চারটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে। জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে অত্যধিক সাদৃশ্য আছে। অথচ স্বপ্নাবস্থায় মানুষের মন একক বস্তু হলেও দ্বৈতভাব সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগত আমরা দেখি তাও ত অনুরূপ কল্পনার বস্তু হতে পারে। এই ধারণা হতেই মায়াবাদের উৎপত্তি। এ বিষয় পূর্বে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর গৌড়পাদের কারিকাতেই তার প্রথম উল্লেখ পাই। গৌড়পাদের শিষ্য ছিলেন গোবিন্দ এবং গোবিন্দের শিষ্য ছিলেন শঙ্করাচার্য। সুতরাং শিষ্যপরম্পরায় এই ভাবধারা বিকাশলাভ করবে সেটা স্বাভাবিক। মায়াবাদের তাৎপর্য হল বিশ্ব অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সংযোগ স্থাপনই মুক্তির একমাত্র পথ। এই তিন দার্শনিক খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মানুষ। প্রাচীন উপনিষদের যুগের অনেক পরে তাঁরা এসেছিলেন। ষড়দর্শন তখন প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক যুগ তখন প্রবর্তিত হয়েছে।

দার্শনিক চিন্তাধারার এই যুগে মানসিক পরিবেশ ছিল উপনিষদের যুগ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখন কতকগুলি তত্ত্ব অবধারিত সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। তখন ইহ জীবনের প্রতি একটি গভীর অবজ্ঞা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, মানুষের জীবন দুঃখময়, এইরূপ একটা বিষাদের মনোভাব মানুষের মনকে সে যুগে ভারাক্রান্ত করেছে। আবার মৃত্যু হলেই যে শান্তি মিলবে তারও আশা নাই। কারণ, জন্মান্তরবাদ তখন মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাসরূপে পরিণত হয়েছে। জীবনের যন্ত্রণাকে অগ্নিদাহের সহিত তুলনা করা হয়েছে। মৃত্যুতে সে দাহের নিবৃত্তি নেই। কারণ, কর্মফল মানুষকে জন্মান্তরে টানে। সুতরাং মুক্তি বা জন্মান্তর হতে নিবৃত্তিই মানুষের পরমার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। গৌড়পাদ জীবনের যন্ত্রণার অগ্নিদাহকে 'অলাত' বলে বর্ণনা করেছেন। এবং এই 'অলাত-শান্তির' জন্যই মায়াবাদের প্রচার করতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের মন তবু কিন্তু বিষয় ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই তিনি বিধান দিয়েছেন যে মনুষ্য-জীবনের দুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ ক'রে মানুষকে বিষয়ভোগ হতে নিবৃত্ত করতে হবে এবং যা অবিনশ্বর সেই ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাই তিনি বলেছেন,

"সকল দুঃখের কথা স্মরণ ক'রে কামনার ভোগ হতে মানুষকে নিবৃত্ত

করতে হবে। যা জন্মায় না সেই ব্রহ্মের কথা স্মরণ করলে মানুষ যা জন্মায় তা আর লক্ষ্য করে না।"[১৫]

শঙ্করাচার্যের হাতেই মায়াবাদ পরিণত রূপটি লাভ করেছিল। তাঁর ব্রহ্মসূত্রের উপর লিখিত শারীরক ভাষ্য এবং বিভিন্ন উপনিষদের উপর লিখিত স্বতন্ত্র ভাষ্যে তিনি তার পূর্ণ রূপটি দিয়েছিলেন। তাঁরও মানসিক পরিবেশ গৌড়পাদের অনুরূপ ছিল। তার জন্য তাঁর ভাষ্য হতে বচন উধৃত ক'রে সমর্থন খোঁজবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর জনপ্রিয় রচনাই তা জুটিয়ে দেবে। মোহমুদ্গরের সহিত আমরা পরিচিত। তার দুটি পদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"পদ্মপত্রে জল অতি চঞ্চল, জীবনও সেইরূপ চপল। মনে রেখো, সকল মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত, অভিমানগ্রস্ত এবং শোকহত।

ধন জন যৌবনের গর্ব কোরো না, কারণ নিমেষের মধ্যে সে সবই কাল হরণ করে। এই মায়াময় বিশ্বকে ত্যাগ ক'রে জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মের পদ লাভ কর।"[১৬]

এই হল মায়াবাদের পরিবেশ। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপোষক। তা পরজন্মবাদে বিশ্বাসী, তা বলে পার্থিব জীবনে সুখ নাই, তা কষ্টময়। সুতরাং মানুষের পুরুষার্থ হল মুক্তি। এই মুক্তিলাভে সহায়তা করে মায়াবাদ। এ বিষয় গৌড়পাদ এবং শঙ্কর উভয়েই অবহিত ছিলেন। তাই মানব জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগান একটা প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

এই পরিবেশ কিন্তু প্রাচীন উপনিষদের বচনে খুঁজে পাওয়া যায় না। পার্থিব জীবন যে কষ্টের, পার্থিব জীবন যে দুঃখের এ বোধই উপনিষদের যুগে মানুষের মনে জাগে নি। এ বিষয়ে পূর্বের আলোচনা হতেই যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যে দর্শন বলে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রঙ, রসের জগৎ ব্রহ্মের আনন্দরূপের প্রকাশ, তা পার্থিব জীবনকে বিতৃষ্ণার চোখে দেখতে পারে না। যা বলে এই পৃথিবী মধু, তা পৃথিবীতেই এক উল্লসিত জীবনের আস্বাদ পেয়েছিল। সেই জন্যই উপনিষদের ঋষি আকাশে, বাতাসে, ধরণীর ধূলিতে মধুর আস্বাদ পেয়ে পুলকিত হয়েছিলেন। এ পরিবেশে বৈরাগ্যের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

অবশ্য নির্বিচারে ভোগের জীবন উপনিষদে অনুমোদিত হয় নি। সংযম

---

[১৫] দুঃখং সর্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব চ পশ্যতি॥ গৌড়পাদ কারিকা॥ ৩॥ ৪৩

[১৬] নলিনী দলগত জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥
মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং তৎ প্রবিশ বিদিত্বা॥

চাই, ভোগের বস্তুর গুণভেদে পার্থক্য চাই, এ তাঁরা স্বীকার করতেন। যে ধরনের ভোগ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে উপনিষদ সে বিষয়ে সংযমের শিক্ষা দিয়েছে। যে ভোগ ইন্দ্রিয়কে কল্যাণের পথ হতে ভ্রষ্ট করে তার স্বীকৃতি উপনিষদে নেই। যা কল্যাণের পথ তাই হল শ্রেয়। যার প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, অথচ যা কল্যাণ আনে না, তাই হল প্রেয়। উপনিষদ শিক্ষা দেয় প্রেয়ের পথ পরিহার ক'রে শ্রেয়ের পথে ইন্দ্রিয়গ্রামকে চালিত করতে। পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করতে উপনিষদে শিক্ষা দেওয়া হয় না। উপনিষদ ভোগকে ত্যাগ করতে বলে না, সংযমের সহিত ভোগ করতে বলে। এই মনোভাব বৈরাগ্যের অনুকূল মনোভাব হতে পারে না। এই মনোভাবের পার্থিব জীবনের প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণ আছে, বাঁচবার জন্য একটা সুস্থ, দৃপ্ত, উল্লাসবোধ আছে।

অপর পক্ষে উপনিষদের যুগে মুক্তি পুরুষার্থ বলে পরিগণিত হবে কিনা সেটা নির্ভর করে উপনিষদের যুগে পরজন্মবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল কিনা তার ওপর। উপনিষদের বিভিন্ন অংশে পরজন্মবাদ সম্বন্ধে ছড়ান উক্তি কিছু আছে। সেগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে সে যুগে পরজন্মবাদ ঠিক দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। তা যেন ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। এ বিষয় এই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা মানুষের মনকে সাধারণত দেহ হতে পৃথক ক'রে আত্মা বলি। মরণের পর দেহ অক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। মনও কি সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়, না মৃত্যুর পরেও তার স্বতন্ত্র অবস্থায় অস্তিত্ব থাকে? এই প্রশ্ন মানুষের মনে আবহমানকাল উদয় হয়েছে। সাধারণ হিন্দুর মনে বর্তমানে এই প্রশ্ন আর প্রশ্ন আকারে নেই, তা দৃঢ় প্রতীতি বা বিশ্বাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই ধরে নেয় যে মৃত্যুর পর জীবন আছে, পরজন্ম আছে। এই ধারণা সাধারণ মানুষের কেবল অন্ধবিশ্বাস মাত্র নয়, উপনিষদের পরবর্তী কালের সকল ভারতীয় দর্শন পরজন্মকে যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলেই গ্রহণ করেছে। বেদপন্থী ষড়দর্শনের কথা দূরে থাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও এই বিশ্বাসকে দার্শনিক সত্য বলে গ্রহণ করেছে। কেবল একটি মাত্র ভারতীয় দার্শনিক মত তার বিরুদ্ধে মাথা তোলবার সাহস ও স্পর্ধা রেখেছিল। তা হল লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন। তা মৃত্যুর পরে জীবনের সম্ভাবনাকে আদৌ বিশ্বাস করত না, বলত 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' যে দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায় তা আবার ফিরে আসবে কি ক'রে? কিন্তু সেটি ব্যতিক্রম মাত্র। একথা বলা যায় যে উপনিষদের পরের যুগে পরজন্মবাদ একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হল উপনিষদের যুগে কি পরজন্মবাদ সর্বজনসম্মত তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল? আমরা নীচে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

এই বিষয় সম্পর্কে উপনিষদের নানা বিক্ষিপ্ত বচন আলোচনা করলে আমরা দেখি যে মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় এ বিষয় সে যুগে সঠিক কোনো মীমাংসা হয় নি। বিভিন্ন উপনিষদে সে প্রশ্ন উঠেছে এবং বিভিন্নভাবে তার উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে। উপনিষদের যুগে তখনো যে এটি প্রশ্ন আকারে বর্তমান ছিল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল কঠ উপনিষদের নচিকেতার গল্প। সে যুগে যদি পরজন্মবাদ স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে থাকে, তা হলে মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় এ বিষয় নচিকেতা প্রশ্ন তুলবেন কেন? এবং সেই প্রসঙ্গে একথাও বলবেন কেন যে এ বিষয় মানুষের সন্দেহ আছে—কেউ বলে প্রেতের অস্তিত্ব বজায় থাকে, কেউ বলে লোপ পায়। আমরা দেখি পরজন্ম আছে কিনা, তাই এখানে অনুসন্ধানের বিষয় এবং বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে পরজন্মবাদ ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছে।

ঠিক বলতে কি পরজন্মবাদের বীজ বেদের মধ্যেই নিহিত ছিল। যম সেখানে পরলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে আমরা দেখি মৃত্যুর পরেও যে একটি জীবন আছে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি আবছায়া রকমের ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণনা আছে যে শবদাহের পর যেন মানুষের প্রেত যমলোকেতে চলে যায়। সেখানে তার পিতৃপুরুষগণ পূর্বেই গিয়ে অপেক্ষা করছেন। এই সম্পর্কে একটি পদ উধৃত করা যেতে পারে। তা সদ্য মৃত মানুষের উদ্দেশ্যে রচিত। তা এই বলে,

"আমাদের পূর্বপিতৃগণ যে পথে গিয়েছিলেন সেই পূর্বের পথ দিয়ে আপনি অগ্রসর হউন। সেই পথে গিয়ে আপনি দেখবেন দুই রাজা নিজ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন। তাঁরা হলেন যম এবং বরুণ দেব।"[১৭]

এখানে কল্পনা করা হয়েছে যে এই পরলোকে যম এবং বরুণ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। এখানে পিতৃগণ বাস করেন। এখানে প্রেত গিয়ে এক জ্যোতিষ্মান দেহলাভ করে এবং পিতৃগণের সঙ্গে বাস করতে থাকে। এই উক্তিতে ঠিক পরজন্মবাদ পাই না। এখানে এইটুকু পাই যে মৃত্যুর পরেও প্রেতের অস্তিত্ব থাকে এবং তা পিতৃলোকে গিয়ে বাস করে। এই কথাগুলিই বোধ হয় জন্মান্তরবাদের অঙ্কুর।

আমরা উপনিষদে এক ধরনের উক্তি পাই যা মৃত্যুর পর ঠিক কি ঘটে তা বলতে পারে না। কেবল এইটুকু দেখা যায় যে একটি বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে

[১৭] প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা
যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১০॥১৪॥৭

যে মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় না, মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। কঠ উপনিষদে এই ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। আমরা জানি যে কঠ উপনিষদের আরম্ভই হল মৃত্যুর পর প্রেতের কি অবস্থা হয় তাই নিয়ে। আমরা জানি যে এ বিষয় শেষ পর্যন্ত যম উত্তর দিতেও সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু যম কি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ঠিক ধরা যায় না। যম নানা বিষয় সম্পর্কে বলেছেন যার সঙ্গে প্রেতের কোনো সম্পর্ক নাই। ঠিক বলতে গেলে প্রেতের অস্তিত্বের আলোচনাটা পিছিয়ে পড়ে গিয়েছিল এবং অন্য বিষয় মুখ্য আলোচনার স্থান অধিকার করেছিল। এখানে ব্রহ্মের কথা আছে, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কোনো সত্তা নাই তাও আছে। কিন্তু প্রেতের কি হয় সে বিষয় সোজা কোনো উত্তর নাই। তবে আত্মা যে শরীর নষ্ট হলেও নষ্ট হয় না এই ধরনের উক্তি আছে। উক্তিটি এই,

"ইনি জন্মান না, ইনি নিত্য, ইনি শাশ্বত, ইনি অতি প্রাচীন, শরীর নষ্ট হলে ইনি নষ্ট হন না।"[১৮]

এই বচনটি কিন্তু গীতায়ও পাওয়া যায়। কারও কারও মতে এ বচনটি গীতা হতে এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। সে যাই হক, এই বচনটি যে প্রেত সম্বন্ধেই বিশেষ উক্তি তাতেও সন্দেহ আসে। এখানে যেন ব্রহ্মের কথাই বলা হয়েছে এমনও ব্যাখ্যা করা যায়। তা না হলে অজ, নিত্য, শাশ্বত এই বিশেষণগুলি এখানে এত জোরের সঙ্গে প্রয়োগ হবে কেন?

মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কটা যে বিশেষ ক'রে দেহের, কিন্তু দেহীর বা আত্মার নয়, এই ধরনের একটি উক্তি আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই। তার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্বেতকেতু এবং তাঁর পিতা আরুণির গল্পের সহিত আমরা ইতিপূর্বে পরিচিত হয়েছি। আরুণি সেখানে বলেছেন যে দেহ যখন মরে যায় তখন জীব মরে না, জীবের সঙ্গে দেহের বিচ্ছেদ ঘটে বলেই দেহের মৃত্যু ঘটে। তিনি বলেছেন, একটি ন্যগ্রোধ গাছের শাখাকে যখন জীব ত্যাগ করে তখন তা শুষ্ক হয়, যখন দ্বিতীয় শাখাকে ত্যাগ করে তখন তা শুষ্ক হয় এবং যখন সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করে তখন বৃক্ষটি শুকিয়ে যায়। "জীব হতে বিচ্ছিন্ন হয় বলেই তার মৃত্যু ঘটে, জীবের মৃত্যু ঘটে না।"[১৯]

মৃত্যুর পরে জীবন থাকে কিন্তু পরজন্ম আছে কিনা, সে বিষয় কিছু নিশ্চিত মীমাংসা হয় নি এই ধরনের একটি মত বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে পাই। সে বর্ণনাটি এইরূপ :

"যখন কোনো মানুষ এইলোক হতে চলে যায় সে বায়ুতে যায়। তখন

---

[১৮] অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ কঠ॥ ২॥ ১৮

[১৯] জীবাবপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে
ন জীবো ম্রিয়তে॥ ছান্দোগ্য॥ ৬॥ ১১॥ ৩

রথচক্রের মাঝখানে যেমন থাকে, বায়ু তার দেহে তেমন ছিদ্র ক'রে দেয়। তখন সেই প্রেত সেই ছিদ্র পথে উপরে উঠে যায় এবং আদিত্যের নিকট পৌঁছায়। তখন লম্বরের (বাদ্যযন্ত্র) দেহে যেরূপ ছিদ্র থাকে, আদিত্য নিজ দেহে সেইরকম ছিদ্র ক'রে দেয়। সেই ছিদ্র পথে সে উপরে উঠে গিয়ে চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়। তখন দুন্দুভির গায়ে যেমন ছিদ্র থাকে, চন্দ্র তার দেহে সেইরূপ ছিদ্র ধারণ করে। সেই পথে সে ঊর্ধ্বে গমন করে। এক শোকবিহীন অশীতল-লোকে উপস্থিত হয়ে সেখানে সে শাশ্বতকাল বাস করে।"[২০]

এর পর আমরা এক ধরনের মত পাই যা বলে যে মৃত্যুর পর প্রেতের বিনাশ হয় না, তার অস্তিত্ব থাকে এবং আরও বলে যে তার অতীতের কাজের ওপর তার ভবিষ্যতের অবস্থা নির্ভর করে। এই উক্তির বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ তাই যেন সর্বপ্রথম কর্মফলের ইঙ্গিত করে। সে উক্তিটি পাই আমরা ঈশ উপনিষদে। সেখানে আত্মহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং সেই সম্পর্কে এই বলে শাসন করা হয়েছে যে যারা আত্মহত্যা করে তারা এক আনন্দ-হীন লোকে যায়। উক্তিটি এইরূপ :

"অন্ধকরা অন্ধকারে আবৃত একটি লোক আছে। তার নাম অনন্দলোক। যারা আত্মহত্যা করে, তারা মৃত্যুর পর সেই লোকে যায়।"[২১]

এই ধরনের আরও বচন বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এখানে মৃত্যু জীবনে যবনিকা টেনে দেয় না, এই ধরনের একটা বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে দেখা যায়। সেই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে বিভিন্ন মানুষের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ভাবী জীবনে বিভিন্ন ব্যবস্থা হয়েছে। তার তাৎপর্য হল পরলোকে কর্মফলের প্রভাব আছে এই ধরনের একটি মত যেন ক্রমশ গড়ে উঠেছে। এই বর্ণনায় অবশ্য কল্পনার অবাধ লীলা দেখা যাবে কিন্তু তা সত্ত্বেও পরজন্মে কর্মফলের প্রভাবের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। বর্ণনাটি এইরূপ :

মানুষ মরলে এবং তার মৃতদেহের সৎকার হয়ে গেলে বিভিন্ন মানুষের ভাগ্যে পরলোকে বিভিন্ন ফল ঘটে। যাঁরা অরণ্যে বাস ক'রে সত্যানুসন্ধান করেন, তাঁরা প্রথমে সূর্যের কিরণে পরিণত হন, কিরণ হতে পরে দিবসে পরিণত হন, দিবস হতে শুক্ল পক্ষে পরিণত হন। এই শুক্ল পক্ষ হতে তাঁরা উত্তরায়ণে পরিণত হন, উত্তরায়ণ হতে তাঁরা দেবলোকে যান, দেবলোক হতে আদিত্যে যান, আদিত্য হতে বিদ্যুতে যান এবং সেখান হতে ব্রহ্মলোকে গিয়ে চিরকালের জন্য বাস করেন। অপরপক্ষে যাঁরা কর্মমার্গ অবলম্বন করেন

[২০] স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্
বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৫ ॥ ৩ ॥ ১০

[২১] অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ॥
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ঈশ ॥ ৩

তাঁদের পথ স্বতন্ত্র। তাঁরা প্রথমে ধূমে পরিণত হন, তারপর ধূম হতে রাত্রিতে, রাত্রি হতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হতে দক্ষিণায়নে। সেখান হতে তাঁরা যান পিতৃলোকে, পিতৃলোক হতে তাঁরা যান চন্দ্রে। সেখানে তাঁরা পুণ্যের পরিমাপ অনুসারে সুখ ভোগ করেন; তারপর পুণ্যের ক্ষয় হয়ে গেলে পর তাঁরা আকাশে নিক্ষিপ্ত হন। আকাশ হতে তাঁরা বায়ুতে পরিণত হন, বায়ু হতে বৃষ্টিতে এবং বৃষ্টি হতে পৃথিবীতে। পৃথিবীতে এসে তাঁরা অন্নে পরিণত হন, তারপর পুরুষে সংক্রামিত হন ও নারীতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ চন্দ্রলোকে পুণ্যফল ভোগ করার পর তাঁদের আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়।[২২] সুতরাং এখানে একরকম স্বীকার করা হয়েছে যে ভাবী জীবন কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এখানে কোন কর্মফলবাদের অঙ্কুরটিকে পাওয়া যায়।

কল্পনায় নানাভাবে রঙিন হয়ে থাকলেও এই কথাগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। মোটামুটি উপরে উদ্ধৃত বচনগুলির মধ্যে দুটি লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। প্রথম আমরা দেখি যে পুনর্জন্ম এখানে একরকম স্বীকার করা হয়ে গেছে, অন্তত যাঁরা কর্মমার্গ অবলম্বন করেন তাঁদের জন্য। দ্বিতীয়ত আমরা দেখি যে কর্মফলও মূলত স্বীকার করা হয়েছে। যাঁরা সৎকর্ম ক'রে পুণ্যসঞ্চয় করেন, তাঁরা পুরস্কারস্বরূপ চন্দ্রলোকে বাস করবার অধিকার পান। কিন্তু সেই চন্দ্রলোকে সুখভোগের দীর্ঘতা নির্ভর করে সঞ্চিত পুণ্যের পরিমাপের দ্বারা। কর্মফল ও পরজন্মবাদের ইতিহাসে সুতরাং এই স্বীকৃতি একটি লক্ষণীয় পদক্ষেপ। বেদের এবং উপনিষদের যুগে আমরা এইরূপ পরজন্ম সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যবিহীন চিন্তা পাই। তারপর বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত বচনে যে মতটি প্রকাশ হয়েছে তা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতির পক্ষে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে বলতে হবে। শুধু তাই নয়, এখানে কর্মফল ও পরজন্মবাদ সম্বন্ধে ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে এখানেও কর্মফল ও পরজন্মবাদ সম্বন্ধে ধারণা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। এটি যেন উপনিষদের যুগের প্রথম অবস্থার মত এবং পরবর্তীকালের পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত মতের মাঝামাঝি অবস্থা। এখানে পরজন্ম স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু আংশিকভাবে। তার পূর্ণরূপটি এখানে পাই না। অপর পক্ষে কর্মফল দ্বারা যে পরজন্ম এরকম নিয়ন্ত্রিত হয়, মূলত সে নীতিও স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু এখানেও এই নীতির পূর্ণরূপটি আমরা পাই না।

এর পরে আমরা কতকগুলি বচন পাই যাতে দেখা যায় যে কর্মফল ও পরজন্মবাদ আরও পরিণতি লাভ করেছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ রূপটি পেয়েছে।

---

[২২] বৃহদারণ্যক॥ ৬॥ ২॥ ১৩—১৬॥ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের কয়েকটি উক্তি এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

"মানুষ পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্যজীবন লাভ করে এবং পাপ কর্মের দ্বারা পাপময় জীবন লাভ করে।"[২৩]

এ উক্তিতে পরজন্ম স্বীকৃত হয়েছে এবং পরবর্তী জন্মে অন্তরিত আত্মার কি অবস্থা হবে তাও যে কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাও স্বীকৃত হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের আরও একটি উক্তি পাওয়া যায় যার তাৎপর্য আরও সুদূর-প্রসারী। কর্মফলে ভাবী পরজন্মের অবস্থা কিরূপ হবে, নির্ভর করে, একথা সেখানে বলা হয়েছে। পরজন্ম খন্ডনের উপায় সম্বন্ধে এখানে আরও অতিরিক্ত কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে মানুষ তাঁর মনের সকল কামনা জয় করতে পেরেছেন তাঁর আর জন্মান্তর ঘটে না, তিনি ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান। কথাটি এই :

"যখন মানুষ মনের যা কিছু কামনা আছে তাদের ত্যাগ করে, তখন মর্ত্য-মানুষ অমৃত হয়, সে ব্রহ্মকে লাভ করে। যেমন সর্পের পরিত্যক্ত খোলস বল্মীকে মৃত হয়ে পড়ে থাকে তেমন তার শরীর শুয়ে থাকে, কিন্তু অশরীরী অমৃত যে প্রাণ তা তেজঃ স্বরূপ।"[২৪]

মুন্ডক উপনিষদে এই উক্তিটির আমরা একরকম সমর্থন পাই। সেখানেও পরজন্মবাদ ও কর্মফল সংক্রান্ত মূলনীতির স্বীকৃতি আছে। সেখানেও পরজন্ম নিরোধ করবার কথার উল্লেখ আছে এবং কোন্ পথে তা সম্ভব সে বিষয়েও উল্লেখ আছে। কামনা হেতুই পরজন্ম হয় এবং কামনা জয় করতে পারলে পরজন্ম খন্ডন হয় এই ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। উক্তিটি এইরূপ :

"যে কামনাকে মনে স্থান দিয়ে পূরণ করতে চায় সে নিজের কামনা অনুসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যার সব কামনা পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে তার কামনা সকল এইখানেই বিলয় প্রাপ্ত হয়।"[২৫]

এখানে মূলত পরজন্মবাদ স্বীকার হয়ে থাকলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের পূর্বের উক্তির সঙ্গে একটু যেন অসামঞ্জস্য এসে পড়ে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচন অনুসারে পরজন্মের অবস্থা কিরূপ হবে, তা নির্ভর করে

---

[২৩] পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি
পাপঃ পাপনেতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৩॥ ২॥ ১৩

[২৪] যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ॥
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি তত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইতি॥
তদ্ যথা অহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত
এবমেবেদং শরীরং শেতে অথায়মশরীরোঽমৃতঃ
প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ৪॥ ৮

[২৫] কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে যত্র তত্র॥
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তে কামাঃ॥ মুন্ডক॥ ৩॥ ২॥ ২

পূর্বজন্মের কর্মফলের ওপর। এখানে বলা হয়েছে মানুষের মনের ইচ্ছাই যেন পরজন্মের অবস্থা কেমন হবে তা ঠিক ক'রে দেয়। এই অসামঞ্জস্যের একটা তাৎপর্য আছে। তা দেখিয়ে দেয় যে উপনিষদের শেষের যুগেও কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ তার পরিপূর্ণরূপটি পায়নি, যদিও তার মূলনীতিটি একরকম স্বীকৃত হয়ে গেছে।

উপরের আলোচনা হতে আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। প্রশ্ন ছিল মুক্তিস্পৃহা উপনিষদের যুগে পুরুষার্থরূপে দেখা দিয়েছিল কিনা। সেটা নির্ভর করে পরজন্মবাদ ও কর্মফলবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, তার ওপর। ওপরের আলোচনায় দেখা যায় যে উপনিষদের যুগে এই যুগ্ম নীতির পরিপূর্ণ স্বীকৃতি নেই। উপনিষদের বিভিন্ন বচনে যা পাই, তা হতে দেখা যায় যে পরজন্মবাদ সেখানে অংকুর অবস্থা হতে ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। উপনিষদের শেষের যুগেও তা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি। ষড়দর্শনের যুগে যা ছিল দৃঢ়বিশ্বাসের বস্তু তা সেখানে বিভিন্ন ধরনের কল্পনার বস্তু। সেখানে এই যুগ্ম তত্ত্বকে হয় অংকুরে পাই, না হয় অপরিণত অবস্থায় পাই। কর্মফলবাদই যদি ভালরকম প্রতিষ্ঠালাভ না ক'রে থাকে, তা হলে মুক্তিস্পৃহার প্রশ্ন ওঠে না। মুক্তিস্পৃহা উপনিষদের যুগে মানুষের মনে আত্মপ্রকাশ করেনি।

এখন আমাদের উত্তর দিতে হবে একটি মূল প্রশ্নের। তা হল সামগ্রিকভাবে উপনিষদের বচনে মায়াবাদের সমর্থন আছে কিনা। এই সম্পর্কে আমরা কয়েকটি আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম। সে উত্তর উপরের আলোচনায় মিলবে। এখানে তার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি উপনিষদগুলির যে পরিবেশে জন্ম তার সহিত মায়াবাদের সামঞ্জস্য নেই। সে পরিবেশে তার স্বাভাবিক ঝোঁক হওয়া উচিত সর্বেশ্বরবাদের প্রতি। দ্বিতীয়ত, উপনিষদের মূল ভাবধারা হল সর্বেশ্বরবাদ। তার সহিত মায়াবাদের সঙ্গতি নেই। তা বহুর মধ্যেই ব্রহ্মের অরূপ প্রকাশ দেখে, তা ব্রহ্মের উপর অবিমিশ্র একত্ব আরোপ করে না। তৃতীয়ত, মায়াবাদের মূল ভিত্তি হল মুক্তিস্পৃহা। তা আবার প্রতিষ্ঠিত পরজন্ম ও কর্মফলবাদের উপর। জীবন দুঃখময়, কষ্টময়, অগ্নিদাহের মত অসহনীয়; এক জন্ম গেলে আবার জন্ম আসে; সুতরাং পরিত্রাণের উপায় হল মায়াময় বিশ্ব ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মের অবিমিশ্র একত্ব উপলব্ধি করা। কিন্তু দেখা গেছে যে কর্মফলবাদ বা পরজন্মবাদ উপনিষদে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাজেই মুক্তিস্পৃহা উপনিষদের যুগের মানুষকে আকৃষ্ট করেনি। এই পৃথিবীর জীবনকেই উপনিষদের যুগের মানুষ মধুময় বলে অভিনন্দিত করতে অভ্যস্ত। এই যুক্তিগুলি ব'লে সামগ্রিকভাবে উপনিষদের বচনে মায়াবাদের সমর্থন নাই।

সুতরাং, যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল তা এবার সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। উপনিষদে এমন কতকগুলি বচন আছে যা শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত মায়াবাদকে সমর্থন করে। অপর পক্ষে, উপনিষদ যে পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছে এবং উপনিষদের ক্রমবিকাশের গতি যে পথে তা ব'লে উপনিষদের বচনে যে মূল ভাবধারা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মায়াবাদের সঙ্গতি নেই। সেই মূল ভাবধারা হল সর্বেশ্বরবাদ, তা বহুকে জড়িয়ে নিয়ে পরম সত্তার একত্ব প্রচার করে। অপর পক্ষে, শঙ্করের মায়াবাদ অবিমিশ্র একত্ববাদের পক্ষপাতী। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয়, এই সিদ্ধান্তই যেন যুক্তিসঙ্গত যে মায়াবাদের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু উপনিষদ বরমাল্য দিয়েছে সর্বেশ্বরবাদের গলায়।

এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের মন্তব্যই যেন সমর্থিত হয়। চৈতন্য চরিতামৃতের সপ্তম পরিচ্ছেদে তাঁর সহিত বেদান্তবাদের সমর্থকদের বিতর্কের এক বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেখানেও তিনি প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন যে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে উপনিষদে মায়াবাদের সমর্থন নাই। এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি সংক্ষেপে যা যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা সেখানে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যা বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণা বৃত্তে যে বা ব্যাখ্যা করিলা আচার্য্য।"[২৬]

ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের সংকলন গ্রন্থ। তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে হবে উপনিষদের বচনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। শুধু তাই নয়, বেদান্ত দর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে আরও একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উপনিষদে যে চিন্তাধারা মুখ্যস্থানীয়, যে ভাবধারা মূল স্থান অধিকার ক'রে আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতেই ব্যাখ্যা সঠিক হবে, তার উৎকর্ষ বাড়বে। অপর পক্ষে গৌণ ভাবধারাই যদি ব্যাখ্যার মূল অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে ব্যাখ্যা সঠিক হবে না। এই হল মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের মত। তাই তিনি খেদ ক'রে বলেছেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে শঙ্করাচার্য,

"গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।"

তিনটি মূল তত্ত্ব নিয়ে শঙ্করের মায়াবাদ। প্রথম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব অলীক, তা সত্য নয়, তা মায়া। দ্বিতীয়, ব্রহ্ম অবিমিশ্রভাবে এক। তাঁর মধ্যে বহুর কোনো স্থান নেই। তৃতীয়, এই একমাত্র এবং দ্বিতীয়বিহীন ব্রহ্ম চিন্ময়, তাঁর জ্ঞাতৃরূপ কখনো লোপ পায় না। উপনিষদের যে অংশ শঙ্কর ও গৌড়পাদকে মায়াবাদ সম্বন্ধে মূল প্রেরণা যুগিয়েছিল তা হল মাণ্ডুক্য উপনিষদের উক্তি। সেখানে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে মানুষের জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্ত

---

[২৬] চৈতন্য চরিতামৃত, সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবস্থার বর্ণনা আছে। জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা—উভয় ক্ষেত্রেই দ্বৈতবোধ প্রকটরূপে বিদ্যমান। অথচ দেখা যায়, স্বপ্নাবস্থায় যে বহু ও নানার জগত মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তার কোনো সত্তা নাই, তা অলীক। তা হলে জাগ্রত অবস্থায় যে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ দেখি তারও ভিত্তি না থাকতে পারে। এইরূপ একটি ইঙ্গিত হতেই মায়াবাদের উৎপত্তি।

এই মান্ডুক্য উপনিষদেই কিন্তু ব্রহ্মের চতুর্থ অবস্থার অর্থাৎ দ্বৈতবোধবিহীন একক অবস্থার যা বর্ণনা পাই তাতে মায়াবাদের তৃতীয় মূলনীতিটি স্বীকৃত হয়নি। মায়াবাদের তৃতীয় তত্ত্ব হল একক অবস্থায় ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপ সর্বক্ষণ বর্তমান থাকে। কিন্তু মান্ডুক্য উপনিষদ ব্রহ্মের এই অবস্থার যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে তা স্বীকৃত হয়নি। মান্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে তিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, লক্ষণহীন, অচিন্ত্য, অবর্ণনীয় এবং দ্বৈতহীন। এটি হল ব্রহ্মের অমূর্ত অবস্থার বর্ণনা। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে এই,

"তিনি অন্তর সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, বাহির সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, অন্তর ও বাহির উভয় সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, তিনি প্রজ্ঞানঘন নয়, জ্ঞানযুক্ত নয়, জ্ঞানক্ষমতাহীন নয়।"[২৭]

এই বর্ণনা মতে তিনি এই অবস্থায় জ্ঞাতাও নন, জ্ঞানক্ষমতাহীনও নন। এখানে অমূর্ত অবস্থায় ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপের স্বীকৃতি পাই না। সম্ভবত এ বিষয় শঙ্করাচার্য যাজ্ঞবল্ক্যের মতের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

---

[২৭] নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্॥ মান্ডুক্য॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেয় বনাম প্রেয়

[নৈতিক সমস্যা—ভোগ বনাম ত্যাগ, স্বার্থ বনাম পরার্থ। উপনিষদে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ—ব্রহ্মচর্য আশ্রমে নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা, অনবদ্য কর্মের ব্যাখ্যা, প্রজাপতি ও তাঁর শিষ্যদের গল্প। শ্রেয় ও প্রেয়—ভোগে আপত্তি নাই, যে ভোগে বেশী সুখ তাই কাম্য, নাল্পে সুখমস্তি। মানসিক ভোগের উপর পক্ষপাত—সন্ন্যাসের অপ্রয়োজনীয়তা, রবীন্দ্রনাথের মতের সহিত তুলনা। শ্রেয় হল, মনকে প্রাধান্য দিয়ে, পরার্থ হানি না ক'রে ভোগ। ব্রহ্মবিহার। আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা—আত্মা ও রথী, ইন্দ্রিয় ও অশ্ব, দেহরথ নিয়ন্ত্রণের কৌশল।]

মানুষের মন অহোরাত্র কোনো কাজে নিযুক্ত থাকে। এক স্বপ্নহীন ঘুম ব্যতীত তা কাজ হতে বিরত থাকে না। হয় সে দেখে শোনে জানে, না হয় সে সুখ দুঃখ, প্রীতি বিদ্বেষ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি অনুভব করে, না হয় সে কোনো কর্মে লিপ্ত থাকে। প্রথমটি তার জ্ঞানের কর্ম, দ্বিতীয়টি তার অনুভূতির কর্ম এবং তৃতীয়টি তার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত কর্ম। মানুষের মন কখনো শূন্য থাকে না। তা কখনো জানে, কখনো অনুভব করে, কখনো কাজ করে। তার মনটি যেন একটি প্রবাহিণী। তার মধ্যে স্রোত সর্বক্ষণ প্রবাহিত। সে স্রোতের যেন তিনটি ধারা। একটি জ্ঞান কর্মের ধারা, একটি অনুভূতি কর্মের ধারা আর একটি ইচ্ছাধীন কর্মের ধারা। সেখানে যেন অহোরাত্র ত্রিবেণী সঙ্গমের ধারা চলেছে।

মানুষ যেখানে কাজ করে সেখানে তার কর্ম ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত। মনের যে দিকটা ইচ্ছাশক্তিদ্বারা কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার সঙ্গে এটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এমন কর্মও আছে যা ইচ্ছাধীন নয়। যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা, চোখে কিছু পড়লে চোখ বুজিয়ে ফেলা, ভয় পেলে চমকে ওঠা। এগুলি বৃত্তিনিয়ন্ত্রিত কর্ম। এই কর্মগুলি আপনা হতেই সম্পাদিত হয়। এদের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। এই শ্রেণীর কর্মের সঙ্গে নীতির কোনো সম্পর্ক নাই।

নীতির সংযোগ সেই শ্রেণীর কর্মের সঙ্গে যা আমাদের ইচ্ছাধীন। তার বিশেষ লক্ষণ হল বিভিন্ন বিকল্প কর্মের মধ্যে এখানে একটিকে বেছে নেওয়া যায়। এখানে একাধিক বিকল্প কর্ম সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও মন তাদের একটিকে নির্বাচন ক'রে তারপর সম্পাদন করে। আজ বিকালে আমি ইচ্ছা করলে বেড়াতে যেতে পারি বা অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যেতে পারি বা বাড়িতে আমার পীড়িত আত্মীয় রয়েছে তার ঔষধ কেনবার জন্য ডাক্তারখানায় যেতে পারি। আমি যদি আত্মীয়ের সেবাকে সব থেকে বেশী প্রয়োজনীয় বোধ করি, আমি

বেড়াতে বা বন্ধুর বাড়িতে না গিয়ে ডাক্তারখানায় যাব। এখানে কোনো বিশেষ কর্ম করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন। এইরূপ ইচ্ছাধীন কর্মগুলিই নীতি-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

প্রতি মানুষের জীবনে প্রতিটি দিন এই ধরনের ইচ্ছাধীন কর্ম দিয়ে ভরা। প্রতিদিনই প্রতি মানুষকে অনেকবার ঠিক করতে হয়, নানা বিকল্প কর্মের মধ্যে কোন্ কর্মটিকে সে সম্পাদন করবে। এই সমস্যা সমাধানে সাহায্যের জন্য নীতিশাস্ত্র মানুষের কাছে একটা আদর্শ স্থাপন করতে চেষ্টা করে। জীবনের একটি আদর্শ নির্দেশ ক'রে দিতে পারলে অনেক সুবিধা হয়। সেই আদর্শকে লক্ষ্য বস্তু হিসাবে সামনে রাখলে, কোন্ কর্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম করা উচিত নয়, সেটা ঠিক করা সহজ হয়ে পড়ে। আমি যদি কোনো বিশেষ গন্তব্য স্থান ঠিক না ক'রে পথ চলতে সুরু করি, আমার কাছে সব পথই সমান হবে। ডাইনে পথ পেলে তাতে যেতে পারি, বাঁয়ে পথ পেলে তাতে যেতে পারি। কিন্তু আমি যখন একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান ঠিক ক'রে বাইরে যাই, তখন প্রতি বিকল্প পথের ক্ষেত্রে আমি সেই পথটা বেছে নেব যা আমাকে গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জীবনের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করলে তাও এইভাবে কর্তব্য কর্ম নির্বাচনে সাহায্য করে। এইরূপ নৈতিক আদর্শকে বলা হয়ে থাকে পুরুষার্থ।

সুতরাং মানুষের পুরুষার্থ কি সেইটিই হল নীতিশাস্ত্রের প্রধান সমস্যা। বিভিন্ন নৈতিক মত বিভিন্ন আদর্শকে পুরুষার্থ বলে স্থাপন করেছে। মানুষের স্বভাব এবং মানুষের প্রবৃত্তির বিভিন্ন দিককে ভিত্তি ক'রে এই বিভিন্ন আদর্শগুলির উৎপত্তি। মতের বিভিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

মানুষের দুটি দিক আছে। সে একাধারে দেহও বটে আবার মনও বটে। তার দেহের ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবত বিষয়ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার মন দেহ হতে নিজেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত মনে করে। দেহ সুখ চায়, দেহ ভোগ করতে উন্মুখ হয়। মন তাকে নিষেধ করে। মন বলে ইন্দ্রিয়সুখ নিকৃষ্ট জিনিস। অপর জীব হতে মানুষের বৈশিষ্ট্য তার মানসিক উৎকর্ষের হেতু। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়সুখ আপাতদৃষ্টিতে লোভনীয় হলেও পরিণতিতে তা আনে অশান্তি। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে মানসিক শান্তিলাভ করা বিশেষ কাম্য। ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষের পুরুষার্থ হওয়া উচিত নয়, মানুষের মহত্ত্ব ত্যাগে। এইভাবে ত্যাগের আদর্শ ও ভোগের আদর্শের একটি দ্বন্দ্ব এসে পড়ে।

যিনি ভোগপন্থী নীতিকার তিনি সাধারণত বলেন মানুষের ভবিষ্যৎ কি তা জানা নেই, মনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে কি হবে জানা নেই, স্থূল চোখে যেটি সোজা দেখি ও বোধগম্য হয়, সেটি হল এই যে বিষয়ভোগে

নিজের সুখ, নিজের ভোগ, নিজের নিরাপত্তা, এইগুলির প্রতিই মানুষবিশেষের সাধারণত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অপর পক্ষে মানুষ একা বাস করে না। তার পরিবার আছে, তার সমাজ আছে, তার দেশ আছে। পরের হিতের জন্যও তার কাজ করতে হয়। এ শুধু তার কর্তব্য নয়, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক বৃত্তি তাকে এই পথে পরিচালিত করে। মা সন্তানের জন্য কি না করতে পারেন? স্বাভাবিক বৃত্তি পরিচালিত হয়ে আমরা যেমন নিজের স্বার্থ খুঁজি, ঠিক সেইরূপ স্বাভাবিক বৃত্তিবশেই মা সন্তানের স্বার্থ খোঁজেন। কর্তব্য পালনের এখানে ঠিক প্রশ্ন ওঠে না।

সুতরাং আমাদের জীবনের সহিত নৈতিক সমস্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উপনিষদের যুগে মানুষ তাই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল। বর্তমান কালে মটর গাড়ির মত একটি যন্ত্র চালাবার অধিকার পেতে হলে রীতিমত শিক্ষা ও চর্চা ক'রে পরীক্ষা দিয়ে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। সমাজের কল্যাণের জন্য এইরূপ সতর্কতার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। মটর গাড়ি চালান একটা গুরুতর দায়িত্ব। মানুষের দেহ ও মন নিয়ে যে বস্তুটি গঠিত তাও এক ধরনের যন্ত্র। মটর গাড়ির সহিত তুলনায় তা অত্যন্ত জটিল। তার কর্ম করবার ক্ষেত্র বহু প্রশস্ত, তার কর্ম করবার রীতির কোনো দিশা পাওয়া যায় না। সাংসারিক জীবনে অহরহ প্রতিটি মানুষকে এই দেহ-মনরূপ যন্ত্রটিকে পরিচালিত করতে হয়। তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার জীবনের এই পথটিকে আরও বন্ধুর, আরও জটিল ক'রে তুলেছে। অথচ তাকে পরিচালনার জন্য কোনো লাইসেন্সের ব্যবস্থা দেখি না। লাইসেন্স কে দেবে? নাই দিক, মানুষকে সমাজে বাস করবার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেহ-মনকে পরিচালিত করা যায় কিরূপে, তাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি কৌশলে, তার কোনো ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দেখতে পাই না। উপনিষদের যুগে কিন্তু শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নীতিশিক্ষার একটা ব্যবস্থা ছিল।

এই ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হবার পূর্বে আমাদের সে কালের সমাজ-বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক কথা জানা প্রয়োজন।

সেকালে মানুষের সমগ্র জীবনটিকে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া হত। এক একটি ভাগকে আশ্রম বলা হত। এই প্রতিটি আশ্রমের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল বিভিন্ন। জীবনের প্রথম অংশকে বলা হত ব্রহ্মচর্য আশ্রম। আমাদের কালে এটিকে ছাত্রাবস্থা বলা যেতে পারে। তার পরের ভাগটিকে বলা হত গার্হস্থ্য আশ্রম। এই আশ্রমে মানুষ শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ ক'রে গৃহী হত। তার পরের ভাগটিকে বাণপ্রস্থ আশ্রম বলা হত। এই আশ্রমে মানুষ সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বনে গিয়ে বাস করত। জীবনের শেষ

সুখ আছে। অতএব তার গলায় বরমাল্য দাও। আমাদের দেশে সে কালে চার্বাক দর্শন এই কথাই বলত। তার আদর্শ হল, "যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে" এমন কি প্রয়োজন হলে "ঋণ ক'রেও ঘৃত পান করবে।"[১] তার সপক্ষে যুক্তি অতি সুস্পষ্ট। ঋণ ক'রে পরিশোধ করতে না পারলেই বা কি এসে যায়? "যে দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায় তা কি আর ফিরে আসতে পারে?"[২] ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই যেন এই ধরনের নৈতিক মতের মূল প্রেরণা। প্রসিদ্ধ পারসিক কবি ওমর খৈয়মও এই ধরনের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতেও নগদ যেটা পাওয়া যায় সেটা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অনিশ্চিত ভাবী লাভের আশায় তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। নগদ যা পাওয়া যায় তা হল ইন্দ্রিয়সুখ, সুতরাং তাতেই নিজেকে নিমজ্জিত কর। প্রাচীন গ্রীসে সিরিনেইক সম্প্রদায়ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। বর্তমান ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না বা বুঝি না। কাজেই জীবনের প্রতি মুহূর্তটি বিষয়-ভোগে যাপিত করাই তাঁদের মতে বুদ্ধিমানের কাজ। এই হল তাঁদের নৈতিক আদর্শ।[৩]

অপর পক্ষে ত্যাগপন্থী নীতিবিদ দেখেন ভোগে মানুষ শান্তি পায় না। বিষয় ভোগের স্পৃহা তাতে আরও পরিবর্ধিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত, কামনা চরিতার্থ করলে, কামনা আরও পরিবর্ধিত হয়।[৪] মানুষ তখন কামনার দাস হয়ে পড়ে। সে মনের শান্তি হারায়। ফলে জীবন তার দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। মন হল মানুষের একান্ত নিজস্ব জিনিস। বিষয়গুলির ওপর মানুষের আধিপত্য নেই, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন' শান্তির ও স্বস্তির পথের নির্দেশ দেয়। আমাদের দেশের যোগপন্থী বা ত্যাগপন্থী নীতিকারগণ এই আদর্শ প্রচার করেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এদের আদর্শ হল, "জগৎ ত্যাগ ক'রে সুখী হও।"[৫] প্রাচীন গ্রীস দেশে সিনিক সম্প্রদায় এই আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়ের প্রতি স্পৃহাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে আমরা যত আত্মনির্ভরশীল হতে পারব, ততই মানসিক শান্তি আমাদের আরও হবে। এই ছিল তাঁদের মত।

দেহ ও মনের ভিত্তিতে যেমন ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্ব হয়, তেমন মানুষের স্বার্থ ও পরার্থের সংঘর্ষে নীতির ক্ষেত্রে আরও একটি দ্বন্দ্ব বর্তমান আছে। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থান্বেষী। নিজের মত সে কাউকে ভালবাসে না।

---

[১] যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ॥

[২] ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

[৩] Seth, Ethical Principles, P. 84.

[৪] ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ বিষ্ণুপুরাণ

[৫] জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ মহ উপনিষদ॥ ৪৮

অধ্যায়টিকে বলা হত যতি আশ্রম। সেই অবস্থায় মানুষ পরিব্রাজক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত। আমাদের কালে এখন ছাত্রাবস্থার পরেই সংসারে প্রবেশের ব্যবস্থা। তারপর একবার সংসারে প্রবেশ করলে তা হতে আর মুক্তি নেই। সংসারী অবস্থাতেই মানুষের জীবনের বাকি অংশ কেটে যায়। আমরা এখন জীবনের শেষের দুটি আশ্রমকে ত্যাগ করেছি।

সুতরাং সে কালের ব্যবস্থা অনুসারে মানুষের জীবনের প্রথম আশ্রম ছিল ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রাবস্থা। শিশু একটু বড় হয়ে যখন চলতে ফিরতে শিখত, যখন মায়ের সেবা ও যত্ন আর তার দরকার হত না, তখনি এই আশ্রম আরম্ভ হত। এই আশ্রমকে অবলম্বন ক'রে দুটি প্রধান সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। তার একটি সম্পন্ন হত যেদিন সে পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে গুরুর গৃহে যাত্রা করত সেই দিন। আর অপরটি সম্পন্ন হত যেদিন সে শিক্ষা শেষ ক'রে গুরুর গৃহ ত্যাগ ক'রে পিতার গৃহে ফিরে আসত।

গুরুর গৃহে যাবার দিনে যে উৎসবটি হত, তার নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন সংস্কারটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। কারণ, এখনও ব্রাহ্মণের সন্তান হলে তার উপনয়ন হয়। মাথা মুণ্ডন করতে হয়, গৈরিক রঙের বস্ত্র আর উত্তরীয় ধারণ করতে হয় এবং উপবীত গ্রহণ করতে হয়। সেকালেও গুরুগৃহে যাবার পূর্বে বালক এইরকম মস্তক মুণ্ডন করত, এইরকম কাষায় বস্ত্র পরিধান করত, এইরকম উপবীত ধারণ করত। উপনয়নের সময় এখনকার দিনেও একটি ভিক্ষার ঝুলি দেওয়া হয়। সেই ঝুলিতে তণ্ডুল ভিক্ষা নিতে হয়। সেই তণ্ডুল দিয়ে যে অন্নপাক হয় তাই খেতে হয়। এখন এইভাবে জীবনযাপন করতে হয় তিন দিন মাত্র। সেকালে এই ধরনের জীবনযাপন করতে হত সমগ্র ছাত্রজীবন জুড়ে। কারণ, এখন নামে মাত্র সমাজ ব্যবস্থার এই নির্দেশ পালন করি, তখন তা কার্যত করতে হত।

বর্তমান কালে আমরা উপার্জনশীল হবার আগে কম দিন পড়ি না, অনেক বছর ধরেই পড়ি। কোনো বালকের হাতে-খড়ি যদি হয় পাঁচ বছর বয়সে, তার ইস্কুলে পড়তে হয় এগার বছর। তার পর কলেজে পড়তে হয় তিন বছর, তবে সে উপাধি পরীক্ষার যোগ্য হয়। তারপর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আরও পড়তে হয়। সুতরাং ছাত্রজীবন চোদ্দ পনের বছর স্থায়ী হয় বৈ কি।

সেকালেও ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য আশ্রম কম ক'রে বার বছর স্থায়ী হত। এই দীর্ঘ সময় শিক্ষার্থী পিতামাতার স্নেহময় পরিবেশ ত্যাগ ক'রে গুরুর গৃহে গিয়ে আশ্রয় নিত। গুরু এবং গুরুপত্নীই তাকে সেখানে দেখাশোনা করতেন। তাকে শিক্ষা দেবার ভার এবং ভরণপোষণের ভার সবই গুরুর ওপর পড়ত। তাকে বলা হত অন্তেবাসী, কারণ গুরুর কাছেই সে বাস করত। অন্তেবাসী তখন গুরুর সংসারেরই একজন হয়ে যেত। গুরু তার ভরণপোষণ বা শিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীর পিতার নিকট হতে কোনো অর্থ আদায় করতেন

না। প্রশ্ন ওঠে তাহলে গুরুর চলত কি ক'রে? গুরুর নিজের সংসারখরচ আছে, তার ওপর শিষ্যের গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ। এ বিষয়ে ব্যবস্থা ছিল সহজ। এই যে ঝুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই ঝুলিই এ সমস্যার সমাধান ক'রে দিত। শিষ্য যতকাল গুরুর গৃহে বাস করত, এ ঝুলি তার সঙ্গী হত। প্রতিদিন এক সময় অবসর ক'রে নিয়ে সে ভিক্ষায় বাহির হত। সংসারী গৃহস্থেরা এই রকম ব্রহ্মচারীকে খুসী হয়েই ভিক্ষা দিতেন, কারণ ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দেওয়া সেকালের গৃহীরা একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে পালন করতেন। ভিক্ষা ক'রে যা পাওয়া যেত তা গুরুর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হত। সেকালে সমাজই এইভাবে শিক্ষার ভার বহন করত, শিক্ষার জন্য সন্তানের পিতার কোনো ব্যয়ভার বহন করতে হত না।

সেখানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে বিদ্যালাভের পর পিতামাতার নিকট ফিরে যাবার সময় আসত। ফিরে যাবার জন্য নির্দিষ্ট দিনটিকে উপলক্ষ্য ক'রে অন্তেবাসীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল। সে সংস্কারের নাম হল সমাবর্তন। সমাবর্তন মানে ফিরে আসা। গুরুর গৃহ হতে অন্তে-বাসী সেদিন পিতার গৃহে ফিরে আসত বলেই বোধ হয় এই নাম। কিন্তু গুরুই ঠিক করতেন কখন তার এই সমাবর্তনের সময় উপস্থিত হবে।

এখনকার দিনে ধার্য সময়ের মধ্যে পাঠ্য-পুস্তক পড়া শেষ হয়ে গেলে লিখিত পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই উপাধি পাবার অধিকার হয়। উপাধি পেলে চাকুরীতে নিয়োগের সুবিধা হয়। সেকালে লিখিত পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু যা ব্যবস্থা ছিল তা বেশ কঠিন। গুরুই ছিলেন একমাত্র পরীক্ষক। তাঁকে দুটি বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে হত। প্রথম বিদ্যালাভ সম্পর্কে শিষ্য যে বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেছে তাতে অধিকার লাভ করেছে কিনা, এ বিষয়ে গুরুকে নিশ্চিন্ত হতে হত। যে গুরুর সঙ্গে বসে প্রতিদিন বিদ্যাচর্চা হত, তাঁকে ত ফাঁকি দেওয়া চলে না। রীতিমত ব্যুৎপত্তি না হলে গুরুকে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট করা এক রকম অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, তাঁকে আর এক পরীক্ষায় সন্তুষ্ট করতে হত। সে ধরনের পরীক্ষার আজকাল প্রচলন নেই। শিষ্যের চরিত্র ঠিক গঠিত হয়েছে কিনা, সে এমন কতকগুলি গুণ অর্জন করেছে কিনা, যা তাকে সমাজের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলবে, সে বিষয় পরীক্ষা দিতে হত। একে বলা যেতে পারে নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা।

কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি বা সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়ে ত একটা মানুষ হয় না। মানুষ গড়ে ওঠে সমাজের অঙ্গ হিসাবে। কয়েকটি মানুষ নিয়ে একটি পরিবার। এমন অনেক পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে সে একজন। তার ইচ্ছাধীন কর্মগুলির প্রভাব এই গোষ্ঠীর ওপর গিয়ে পড়ে। এমন ভাবে তার কাজগুলি করতে হবে যাতে গোষ্ঠীর অন্য মানুষের ক্ষতি না

হয়। এমন কাজও তার করা উচিত হবে না যা সমগ্র গোষ্ঠীর অকল্যাণ করবে। কোনো মানুষ একা বনে বাস করলে ছিল অন্য কথা। সেখানে সে যা খুসী করুক, তার কাজের ফল অন্য লোকের ওপর বর্তায় না। কিন্তু সমাজের দশজনের মধ্যে একজন হয়ে বাস করতে হলে সাবধান হওয়া দরকার। অন্যের স্বার্থে যাতে ক্ষতি না হয় এমনভাবে কাজ ক'রে যাওয়া দরকার। তা না হলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি হবে। পথে চলতে বিপরীত দিক হতে দুজন লোক এলে, তাদের পরস্পরকে এড়িয়ে চলতে হয়। তা না হলে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সেটা উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকর। সেই রকম সমগ্র সমাজের কল্যাণের সঙ্গে আমাদের নিজেদের স্বার্থের সামঞ্জস্য রাখা দরকার। তার কারণ সমাজের কল্যাণের সঙ্গে আমাদের কল্যাণ জড়িত। যে জ্ঞান এই ইচ্ছাধীন কর্মগুলিকে ঠিক মত চালিত করতে শিক্ষা দেয়, তাকে নীতিজ্ঞান বলে। যে ছেলে সমাজ সেবায় পারদর্শিতা দেখিয়েছে বা অন্যের উপকার করতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে পেরেছে বা উত্তেজনার কারণ থাকলেও ক্রোধ সংবরণ করতে পেরেছে, তার নীতিজ্ঞান হয়েছে।

ঠিক সমাবর্তনের পূর্বে শিষ্যকে গুরু বিশেষ ক'রে নীতিশিক্ষা দিতেন। সমাবর্তনের সময় এ বিষয় পরীক্ষা ক'রে সন্তুষ্ট হলে তবে অন্তেবাসীকে পিতৃগৃহে ফিরে যাবার অনুমতি দিতেন। উপনিষদের মধ্যেই একাধিক স্থানে সমাবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক জায়গায় এই সমাবর্তনের একটি দৃশ্য পাই। শিষ্যের বিদ্যালাভের কাজ শেষ হয়ে গিয়ে সমাবর্তনের সময় উপস্থিত হয়েছে। পিতৃগৃহে প্রস্থানের পূর্বে আচার্য তাকে কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছেন। সেইখানে এইরূপ লেখা আছে।

বেদপাঠ শেষ হলে পর আচার্য অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন।[৬] যা উপদেশ দিচ্ছেন তা সবিস্তারে বলতে গেলে এক দীর্ঘ তালিকা হয়ে যাবে। সংক্ষেপে তার সার অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আচার্য বলছেন, "সত্য হতে স্খলিত হবে না, ধর্ম হতে স্খলিত হবে না, কুশল হতে স্খলিত হবে না।"[৭]

গুরু চাইছেন যে শিষ্য সত্য কথা বলবে, ধর্ম পালন করবে এবং যে কর্ম সকলের কল্যাণ করে তাই সাধন করবে। সরল, সহজ, অথচ সারগর্ভ উপদেশ। সকল কালে, সকল দেশে তা সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়।

আচার্য আরও বলছেন,

"যে কর্ম অনবদ্য তাই তুমি করবে। অন্য কর্ম করবে না। আমরা যেটুকু

---

[৬] বেদমনূচ্য আচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি॥ তৈত্তিরীয়॥ প্রথমা বল্লী॥ ১১

[৭] সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্॥ ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্॥
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্॥ তৈত্তিরীয়॥ প্রথমা বল্লী॥ ১১

ভাল কাজ করব, তাকেই তুমি শ্রদ্ধা করবে, যা ভাল নয় তাকে শ্রদ্ধা করবে না।”[৮]

সেকালের আচার্যের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি যখন শিষ্যকে নিয়ে শিক্ষণের কাজ সুরু করতেন, তাকে বিদ্যাদান বলে মনে করতেন না, তাতে উভয়েরই বিদ্যালাভ হবে এই বিবেচনা করতেন। তাই পাঠ সুরু করবার আগে শিষ্যকে নিয়ে যে প্রার্থনা নিবেদন করতেন তাতে বলতেন, “আমরা উভয়েই যেন অধ্যয়ন ক'রে তেজস্বী হই।”[৯] তিনি যেরূপ আচরণ করবেন অন্তেবাসী অন্ধভাবে তারই অনুকরণ করবে তাও তিনি চাইতেন না। একেবারে ত্রুটিহীন, বিচ্যুতিহীন কর্ম করবার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই হয়। তাই তিনি চাইতেন, অন্তেবাসী বিচক্ষণ হক, যে কাজ তাঁর ভাল তারই সে অনুকরণ করুক, যা মন্দ তা বর্জন করুক। একেবারে অহমিকাবোধরহিত না হলে কে এমন উপদেশ দিতে পারে?

যে কাজকে যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি হতেই অন্যায় বলা যায় না, তাই হল অনবদ্য কর্ম। কারও স্বার্থের তা হানি করে না। এইরূপ কাজই নীতি-সম্মত কাজ। আচার্য অন্তেবাসীকে নিজের ইচ্ছাধীন কাজগুলি এইভাবে নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন।

সমাবর্তন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অন্তেবাসীর প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দেবার একটি উদাহরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়।[১০] সেটির উল্লেখ এখানে খুব প্রাসঙ্গিক হবে। শিষ্যের মধ্যে আচার্য কোন কোন গুণের বিশেষ বিকাশ চাইতেন, তার একটি সুন্দর বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। গল্পটি এই।

প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্যাদানের জন্য একটি আশ্রম খুলেছিলেন। সেখানে তিনজন বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করতে এসেছিল। তাদের একজন ছিল দেবতা, একজন মানুষ এবং তৃতীয়টি অসুর। প্রজাপতি তাঁর আশ্রমে তাদের গ্রহণ করলেন। তারপর দীর্ঘ বারো বছর ধরে সেখানে তাদের বিদ্যাচর্চা চলল। বিদ্যালাভ শেষ হয়ে যখন সমাবর্তনের সময় উপস্থিত হল, গুরু তাদের ডেকে পাঠালেন। কারণ, এই সময় গুরুর নিকট শিষ্যের শেষ উপদেশ প্রার্থনা করবার একটি রীতি ছিল।

প্রথমে দেবতা শিষ্যটির পালা। সে শ্রদ্ধাভরে গুরুকে প্রণাম ক'রে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

প্রজাপতি উত্তরে কেবল একটিমাত্র অক্ষর উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, ‘দ’।

---

[৮] যান্যনবদ্যানি কর্মাণি॥ তানি সেবিতব্যানি॥
নো ইতরাণি॥ তৈত্তিরীয়॥ প্রথমাবল্লী॥ ১১॥ ২

[৯] তেজস্বিনাবধীতামস্তু॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ বল্লী॥

[১০] বৃহদারণ্যক॥ ৫॥ ২॥ ৩

তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যা বললাম তার অর্থ বোধ হয়েছে?

শিষ্যটি খুব সপ্রতিভ, উত্তরে বলল, আজ্ঞে হাঁ হয়েছে।

কি?

আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দাম্যত' অর্থাৎ আত্মদমন কর।

তারপর মানুষ শিষ্যটির পালা। সে গুরুকে প্রণাম ক'রে উপদেশ চাইল।

গুরু তাকেও বললেন সেই একই কথা, 'দ'।

খানিক বাদে প্রশ্ন করলেন, যা বললাম তা বুঝেছ?

আজ্ঞে হাঁ।

কি বুঝেছ?

আপনি উপদেশ দিলেন, 'দত্ত' অর্থাৎ দান কর।

সবার শেষে অসুর শিষ্যটির পালা। শিষ্যটি যখন প্রণাম ক'রে তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা ক'রে দাঁড়াল, গুরু তাকেও সেই এক অক্ষরের একটি কথা বললেন, 'দ'।

তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন, কি বুঝলে?

শিষ্য উত্তর দিল, আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দয়ধ্বম্', অর্থাৎ দয়া কর।

বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, একটি গুরুগম্ভীর ভাব আমাদের মনকে তখন আবিষ্ট করে। সূর্য দেখা যায় না, মেঘের বিস্তার তার প্রভাকে নিস্তেজ ক'রে দেয়। সেই গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যায়। তখন মেঘ কি বলে?

উপনিষদের ঋষি বলেন মেঘ বলে 'দ, দ, দ'। কেন বলে? কেন বলে তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। সেটা হল এই :

সেই যে কোন আদিকালে প্রজাপতি তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দ, দ, দ', এ তারই প্রতিধ্বনি। যুগ-যুগান্তর ধরে মেঘে ঢাকা দিনে নূতন ক'রে তাকে শোনা যায়। দেবতা অসীম ক্ষমতার আধার। সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে বিশ্বের কল্যাণের ব্যাঘাত হয়। তাই তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আত্মদমন করতে। মানুষ বড় লোভী প্রাণী। ভোগ করতে সে নিত্য উৎসুক। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দত্ত', দান কর, যা পাও তা ভাগ ক'রে ভোগ কর, একা ভোগ কোরো না। আর অসুর স্বভাবত হিংসাপরায়ণ। এই প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিলে অন্যের উৎপীড়ন হবার সম্ভাবনা। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'দয়ধ্বম্'। সকলকে দয়া কর, তা হলে হিংসাবৃত্তি বশে থাকবে।

সেই জন্যই নাকি মেঘ বছরে বছরে প্রজাপতির সেই উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদের বলে 'দদদ, দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বমিতি।'

শুধু কি তাই? মেঘ বজ্রের বাণী দিয়ে শুধু কথা বলে না, আকাশের

বুকে বিজলির রেখায় সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে তা লিখেও দেয়। তাই ত বিজলি 'দ'-এর রূপ নিয়ে আকাশের বুকে ঝিলিক দিয়ে যায়। বিশ্ববাসী কাণে শুনুক এবং চোখে দেখুক প্রজাপতির সেই উপদেশ।

মানুষের দেহমনকে সংযত করবার প্রয়োজন হয় সার্থকভাবে জীবন-যাপনের জন্য, সংসারজীবন হতে পলাতক হবার জন্য নয়। এই যেন মনে হয় উপনিষদের আদর্শ। তার সঙ্গে সন্ন্যাসবাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সন্ন্যাসপন্থীর উদ্দেশ্য হ'ল শরীর ও মনকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে নিরুদ্ধ করা। মানুষের দেহমনের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বিষয় ভোগের প্রতি ইন্দ্রিয়ও আকৃষ্ট হয় মনও আকৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসপন্থী দেখেছেন যে এরকম ঘটলে চিত্তবিক্ষেপ হয়, ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা যায় না। ফলে মানসিক একাগ্রতা সাধন সম্ভব হয় না। কেউ স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্তি বা শান্তি পান না, কেউ কোনো বিশেষ মানসিক আঘাত হেতু বৈরাগ্য সাধনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এই ধরনের সকল মানুষেরই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কৃচ্ছ্রসাধন করা। তাঁদের তখন কর্তব্য হয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়কে ভোগের বিষয় হতে সর্বক্ষণ বিচ্ছিন্ন রাখা এবং মনের মধ্যে এমন এক বৈরাগ্য ভাব সৃষ্টি করা যাতে মানসিক অবস্থা কৃচ্ছ্রসাধনের অনুকূল হয়। সেটা সফল করবার চেষ্টা হয় সাধারণত দুটি ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে। ইন্দ্রিয়ভোগে যে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, সংসারজীবন যে ক্ষণস্থায়ী এবং অসার, এইটি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। দ্বিতীয়ত যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়কে অত্যধিক আকর্ষণ করে, তারা যে কুৎসিৎ এবং অসুন্দর এইটা প্রতিপাদন করার চেষ্টা ক'রে তাদের প্রতি মানসিক বিতৃষ্ণা জাগানর চেষ্টা হয়। মোটামুটি এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাদের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করা, অর্থাৎ সকল প্রকার ভোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করা। মোট কথায় সন্ন্যাসবাদের কাছে কৃচ্ছ্রসাধন এবং ইন্দ্রিয়নিরোধই মুখ্য জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।

এইখানেই উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সন্ন্যাসবাদের পার্থক্য। কৃচ্ছ্র-সাধন এবং ইন্দ্রিয়নিরোধের প্রয়োজন আছে বৈকি। কিন্তু তার একটা উদ্দেশ্য আছে। তা গৌণ জিনিস। উদ্দেশ্য হল দেহ ও মনের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করা যাতে তাদের ঠিক পথে পরিচালিত ক'রে জীবনকে সার্থক করা যায়। সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষ ব্যায়ামচর্চা করে শারীরিক বল সঞ্চয়ের জন্য। সেখানে শারীরিক বল সঞ্চয় করা গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য হল সেই শক্তিমান দেহকে কর্মতৎপর করা। কর্মক্ষমতাতেই শারীরিক বল ধারনের সার্থকতা, কেবল মাত্র বল সঞ্চয়ে নয়। সংযম সাধনারও উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়-গুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ ক'রে কল্যাণের পথে তাদের পরিচালিত করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে যে মানুষ মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে গৌণ উদ্দেশ্যকে নিয়ে মেতে যায়। গৌণ উদ্দেশ্য তখন মুখ্য উদ্দেশ্যের

স্থান অধিকার ক'রে বসে। ব্যায়ামবীর শরীরকে বলের আধার ক'রেই সন্তুষ্ট থাকেন, কর্মে সেই শরীরকে নিয়োগ করবার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। সন্ন্যাসী কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামের ওপর সম্পূর্ণ প্রভাব অর্জন করেই ক্ষান্ত হন, কল্যাণের কাজে তাকে নিয়োগ করেন না। কোনো বৃত্তির একপেশে পরিবর্ধন করতে গেলেই সাধারণত ফল দাঁড়ায় এই রকম।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তার এখানে উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র পাওয়া যাবে। উপরের অনুরূপ যুক্তি দিয়ে তিনি সন্ন্যাসমার্গের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সন্ন্যাসের জন্য যে কৃচ্ছ্রসাধন তা আত্মবঞ্চনার ধর্ম, কারণ তা মানুষের বৃত্তিগুলিকে কোনো কাজে লাগায় না। কৃচ্ছ্রসাধনের যে আদৌ প্রয়োজন নেই, সে কথা তিনি বলেন না। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে তার প্রয়োজন আছে বৈকি। তা মনকে আত্মসংযমে অধিকার দেয়। কিন্তু তা গৌণ জিনিস, তাকে মুখ্য আদর্শে পরিণত করলেই ভুল করা হবে। কেবল, শুষ্ক, নীরস কৃচ্ছ্রসাধনে কোনো সার্থকতা নেই। তা আত্মবঞ্চনার ধর্ম। আমাদের চাই আত্মবঞ্চনা নয়, আত্মসংযম যাতে জীবনকে আমরা সার্থক ক'রে তুলতে পারি।

তিনি তাই বলেছেন,

"সৌন্দর্য ত চাই। আত্মহত্যা ত সাধনার বিষয় হতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য পালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না।......রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে উপলক্ষ্যের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে; যে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে, ধনী হইতে চায় টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া উঠে, দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজলুশন পাশ করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

তেমনি নিয়ম সংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ মনে করে, যাহারা পুণ্য মনে করে তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া ওঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।[১১]

এই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে উপনিষদ কোনো পক্ষের সমর্থন করে'নি। উপনিষদ একটি তৃতীয় পথ গ্রহণ করেছে, যা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে যেন বিরোধের সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছে। উপনিষদ বলে মানুষের জীবনে ত্যাগেরও প্রয়োজন আছে, ভোগেরও স্থান আছে, উভয়ের সামঞ্জস্যের পথেই জীবন সার্থকতামণ্ডিত হয়।

---

[১১] রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, সাহিত্য, পৃ ৩৫৫

ভূমিকে উর্বর করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সে ভূমিকে ভালভাবে কর্ষণ করা। সেই কর্ষণ হল জীবনের ত্যাগের দিক। কিন্তু কর্ষণ ক'রে জমি ফেলে রাখলে ত এত শ্রম, এত কষ্ট স্বীকার সার্থক হয় না, তা বৃথায় যায়। তাতে বীজ বপন করতে হয়, শস্য উৎপাদন করতে হয়। তবে সেই কষ্টস্বীকার সার্থক হয়ে ওঠে। সেইরূপ জীবনে ত্যাগটাই সর্বস্ব নয়। ত্যাগের পরে যে পথে ভোগ জীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করবে সে ভোগের প্রয়োজন আছে। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ আমাদের আদর্শ হবে না। আমাদের আদর্শ হবে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে নির্বাচিত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করা। ইন্দ্রিয় দমনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের।

আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত প্রজাপতি ও তাঁর তিন শিষ্যের গল্পে এই সম্পর্কে ফিরে যেতে পারি। মহাকবি শেক্সপিয়ার প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে উপদেশবাণী খুঁজে পেতেন। উপনিষদের ঋষিও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নীতিগর্ভ বাণী খুঁজে পেতেন। বর্ষার দিনে আকাশের বুকে যখন বিদ্যুৎ খেলা করে এবং গুরু গুরু গর্জন শোনা যায়, তখন ঋষি তার মধ্যে বাণী শোনেন। তিনি শোনেন "আকাশ বলছে, 'দ, দ, দ', অর্থাৎ আত্মদমন কর, দয়া কর, দান কর। অতএব আত্মদমন, দয়া এবং দান অভ্যাস করা উচিত।"[১২] এখানে আত্মদমনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সর্বস্ব ত্যাগের কথা বলা হয়নি।

সমাবর্তনের দিনে গুরু শিষ্যকে যে ধরনের উপদেশ দিতেন তার এটি একটি উদাহরণ। আরও উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে এই ধরনের আর একটি উপদেশের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। তার বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। শুধু তাই নয়, তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই কাহিনীটি পাই। সেখানে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শেষে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঠিক পূর্বে আচার্য অন্তেবাসীকে শেষ উপদেশ দিচ্ছেন। সেই সম্পর্কে আচার্য এই বলছেন,

"সত্য কথা বলবে। ধর্ম আচরণ করবে। বেদ পাঠ হতে বিরত হবে না। আচার্যকে প্রিয় উপহার দেবে। বংশের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।"[১৩]

এখানে বংশের ধারাকে অব্যাহত রাখার উপদেশটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শিষ্য ব্রহ্মচর্যের পর আদর্শ সংসারীরূপে সংসারধর্ম পালন করবার উপযুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁকে গুরু উপদেশ দিচ্ছেন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে।

---

[১২] তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নু
দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি
তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ, দমং, দানং দয়ামিতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৫॥ ২॥৩

[১৩] সত্যং বদ॥ ধর্মং চর॥ সাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ॥
আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ॥ তৈত্তিরীয়॥ ১॥ ২

পূর্বে কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে শিষ্য ভোগের জীবন যাপনের উপযুক্ত হয়েছেন। ভোগের জন্যই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন, যেমন শস্যের জন্য ভূমি কর্ষণের প্রয়োজন। জীবনে ত্যাগেরও স্থান আছে, ভোগেরও স্থান আছে।

কঠ উপনিষদে একটি বাণী পাই যা নৈতিক জীবনকে দুর্গম পথের সহিত তুলনা করেছে। পুরুষার্থ লাভের পথ সহজ নয়, সুগম নয়। তাকে ক্ষুরের ধারার ন্যায় শাণিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে 'দুর্গ', তাকে বলা হয়েছে 'দুরত্যয়' অর্থাৎ তা দুর্গম এবং তা সহজে অতিক্রম করা যায় না।[১৪] তার কারণ, নীতির পথ বড় কঠিন। ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্ত রেখে ঠিক পথে চালিত করতে হবে। এ যেন অনেক অশ্বের সহিত সংযুক্ত একটি রথ, সেই অশ্বগুলি বিপথগামী হতে উন্মুখ। তাদের প্রত্যেকটিকে সংযত রেখে গন্তব্য পথে চালিত করতে হবে। তাই আত্মদমন এবং আত্মসংযমের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নিরন্তর ইন্দ্রিয় নিরোধ অভ্যাস এখানে আদর্শ নয়। তা হলে পথ চলার সহিত ত উপমা ঠিক আসে না।

সেই কারণেই বিষয়ভোগের প্রতি বৈরাগ্যের অনুকূল মনোভাব উপনিষদে পাওয়া যায় না। উপনিষদের বচনে এমন একটি আনন্দের ভাব উচ্ছল হয়ে আছে যে তার সঙ্গে বৈরাগ্যের মৈত্রী সম্ভব হয় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে,

"কেই বা প্রাণ ধারণ করতে চাইত, যদি না আকাশ হতে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ত?"[১৫]

উপনিষদের ঋষি কি মায়া অঞ্জন চোখে মাখিয়ে জগতকে দেখেছিলেন জানি না, তবে তা যে আনন্দলোকের সংবাদ তাঁকে এনে দিয়েছিল, সে কথা ঠিক। তাই তাঁরা যেদিকে নয়ন মেলতেন সবই ভাল ঠেকত, সবই আনন্দ এবং হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠত। তাই পৃথিবীর ধূলি তাঁদের কাছে মধুময় হয়ে উঠত, স্রোতস্বিনী হয়ে উঠত মধুমতী এবং বাতাস ছড়াত মধু। আকাশভরা সূর্য তারা আর পৃথিবীভরা প্রাণ নিয়ে রূপ রঙ গন্ধ স্পর্শ শব্দের যে বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয় নিচয়ের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাকে তাই তাঁরা আনন্দরূপ এবং অমৃত বলে অভিবাদন জানাতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনার কোনো সংযোগ থাকতে পারে না।

ইন্দ্রিয়সুখকে সেই কারণে, উপনিষদের ঋষি পরিহার করেন নি। যে পরম শক্তি মানুষকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করেছেন, তিনি মানুষকে সুখবোধ দিয়েছেন। উপনিষদ তাই স্বীকার করেন যে মানুষ কামনাবিহীন হয়ে কাজ

---

[১৪] ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ কঠ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৪

[১৫] কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ॥
যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২ ॥ ৮

করে না, মানুষ সুখের আশায় কাজ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,

"মানুষ যে কোনো বিশেষ কাজ করে, সুখ পায় বলে তা করে। সুখ না পেয়ে সে কাজ করত না। সুখ পায় বলেই কাজ করে।"[১৬]

সুখবোধও খারাপ জিনিস নয়, কাজ করাও খারাপ জিনিস নয়। কারও অকল্যাণ সাধন করলেই তা খারাপ হয়। সেই কারণে, অকল্যাণকে পরিহার করবার জন্য ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে, ইন্দ্রিয় নিরোধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সেই পথেই পুরুষার্থ লাভ সম্ভব।

এ কথা ঠিক, যে সুখবোধের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মৌলিক বৃত্তি এবং তাকে অস্বীকার করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তা ব'লে উপনিষদ কিন্তু এ কথা বলে না যে বিভিন্ন সুখবোধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাদের কোনো গুণগত বিভেদ নেই। উপনিষদের মতে বিভিন্ন বিষয় ভোগে বিভিন্ন প্রকার সুখ হয়। সুখের গুণের ভিত্তিতে বিভিন্নতা আছে। বৈষয়িক সুখভোগ হতে মানসিক সুখভোগ উৎকৃষ্ট জিনিস। এই কারণে দেখা যায় যে উপনিষদের বচনে মানসিক সুখভোগের প্রতি খানিকটা পক্ষপাত দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি উপনিষদের কয়েকটি গল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একবার কঠ উপনিষদের নচিকেতার গল্পের উল্লেখ করতে পারি। যমের কাছে যখন তিনি জানতে চাইলেন মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় তখন যম এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হলেন না। তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য তিনি নানা প্রলোভন দেখালেন। তিনি বললেন,

"পৃথিবীতে যে সব সুখ পাওয়া যায় না তাই একে একে প্রার্থনা কর। রথ ও অশ্বসহ এই নারীদের তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এদের মত নারী মর্তলোকে পাওয়া যায় না। এদের হাতে তুমি পরিচর্যা লাভ কর। মরণের বিষয় আমাকে প্রশ্ন কোরো না।"[১৭]

নচিকেতাকে কিন্তু এই বিষয় সম্ভোগের লোভ জ্ঞানের তৃষ্ণা হতে নিবৃত্ত করতে পারল না। তিনি সেই প্রস্তাবের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সারা বিশ্বের প্রণিধানের যোগ্য। তিনি বলেছিলেন,

"জীবন দীর্ঘ হলেও তা অল্পই বটে। অশ্ব, নৃত্য, গীত, সব আপনারই থাক। বিত্তের দ্বারা ত মানুষকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না।"[১৮]

সুতরাং তাঁর মতে বিষয়ভোগ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষের তৃপ্তি বিষয়ভোগে নয়; মানুষের তৃপ্তি জ্ঞানপিপাসা নিবারণে।

---

[১৬] যদা বৈ সুখং লভতে অথ করোতি নাসুখং
লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭॥ ২২॥ ১

[১৭] কঠ॥ ১॥ ১॥॥ ১৫

[১৮] ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ॥ কঠ॥ ১॥ ১॥ ২৭

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের গল্প হতে আমরা এই উপলব্ধিরই ভিন্নভাবে সমর্থন পাই। এই গল্পের সঙ্গেও আমাদের পূর্বের এক অধ্যায়ে পরিচয় হয়েছে। আমরা তাই বিষয়টির সংক্ষেপ পুনরুল্লেখ করব। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তিনি প্রব্রজিত হবেন সংকল্প করলেন। সেই কারণে তিনি মৈত্রেয়ীকে বললেন, আমি প্রব্রজিত হব, এস কাত্যায়নী এবং তোমার মধ্যে আমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিই।

মৈত্রেয়ী তখন উত্তরে বললেন, যদি এই সমগ্র পৃথিবী বিত্তের দ্বারা পূর্ণ হত আর আমি তা পেতাম, তা হলে কি আমি অমৃত হতে পারতাম?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বললেন, তা হয় না, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা করা যায় না।

তখন মৈত্রেয়ী যা উত্তর দিলেন তাও বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। তিনি বললেন,

"যা দিয়ে আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি করব? যা আপনি জানেন তাই আমাকে বলুন।"[১১]

সুতরাং এখানেও আমরা পাই, বাস্তব সুখ সম্ভোগের উপায়কে প্রত্যাখ্যান ক'রে এক সাধারণ গৃহস্থ নারী দার্শনিক জ্ঞানকেই পক্ষপাত দেখালেন। বাস্তব সুখ হতে মানসিক সুখের প্রতি তাঁরও আকর্ষণ বেশী।

এই সম্পর্কে আর একটি গল্প আমাদের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলবার অনেকখানি সাহায্য করবে। আমরা জানি বিদেহরাজ জনকের জ্ঞানপিপাসা ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই তিনি অনুক্ষণ দার্শনিক প্রবর যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে কাছে ফিরতেন। একবার তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে জনক ইচ্ছা-প্রশ্নের বর পেয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি যখন খুসী যা প্রশ্ন করবেন যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন। এইভাবে একবার উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা এমন আনন্দের বস্তু যে তার তুলনায় পার্থিব ভোগ্য বস্তুর কামনা ম্লান হয়ে যায়। দার্শনিক জ্ঞানের আনন্দের আস্বাদ যিনি পেয়েছেন, তিনি আর বৈষয়িক ভোগ সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি তাই বলেছেন,

"ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানলাভ করেছেন তাঁরা সন্তান কামনা করেন না। তাঁরা বলেন সন্তান নিয়ে কি করব তারা ত এই আত্মা এই বিশ্ব হতে পৃথক। তাঁরা পুত্র কামনা ত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন এই ভেবে যে পুত্রের জন্য

---

[১১] যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্॥
যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ৩

যে বাসনা তা বিত্তের জন্য বাসনারই সামিল, যা বিত্তের জন্য বাসনা তা পার্থিব সুখের বাসনারই সামিল, এরা সবই ত বাসনা।"[২০]

এখানেও আমরা দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করতে পারি। এ আকর্ষণ এত তীব্র যে এর কাছে অন্য সকল আকর্ষণই পরাজয় স্বীকার করে। মানসিক সুখ বৈষয়িক সুখ হতে এত বেশী মর্যাদা পেয়েছিল যে তার জন্য মানুষ সকল সম্পদ, সকল বাসনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হত।

স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে দ্বিতীয় মূল নৈতিক সমস্যার উদ্ভব। মানুষ নিজের মত কাউকে ভালবাসে না। কাজেই নিজের সুখ, নিজের সুবিধা, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সে এমন ব্যস্ত যে অন্যের সুখ, অন্যের সুবিধার কথা ভাববার সুযোগই হয় না। যেখানে নিজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ হয়, সেখানে সাধারণত মানুষ নিজের স্বার্থই রক্ষা করে।

এর একটি সমাধান হতে পারে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ ক'রে। এমন মানুষও দেখা যায় যিনি সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি স্বার্থ সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। এ ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘর্ষের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এই স্বার্থ ও পরার্থের সংঘর্ষের মীমাংসা উপনিষদে করা হয়েছে এক অভিনব উপায়ে। মানুষ যে সব সময়েই স্বার্থপর হয় তা নয়। এমন কি সাধারণ মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থত্যাগ করতে পারে। বন্ধু বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগ করতে উন্মুখ হয়, প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারেন, সন্তানের জন্য এমন কাজ নেই যা মা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। এমন হয় কেন? তার উত্তর হল এখানে উভয়ের স্বার্থ একীভূত হয়ে গেছে। মা সন্তানের জন্য সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত, কারণ সন্তানের স্বার্থকে তিনি নিজের স্বার্থের অধিক সম্মান দেন। স্বার্থ একীভূত হয় কি ক'রে? সেটা সম্ভব হয় হৃদয়বৃত্তির যা শ্রেষ্ঠ বিকাশ সেই প্রীতি বা ভালবাসার বিস্তারে। মা সন্তানকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন বলেই সন্তানের স্বার্থ তাঁর নিকট নিজের স্বার্থের অধিক হয়ে গেছে। পত্নী পতির জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, কারণ তাঁকে তিনি ভালবাসেন এবং সেই কারণেই উভয়ের স্বার্থ এক হয়ে গেছে। ঠিক একই কারণে বন্ধু বন্ধুর কল্যাণ সাধন করতে উন্মুখ হয়।

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব এই পথে মীমাংসা সম্ভব। উপনিষদ এই পথেই তার সমাধান খুঁজেছে। প্রীতির বিস্তার ক'রে স্বার্থের বিস্তার সম্ভব।

---

[২০] এতদ্ধস্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং
ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং
নোঽয়মাত্মা হয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ
ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা
বিত্তৈষণা উভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ॥
বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ৪॥ ২১

আবার প্রীতির বিস্তার সম্ভব ঘনিষ্ঠতাবোধ উৎপাদন ক'রে। এইভাবে নীতির সঙ্গে জ্ঞানের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ এসে পড়ে। সে সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু প্রাথমিক কথার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

জ্ঞানের সঙ্গে নীতির যে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে তা একটি সাধারণ উদাহরণ দিলেই বেশ বোঝা যায়। নীতি না হলে জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হয় না, আবার নীতিকে পরিচালিত করতে হলে জ্ঞানের একান্ত আবশ্যকতা আছে। মায়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসা স্বতঃই প্রবাহিত হয় এবং সেই কারণে সন্তানের মঙ্গল সাধনের জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা করতে তিনি প্রস্তুত নন। কিন্তু তাঁর সন্তানের প্রতি এই কল্যাণপরায়ণতা সার্থক হয় না যদি না তিনি জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। অজ্ঞ মা অনেক সময় অন্ধ ভালবাসার বশে সন্তানের বাস্তবিক যা মঙ্গলসাধন করতে পারে তা ঘটতে দিতে পারেন না, বরং তার বাধা-স্বরূপ হন। এর উদাহরণ খুঁজলে প্রচুর মিলবে।

অপর পক্ষে নীতিবিহীন জ্ঞান মানুষের কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান কেবল মাত্র মানুষকে শক্তির অধিকারী করে; কিন্তু সে শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে তা নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ওপর। অন্ধভাবে নীতি-জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিহীন আকারে যে শক্তি চালিত হয়, তা মানুষের মঙ্গল হতে অমঙ্গল সাধনই করে বেশী। এই শক্তি যদি আবার নীতিজ্ঞানহীন মানুষের হাতে আসে, তাহলে অবস্থা হয় আরও শোচনীয়। তা মানুষের ভাগ্যে আনে দুঃখ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন।

ভগবান বুদ্ধ জন্মেছিলেন সেই আড়াই হাজার বছর পূর্বে। তখনকার দিনের মানুষের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছিল তাকে এখনও আমরা ডিঙিয়ে যেতে পারিনি, বরং আমাদের নৈতিক মানের অবনতি ঘটেছে বললে কেউ তার প্রতিবাদ করবেন না। অপর পক্ষে, এই আড়াই হাজার বছরে মানুষের জ্ঞানের প্রসার হয়েছে অপরিমিত। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যে নূতন প্রযুক্তি বিদ্যা গড়ে উঠেছে, তাতে মানুষের হাতে শক্তি এসেছে অভাবনীয় ভাবে বেশী। কিন্তু সেই অতিরিক্ত নূতন শক্তি মানবসমাজে সুখ বা শান্তি আনতে সমর্থ হয়নি। বরং জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের বিষ এমন মনোভাব সৃষ্টি করেছে যা এই আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস কার্যে নিয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। ফলে বিশ্বের মানুষ আজ সর্বধ্বংসী প্রলয়ের আতঙ্কে জর্জরিত। অদূর ভবিষ্যতে তার নিবৃত্তির কোনো আশাও দেখা যায় না। তার কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের যে পরিমাণে জ্ঞান সঞ্চয় হয়ে শক্তি পরিবর্ধিত হয়েছে, সেই পরিমাণে তার নীতিজ্ঞান পরিবর্ধিত হয়নি।

ঠিক সেই কারণেই নীতির সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন। যেখানে নীতি ও জ্ঞান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে শক্তি ও শুভেচ্ছা একত্রিত হয় এবং ফলে শক্তি কল্যাণমুখী হয়। চাই শক্তি আর তার

সদ্ব্যবহার। জ্ঞান দেবে শক্তি এবং নীতি দেবে তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার ক্ষমতা।

এই জ্ঞান ও নীতিতে মিত্রতা স্থাপন সম্ভব হয় হৃদয়বৃত্তির প্রসারের সাহায্যে ভালবাসার বিস্তারের ওপর। এই প্রেম বা ভালবাসাই হল তাদের সখ্য স্থাপনের রাখি। মানুষ যদি অন্য মানুষকে আপনার জ্ঞানে ভালবাসতে শেখে, তাহলে সে যেমন নিজের কাছে প্রিয়, তেমনি তার কাছে প্রিয় হয়ে দাঁড়াবে। সে যদি তার কাছে প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে নিজের স্বার্থ এবং তার স্বার্থ একীভূত হয়ে যাবে। তা হলে আর তাদের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব রইল কোথায়? মা যে সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন, তার কারণ তিনি সন্তানকে ভালবাসেন। যেখানে স্বামী স্ত্রীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে উন্মুখ হন সেখানেও তার কারণ হল তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসেন। আমাদের তা হলে চাই ভালবাসার বিস্তার। প্রীতির ক্ষেত্র যত পরিবর্ধিত হবে স্বার্থ তত পরিশোধিত হবে। আমরা যদি বিশ্বের সকলকে ভালবাসতে পারি আমরা বিশ্বের সকলের মঙ্গল কামনা করব। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের দ্বন্দ্বের লোপ হবে। সুতরাং চাই ভালবাসার বিস্তার, প্রীতির বিস্তার।

উপনিষদে বলে এই প্রীতির বিস্তার সম্ভব হয় দার্শনিক জ্ঞানের বিস্তারে। এই কথাটির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদে ফিরে যেতে হয়। উপনিষদে বলে জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত ক'রে অদৃশ্য বিরাজমান। দৃশ্যমান জগতে যা কিছু পাই সবই ত ব্রহ্ম। তা যদি হয়, আমাদের সকলকে জড়িয়ে যদি ব্রহ্ম বর্তমান থাকেন, তাহলে আমরা সকলেই এক মহান বিরাট সত্তার অংশ। একই পরিবারে বিভিন্ন মানুষ থাকে। তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান, কারণ তারা নিজেদের একই পরিবারের অঙ্গ বলে মনে করে। সেই কারণে তাদের কেউ নিজের পরিবারের স্বার্থের হানি করবে না. পরিবারের প্রতি তার প্রীতি তাকে নিরস্ত করবে। সাধারণভাবে সমাজ জীবনেও একথা খাটবে। আমাদের যদি প্রতীতি হয় যে বিশ্বের সকল মানুষ আমাদের আপনার জন, কারণ সকলেই ত একই সর্বব্যাপী ব্রহ্মের অংশ, তা হলে সকল মানুষের প্রতিই আমাদের প্রীতি ও ভালবাসা বিস্তারলাভ করবে। এইভাবে সকলকে প্রীতির চোখে দেখলে সকলের স্বার্থকেই আমরা সম্মান করব এবং যে কাজ অন্যের স্বার্থ হানি করে সে কাজ হতে বিরত হব। এখানে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব জ্ঞান মানুষে মানুষে একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করে। ফলে হৃদয়বৃত্তির বিস্তারের পথ সহজ হয়। এইভাবেই পরাবিদ্যার সাহায্যে স্বার্থবোধের শোধন সম্ভব।

এই সম্পর্কে আমাদের আর একবার যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর গল্পে ফিরে যেতে হবে। আমরা জানি, এই জ্ঞানপিপাসু মহিলা স্বামীর সম্পত্তির অংশ না নিয়ে তাঁর দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী হতে চেয়েছিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য

খুসী হয়ে তাঁকে কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উক্তি করেছেন যার সঙ্গে বর্তমান আলোচনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। তিনি সচরাচর দৃষ্ট সেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছিলেন যেখানে সাধারণ মানুষও পরার্থকে স্বার্থ হতে মূল্য দেয় বেশী। মা সন্তানের স্বার্থ দেখেন, স্ত্রী স্বামীর স্বার্থ দেখেন, বন্ধু বন্ধুর স্বার্থ দেখেন। এমন কেন হয়?

এই প্রশ্নেরই সেখানে তিনি উত্তর দিয়েছেন। তিনি সেখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে এখানে ঠিক স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। এখানে যা ঘটে তা হল একাত্মবোধ হেতু স্বার্থ বিস্তার লাভ ক'রে উভয়ের স্বার্থ একীভূত করে। স্ত্রী যে স্বামীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, তা স্বামীর কারণে নয়, প্রীতির বিস্তার হেতু উভয়ের একত্ববোধ হয় বলে। এই প্রীতির বন্ধন হয় কেন? তাঁর উত্তরও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন উভয়েই ত একই বিরাট সত্তার অঙ্গ। সেই কারণেই এই একত্ববোধ এবং সেই কারণেই এই প্রীতির সঞ্চার। এখন তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

তিনি বলেছেন, "পতির কারণেই যে পতি প্রিয় হয় তা নয়, ব্রহ্মের কারণেই পতি প্রিয় হয়, জায়ার কারণেই যে জায়া প্রিয় হয় তা নয়, ব্রহ্মের কারণেই জায়া প্রিয় হয়, পুত্রদের কারণে যে পুত্রেরা প্রিয় হয় তা নয়, ব্রহ্মের কারণেই পুত্রেরা প্রিয় হয়......বিভিন্ন জীবেদের কারণেই যে জীবেরা প্রিয় হয় তা নয়, ব্রহ্মের কারণেই বিভিন্ন জীব প্রিয় হয়, সকলের কারণেই যে সকলে প্রিয় হয়, তা নয়, ব্রহ্মের কারণেই সকলে প্রিয় হয়।"[২১]

মোট কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলেন সমগ্র সৃষ্টি একই বিরাট সত্তার প্রকাশ। কাজেই সকল জীবই মূলত এক এবং পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সেই কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি প্রবাহিত হয়। একত্ববোধ এই-ভাবে প্রীতির বিস্তার ঘটায়। সুতরাং জ্ঞান এইভাবে হৃদয় বৃত্তিকে পরিবর্ধিত ক'রে সকল বিশ্ববাসীকে ভালবাসার পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয়, ফলে স্বার্থবোধ সম্মার্জিত হয়ে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বকে লোপ ক'রে দেয়।

আত্মীয়তা বোধের ভিত্তিতে প্রীতির বিকাশ যে সম্ভব হয় তা দু-একটি উদাহরণ নিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। অপরিচিতের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষের সম্বন্ধ না থাকুক, সৌহার্দের ভাব আপনা হতে হয় না। অপরিচিতের মাঝখানে

---

[২১] ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি
আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ২॥ ৪॥ ৪

যদি কেউ স্থাপিত হয় তার হৃদয়বৃত্তি যেন নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। ধরা যাক রেলগাড়ীতে আমি ভ্রমণ করছি। যে কামরায় উঠলাম তাতে যারা আছে তাদের সকলেরই মুখ অপরিচিত। আমি তখন একটা বসবার জায়গা জুটিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকলাম। পাশে যিনি বসেছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু হলে, আমরা খুঁজি পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগসূত্রের আবিষ্কার করা যায় কিনা। দুজনেরই পরিচিত কোনো আত্মীয় বা বন্ধু যদি আবিষ্কৃত হয়ে পড়েন, তখন সেই সদ্য আবিষ্কৃত যৌগসূত্রের ভিত্তিতে আমাদের আলাপ আলোচনা সৌহার্দে পরিণত হয়ে পড়ে। এমনটি প্রায়ই ঘটে থাকে।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক কোনো পুত্র তার মায়ের কাছ হতে ঘটনাচক্রে অল্প বয়সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধরা যাক সে যেন হারিয়ে গেছে। তারপর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে, মায়ের সন্তান হারানর দুঃখ কালক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুত্রও নূতন পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে। এখন উভয়ের দৈহিক পরিবর্তন এমন ঘটেছে যে চোখে দেখে এক অপরকে চিনতে পারার ক্ষমতা রাখে না। এখন এমনও হতে পারে যে অনুকূল ঘটনার সমাবেশে উভয়েই একই স্থানে এসেছে। ধরা যাক কোনো তীর্থক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সন্নিধানে এসেছে, কিন্তু পরস্পরকে চিনতে পারছে না। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পরস্পর অপরিচিতের মত ব্যবহার করবে কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো সূত্রে উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কটি তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটবে। হারান সন্তানকে ফিরে পেয়ে মা যেমন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে সন্তানেরও হৃদয়াবেগের সীমা থাকবে না। সুতরাং আত্মীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রীতির সম্বন্ধ বিকাশলাভ করে বৈ কি।

এইভাবেই উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বে মীমাংসা এনে দেয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হলে এই বোধ জাগে যে এক সর্বব্যাপী সত্তা আমাদের সকলকে ব্যাপ্ত ক'রে আছেন। আকাশ, বাতাস, মানুষ, জীব, জন্তু সকলকে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর প্রকাশ। এই উপলব্ধি হলে সত্যই মনে হবে কেউ ত পর নয়, সকলেই আপন জন। দূরের মানুষ তখন হবে নিকটের বন্ধু, যিনি ছিলেন অনাত্মীয় তিনি হবেন ভায়ের মত।

এই ভাবেই উপনিষদে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্ব তথা ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়েছে। ভোগে বাধা নেই, কিন্তু এমনভাবে ভোগ করতে হবে যাতে অন্যের স্বার্থহানি না হয়। অন্যের স্বার্থহানি করব না কেন? তার কারণ অন্য ত আর সত্যই আমা হতে পর নয়, সেও আপন জন, সেও ত আমারই মত এক ব্যাপক সত্তার অঙ্গ। কাজেই ঘরের মানুষের সঙ্গে ত পরের মত আচরণ করা যায় না। এই হল উপনিষদের নীতির মর্মবাণী। এই মর্মবাণী অতি সংক্ষেপে ঈশ উপনিষদের একেবারে প্রথম অংশে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে :

"বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তনশীল সবই ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত। সেই কারণে, ত্যাগের সহিত ভোগ করা কর্তব্য। কারও সম্পদ অপহরণ করা উচিত নয়"[২২]

উপদেশ হল পরের ধন গ্রহণ কোরো না। কারণ, তা হলে অপরের স্বার্থ হানি হবে। অপরের স্বার্থ হানি যাতে না ঘটে সেই জন্য সংযমের সহিত ভোগ করতে হবে। অপরের স্বার্থের প্রতি এতখানি সম্মান দেখান কেন প্রয়োজন? তার কারণ, কেউ ত পর নয়, সকলেই আপন জন, সকলেই এক ব্যাপক সত্তার অঙ্গ। সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে ভোগ কর এই হল সংক্ষেপে উপনিষদের নৈতিক আদর্শ।

কিন্তু এই পথটি খুব সহজ নয়। সংযমের সহিত ভোগ করতে হলে নিজের দেহ ও মনের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা প্রয়োজন। সেই জন্যই নীতির পথকে দুর্গম পথ বলা হয়েছে। মনের মধ্যে সব সময় একটা দোটানার সংঘর্ষ থাকে। যা আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক তার প্রতি স্বভাবতঃই মন ছোটে। তাকে সংহত ক'রে সেই পথে চালিত করতে হবে যাতে অপরের স্বার্থহানি না হয় এবং নিজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এই মানসিক দ্বন্দ্বকে উপনিষদে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে। যা শ্রেয় তা হল কল্যাণের পথ, যা প্রেয় তা হল অকল্যাণের পথ। যা বর্তমানেই সুখকর, যা আপাতদৃষ্টিতে মধুর, যা ইন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তাই হল প্রেয়। তা চিত্তাকর্ষক এবং মনকে সহজেই ভোলায়, তাই তাকে প্রেয় বলে। তা আমাদের সিদ্ধির পথ হতে ভ্রষ্ট করে। আর যা আপাতদৃষ্টিতে কঠোর, যা বর্তমানে সুখকর নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ আনে, তাই হল শ্রেয়। তা কল্যাণকর বলেই তাকে শ্রেয় বলা হয়েছে।

উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়ে কোনো কাজ করতে গেলেই ওপরের কথাগুলো খাটে। তখন মনুষের মন শ্রেয় ও প্রেয়ের দোটানার মধ্যে পড়ে যায়। এমনকি ব্যক্তিবিশেষের ছোটখাট আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলেও এই শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত পথটি নির্ধারণ ক'রে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করলে তবেই সিদ্ধিলাভ হয়। তাই হল শ্রেয়ের পথ।

এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। কোনো মানুষের ইচ্ছা হল সে ভাল টেনিস খেলোয়াড় হবে। এই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য, তাই হল তার এক্ষেত্রে বিশেষ গন্তব্য পথ। তার জন্য তার প্রয়োজন নিয়ত তার ইচ্ছাধীন কর্মগুলিকে সংযত করা এবং এরূপভাবে পরিচালিত করা যাতে তার

[২২] ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ঈশ ॥ ১

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সহজ হয়। তার স্বভাবত আলস্য ক'রে সময় কাটানর ইচ্ছা জাগতে পারে। সে প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে। নিয়মিতভাবে তার মাঠে যেতে হবে, গিয়ে টেনিস খেলা অভ্যাস করতে হবে। অত্যধিক পরিশ্রম হবে, স্বভাবত বিশ্রাম নেবার প্রবল ইচ্ছা হবে। তাকে দমন ক'রে কঠোরভাবে সাধকের মনোভাব নিয়ে খেলে যেতে হবে। একান্ত একাগ্রচিত্তে বলের ওপর মন নিবদ্ধ রাখতে হবে। পাশে কি ঘটছে দেখবার জন্য মন ছুটতে চাইবে, তুবু তাকে সংযত ক'রে বলের দিকেই নিবদ্ধ রাখতে হবে। খেলার শেষে কোনো সঙ্গী হয়ত সিগারেট খেতে দিতে চাইবেন। তামাক সেবন করলে স্নায়ুর শক্তি কমে যায়, অতএব এ প্রবৃত্তিকে দমন ক'রে, যতখানি ভদ্রতার সঙ্গে সম্ভব তাকে উপহারটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে বহু দিনের সাধনার পর, বহু পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সে একদিন পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠবে। এমন ক'রেই নিজেকে বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত পথে এবং ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে চালিত ক'রে ব্যক্তিবিশেষ সিদ্ধিলাভ করে। এই হল শ্রেয়ের পথ, এই পথ নির্বাচন ক'রেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করে।

তাই কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে,

"শ্রেয় এবং প্রেয় পরস্পর ভিন্ন, উভয়ে মানুষকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে। তাদের মধ্যে যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে বরণ করে সে উদ্দেশ্য হতে ভ্রষ্ট হয়।"[২০]

প্রেয় ও শ্রেয় যুগপৎ সিদ্ধির পথে এসে মানুষকে বলে আমার গলায় বর-মাল্য দাও। এখন সাফল্য নির্ভর করবে কার গলায় মালা দেবে তার ওপর। যে ছেলে ঠিক করেছে পরীক্ষায় সে ভাল করবে, তার পক্ষে শ্রেয় হল পরীক্ষায় সুফল লাভ। তা হল দীর্ঘ সাধনার পথ, বহু দিনব্যাপী নিরলস অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে তাকে পাওয়া যায়। তাই তা আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক নয়। একটা ভাল সিনেমার ছবি তার মনকে টানে, তার বন্ধুর দল তাকে খেলা করতে ডাকে। এগুলি প্রেয়ের আহবান। তা আপাতমধুর, তাই তার আকর্ষণ শক্তি প্রবল। এখন সে কাকে বরণ করবে এই হল সমস্যা। উপরের বচনটি বলে, আমার উপদেশ শোন, শ্রেয়কে বরণ কর। তোমার সিদ্ধি-লাভ হবে। আর যদি প্রেয়কে বরণ কর, তুমি ঠকে যাবে, সিদ্ধির পথ হতে তুমি ভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু শুধু পথ নির্দেশ হলেই ত হল না, শ্রেয়ের পথে নিজেকে পরিচালিত করতে হলে, কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। মানুষের দেহ ও মন নিয়ে যে যন্ত্রটি আছে, তা বেশ জটিল। তাকেই পরিচালিত করতে

[২০] অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ॥
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তে অর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
কঠ॥ ১॥ ২॥ ১

হবে। সুতরাং তার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই বিভিন্ন ক্রিয়াশীল পথগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল জানা প্রয়োজন। আমরা কোনো নির্ধারিত গন্তব্য পথে যেতে মটর গাড়ী ব্যবহার করি। তাকে পরিচালিত করতে হলে তার যে বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অঙ্গগুলি আছে তাদের বিশেষ ক্রিয়া কি, সে বিষয়ে ভাল রকম জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। তার পরে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিজের ইচ্ছামত চালাতে হয় কি ক'রে তাও শিখে নিতে হয়। কোথায় কোন বোতাম টিপলে আলো জ্বলবে, কোন বোতাম টানলে মটরগাড়ীর ইঞ্জিন চলতে সুরু করবে, গীয়ারের সাহায্যে কি ক'রে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, পা দিয়ে ব্রেক্ চেপে কেমন ক'রে গতি থামাতে হয়, এগুলিও শিখে নেওয়া প্রয়োজন।

উপনিষদের ঋষি এই সব সমস্যা সম্বন্ধেও অবহিত। তাদের গুরুত্ব কতখানি তাঁরা তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সেইজন্য দেহ-মনের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়া সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। এবং কার কি কাজ, তা ভালরকম বোঝাবার জন্য একটি যানের সহিত তার তুলনাও করেছেন। সে কালে মটর গাড়ীর প্রচলন ছিল না, প্রযুক্তি বিদ্যা এমন অগ্রসর হয়নি যাতে তা সম্ভব করে। তখন যা প্রচলিত ছিল তা অশ্বচালিত রথ। রথের সঙ্গে একাধিক অংশ সংযুক্ত হত। সেই রথের সঙ্গেই দেহ-মনের তুলনা করা হয়েছে। হয়ত মটর গাড়ীর সঙ্গে পরিচিত থাকলে উপনিষদের ঋষি আমাদের দেহ-মনকে তার সঙ্গেই তুলনা করতেন। কিন্তু তা না ক'রেই যেন ভাল হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা আরও সুন্দর হয়েছে। কেন হয়েছে, আলোচনা শেষ হলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে।

প্রশ্ন হল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ মানুষ কি ভাবে করে। কঠ উপনিষদে তার সুন্দর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ সম্পাদন হয় একটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য। সেই উদ্দেশ্যটি যেন একটি গন্তব্যস্থল। তাতে পেঁছাতে হবে কতকগুলি বিশেষ কাজের মধ্য দিয়ে। তা যেন পথ চলা। তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে একটি গন্তব্যস্থানে যেতে অশ্ব-চালিত রথের ব্যবহারের সঙ্গে। উদ্দেশ্যসাধনের পথে মানুষের দেহ-মনের যে বিভিন্ন অংশ কাজ করে, তাদের সহিত অশ্বচালিত রথের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ এই ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে :

আত্মা হল রথের আরোহীর সমস্থানীয়;
শরীর হল রথের সমস্থানীয়;
বুদ্ধি হল সারথির সমস্থানীয়;
মন (ইচ্ছাশক্তি) হল প্রগ্রহের (বল্গার) সমস্থানীয়;
আর ইন্দ্রিয়গুলি হল অশ্বের সমস্থানীয়।

বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি আর ইন্দ্রিয়, দেহ-মনের এই অংশগুলিই স্বেচ্ছা-

প্রণোদিত কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ঠিক সেই রকম, অশ্ব, সারথি এবং অশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করতে যে প্রগ্রহ থাকে, এরাই রথ চালিত করতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক বৃত্তি পরিচালিত হয়ে বিষয়ের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। অশ্বও তেমন গন্তব্য পথের আশেপাশে তৃণ, লতা, গুল্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষের বুদ্ধি শক্তি ঠিক ক'রে দেবে কোন্ পথটি সিদ্ধির বা শ্রেয়ের পথ। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রেখে ঠিক সেই পথে চালাবে ইচ্ছা-শক্তি। রথের পক্ষে সারথি পথ নির্ধারণ ক'রে দেবে এবং প্রগ্রহের সাহায্যে অশ্বগুলির গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে গন্তব্যস্থানের দিকে পরিচালিত করবে। মনে হয় তুলনাটি সত্যই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। এখন আমরা উপনিষদের বচনগুলি উদ্ধৃত করব।

কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে, "আত্মাকে রথী বলে জানবে, শরীরকে রথ বলে জানবে, বুদ্ধিকে সারথি জানবে এবং মনকে (ইচ্ছাশক্তি) প্রগ্রহ (বল্গা) বলে জানবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বিষয়গুলি তাদের আকর্ষণ করে। মনীষীরা বলেন, ভোক্তার, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন হল উপাদান।"[২৪]

ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাব গুণেই বিষয় ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যা এখনি পাওয়া যায়, যা মধুর, তার প্রতিই তাদের আকর্ষণ। তারা প্রেয়ের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু ভবিষ্যতে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে সিদ্ধিলাভ করতে হলে এই আপাতমধুর বিষয়ভোগ পরিহার করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংহত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে হবে। তাই হল শ্রেয়ের পথ। সেই পথ নির্দেশ করবে মানুষের বুদ্ধিশক্তি, আর সেই পথে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরি-চালিত করবে তার ইচ্ছাশক্তি। তবেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করবে। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে,

"যে বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং যার মন সর্বদা অসংযত থাকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সে বশে রাখতে পারে না, যেমন সারথি দুষ্ট অশ্বকে বশে রাখতে পারে না।"[২৫]

আরও বলা হয়েছে, "যে বুদ্ধি শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, এবং যার মন

---

[২৪] আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু॥
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥
আত্মেন্দ্রিয়-মনো-যুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
কঠ॥ ১॥ ৩॥ ৩-৪

[২৫] যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা॥
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
কঠ॥ ১॥ ৩॥ ৫

সর্বদা সজাগ থাকে ইন্দ্রিয়গুলি তার বশে থাকে, যেমন ভাল অশ্ব সারথির বশে থাকে।”[২৬]

বুদ্ধি দিয়ে কল্যাণকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সেইপথে ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করতে হবে। উপনিষদে বলে, তাই হল শ্রেয় লাভের কৌশল।

---

[২৬] যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা॥
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
কঠ॥ ১॥ ৩॥ ৬

সপ্তম অধ্যায়

সমালোচনা

[উপনিষদের তিনটি মূল ভাবধারা—পরাবিদ্যায় প্রীতি, সর্বব্রহ্মবাদ, বিশ্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ। পরাবিদ্যা এখন আর মানুষের আকর্ষণের বস্তু নয়, প্রযুক্তি-বিদ্যা তার স্থান নিয়েছে। বিশ্বতানের সহিত সামঞ্জস্য রাখতে সামগ্রিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা—রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত তুলনা। সর্বব্রহ্মবাদ—শংকর ব্যতীত ব্রহ্মসূত্রের অন্য ভাষ্যকারদের সহিত তুলনা—বিজ্ঞানের সমর্থন—আনইষ্টাইনের মত—রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত তুলনা। বস্তুর প্রকৃতি জড় না চিন্ময়—যাজ্ঞবল্ক্যের মত—মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রচারিত তত্ত্ব আরও উচ্চস্তরের, আধুনিক দার্শনিক মতের সহিত তুলনা। উপনিষদের নীতি—গীতার সহিত তুলনা, কাণ্টের সহিত তুলনা, বুদ্ধের সহিত তুলনা, রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা—বর্তমান পরিস্থিতিতে তার উপযোগিতা।]

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমরা উপনিষদের মূল ভাবধারাগুলির একটি সুসংবদ্ধ চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি। উপনিষদ নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়। এক হিসাবের মতে তাদের সংখ্যা ১১২। আমাদের আলোচনার ভিত্তি হল তাদের মধ্যে মাত্র এগারখানি। তাদের আমরা কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচন ক'রে নিয়েছি। তার কারণ, আমরা প্রমাণ দ্বারা এ বিষয় সন্তুষ্ট হতে পেরেছি যে হয় তারা বেদের সংহিতার বা আরণ্যকের অংশ বা তাদের সমসাময়িক এবং অনুরূপ ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারাই আমাদের মতে প্রকৃত প্রাচীন উপনিষদ। এখন উপনিষদের দর্শনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পেয়েছি তাদের আলোচনা করবার সময় এসেছে। দার্শনিক উপলব্ধি বা তত্ত্ব হিসাবে তাদের উৎকর্ষ কতখানি? অন্য সমস্থানীয় দর্শনের সঙ্গে তাদের কতখানি তুলনা চলে? এই সকল আনুষঙ্গিক প্রশ্নের এখন উত্তর দেবার সময় হয়েছে। তার পূর্বে আমরা প্রথমে সংক্ষেপে উপনিষদের মূল ভাবধারাগুলি বর্ণনা ক'রে যাব।

উপনিষদের প্রথম মূল ভাবধারা যা চোখে পড়ে, তা হল দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি উপনিষদের যুগের মানুষের অত্যধিক আকর্ষণ। এই দার্শনিক জ্ঞানকে অন্য জ্ঞান হতে পৃথক করবার জন্য বলা হত পরাবিদ্যা। অন্য বিদ্যাগুলি অপরা বিদ্যা। মোটামুটি যে বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে তাই হল অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর বিদ্যা। আর যে বিদ্যার ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজ নাই, যার সার্থকতা বিশ্ব সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা মাত্র, তাই হল পরাবিদ্যা, অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা। এমন

অন্য কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হন না। জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। আধুনিক কালে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের বাস্তব জীবনে বহু সুখ ও সুবিধা এনে দিয়েছে, যেমন রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্তা ইত্যাদি। এইসব দেখলে আপাতদৃষ্টিতে একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে ব্যবহারিক সুখ-সুবিধার প্রয়োজনের তাগিদেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকেরা মনোনিবেশ ক'রে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক তাঁর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তাঁর জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যই। পরে সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভিত্তি ক'রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে, এমন যন্ত্রাদি উদ্ভাবন হয়ে থাকে।

এখানে যন্ত্রাদি উদ্ভব এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ দুটি বিভিন্ন অবস্থার জিনিস। বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ হয় প্রথম অবস্থায়। তা আহৃত হলে পরে, তাকে প্রয়োগ ক'রে নানা প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগান ব্যাপারটা পরে আসে। এই সূত্রেই প্রযুক্তিবিদ্যার জন্ম। প্রথমটির সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই। অবিমিশ্র কৌতূহল নিবারণই এখানে প্রেরণা। প্রযুক্তি-বিদ্যার নিয়ন্ত্রক শক্তি নিশ্চিত মানুষের ব্যবহারিক সুবিধা। ষ্টিফেন যখন আবিষ্কার করলেন যে জল উত্তাপ পেয়ে বাষ্পের আকারে পরিণত হলে, তার স্বাভাবিক সম্প্রসারণের চেষ্টা হতে বিপুল শক্তি উৎপাদিত হয়, তখন তিনি কেবলমাত্র তাঁর জ্ঞানপিপাসাই চরিতার্থ করেছিলেন। পরবর্তী কালে ওয়াটসন যখন বাষ্পের এই ধর্মকে ভিত্তি ক'রে বাষ্পের ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন, তখন তিনি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। সেখানে যাতায়াতের সুবিধা বা যন্ত্রের সাহায্যে কল চালানর সুবিধাই হয়ে দাঁড়াল প্রেরণা।

বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যারও প্রসার হয়। কারণ, যত নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার হবে, তাকে ভিত্তি ক'রে ব্যবহারিক জীবনে নানা সুবিধার ব্যবস্থা করা তত সহজ হবে। এই কারণেই বর্তমান কালে প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। ফলে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র জীবন-যাত্রার আবশ্যকীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক এখন তাই প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চায় নিযুক্ত। খুব কম বৈজ্ঞানিক বর্তমান কালে অবিমিশ্র কৌতূহল নিবারণের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করেন। বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলিও এই প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণাকেই বেশী উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কর্কট রোগের কারণ কি তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। রোগের কারণ নির্ধারিত না হলে তার চিকিৎসাও সম্ভব নয়। অথচ কর্কট রোগে মৃত্যুর হার দিন দিন বর্ধিত হয়ে চলেছে। তাই পৃথিবীর নানা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এ বিষয় গবেষণার জন্য বহু বৈজ্ঞানিককে নিয়োগ করেছেন। এটি হল ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে তথ্য অন্বেষণের উদাহরণ।

কি যাকে আমরা ধর্মগ্রন্থ বলে গণনা করি, সেই ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদকেও অপরা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার কারণ, যা ধর্মগ্রন্থ তার একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে। সেই কারণে তা পরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এর থেকেই বোঝা যায় দার্শনিক জ্ঞানকে সে কালের মানুষ কত বেশী মূল্য দিত। তাদের ধারণা ছিল, সৃষ্টির মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে মানুষের যা কৌতূহল নিবারণ করে তাই হল সবার থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ। মানুষকে এই সম্পদই তৃপ্তি দিতে পারে, অন্য কোনো সম্পদ পারে না। এক দিকে পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য আর অন্য দিকে যদি পরাবিদ্যা রাখা যায়, তা হলে সে কালের মানুষ সেই ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান ক'রে পরাবিদ্যাকেই বরণ করত। যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী তাই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বৈষয়িক সম্পদ মানুষকে কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না।

বাস্তবিক বলতে কি জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের আকর্ষণ মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। শিশুর ব্যবহারে তা বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। শিশু একটু বড় হলে চারিপাশে চেয়ে দেখে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। বিশ্বের যা কিছু সংবাদ তার ইন্দ্রিয়গুলির দ্বার দিয়ে তার মনে প্রবেশ করে, তাই তার কাছে নূতন বিস্ময়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াও তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। সেই বিস্ময় হতেই তার কৌতূহল জাগে তাদের সম্বন্ধে ভাল রকম পরিচয় পেতে। তাই সে তার মাকে, তার বাবাকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। এই কৌতূহল বড় হলে একটু স্তিমিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মনে তা জাগরূক থাকে। এই ধরনের মানুষই ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হয়। তার শৈশবের কৌতূহল যৌবনেও সতেজ থাকে। তাই যে ক্ষেত্রে, যে বিষয়ে তার কৌতূহল, সে বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা হতেই বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়। যে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে কৌতূহল পোষণ করে, সে দার্শনিক আলোচনায় আকৃষ্ট হয়। এই কৌতূহলই বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রগতির মূলে রয়েছে।

এই সম্পর্কে আইনষ্টাইনের একটি উক্তি আমরা উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি এই প্রতিপাদ্যটি সমর্থন করেন মনে হয়। তিনি বলেছেন,

"যেমন জ্ঞানের জন্য একটা আকর্ষণ থাকে তেমন জানাবার জন্যও একটা আকর্ষণ থাকে। এই জানবার নেশা বালক-বালিকাদের সাধারণ ধর্ম কিন্তু পরের জীবনে বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে যায়। এই জানবার নেশা ব্যতীত না জন্মাত অঙ্কশাস্ত্র, না বিজ্ঞান।"[১]

বাস্তবিক কৌতূহল হতেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার হয়। বৈজ্ঞানিক যখন তত্ত্বজ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সাধনা করেন তখন অবিমিশ্র জ্ঞান আহরণ ব্যতীত

[১] Einstein—Ideas and opinions, p. 341.

(২) উপনিষদের দ্বিতীয় মূল ভাবধারা হল তার সর্বেশ্বরবাদ। তা বলে আমরা যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের বিচিত্র জগৎ দেখি তা একই সত্তার প্রকাশ। সেই সত্তা এই দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে অপ্রকাশ থেকে ক্রিয়াশীল, তাকে বিশেষরূপে কোথাও পাওয়া যায় না। সকল বস্তু, সকল জীব, সকল জগৎ, সব কিছু জড়িয়ে তার প্রকাশ। তাই জন্য তার নাম ব্রহ্ম দেওয়া হয়েছে, বা ভূমা দেওয়া হয়েছে, কারণ,, তার বিস্তার ত সব কিছু ব্যেপে। মূলত তিনি যদিও এক, তিনি বহুরূপে প্রকাশ নেন, কারণ, তা না হলে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না। এই বিশ্ব জুড়ে তাই তিনি বহু ও বিচিত্রের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে, এখানে জন্ম আছে মৃত্যু আছে, এখানে ভাঙা আছে গড়া আছে। এদের সকলকে জড়িয়ে নিয়েই তাঁর প্রকাশ। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি ধরা পড়ে না যে। ব্রহ্মের তাই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত ও বিচিত্রিত বিশ্বরূপে যে প্রকাশ তাকে উপনিষদে 'আনন্দরূপমৃতম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন প্রথম প্রশ্ন এসে পড়ে মূল প্রাচীন উপনিষদগুলি হতে আমরা বিক্ষিপ্ত বচন সংগ্রহ ক'রে এই যে উপনিষদের দর্শনখানি গড়ে তুলেছি তার সঙ্গে বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা কতখানি মেলে। এ বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা ইতিপূর্বে আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি। এই বিভিন্ন ভাষ্যগুলি উপনিষদের দর্শনকে তাদের বচন হতে সোজাসুজি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে নি। তারা সোজাসুজি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থের অস্পষ্টতাহেতু এই বিভিন্ন ভাষ্যে, ভাষ্যকারের নিজস্ব ভাবনা ও ধারণা খুব বেশী রকম প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে আমরা যা পাই তা ততটা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা নয় যতটা ভাষ্যকারের নিজের দার্শনিক মত। এখানে উপনিষদের বচন হতে সোজা সংগ্রহ ক'রে যে মূল দর্শনখানি পাই তার সঙ্গে সেই মতগুলি কতখানি মেলে বা মেলে না দেখে নেওয়া যেতে পারে। সেই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাটিরও মূল্য খানিকটা নির্ণয় হতে পারে।

যাঁরা ব্রহ্মসূত্রের ওপর ভাষ্য লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শঙ্করাচার্য প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। তিনি ব্রহ্মসূত্রের ওপর লিখিত তাঁর ভাষ্যে যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন তার সমর্থনে এগারখানি প্রাচীন উপনিষদের ওপর ভাষ্য লিখেছেন। তাই তাঁর মত বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। সেই কারণে তাঁর প্রতিপাদ্য মায়াবাদ সম্পর্কে আমরা একটি সমগ্র অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি। সে ক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে অবশিষ্ট চারটি ভাষ্য সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই চারটি ভাষ্য লিখেছেন রামানুজ, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য ও নিম্বার্ক। আমরা এবার তাঁদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

সেই রকম রাষ্ট্রও বর্তমান কালে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণায় পক্ষপাত দেখায় বেশী। প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তারের ফলে প্রকৃতির বক্ষে লুকান নানা শক্তি আজ মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। অথচ একদিকে যেমন শক্তি পরিবর্ধিত হয়েছে, সেই অনুপাতে মানুষের নৈতিক আদর্শের পরিবর্তন হয় নি। ফলে বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলি কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের মধ্যে আদর্শগত বিভেদ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করেছে। সেই কারণেই কেউ অপরের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না। সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক শক্তি আহরণে তারা উদ্‌গ্রীব। তাই এই পথে গবেষণা পূর্ণ উদ্যমে চলেছে। দেশের যত পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌ এখন সরকারের তত্ত্বাবধানে এই কাজে নিযুক্ত। বর্তমানকালে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইভাবে জ্ঞান আহরণের জন্য গবেষণা চলেছে। তার ফলে মনে হয় মানুষের স্বাভাবিক মৌলিক জিজ্ঞাসাবৃত্তি চাপে পড়ে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানকালে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনও অসম্ভব রকম পরিবর্ধিত হয়েছে। জীবনযাত্রা প্রণালী আর সরল নেই। সেই ক্রমবর্ধমান ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনের জন্যও ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছে। সেটা মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর কিনা, সন্দেহের বিষয়। সহজাত কৌতূহল বৃত্তিই মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য যে উদ্যম, তার মূল প্রেরণা ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে এখন আর তা নাই। এর ফলে ভবিষ্যতে মৌলিক দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা সংকুচিত হয়ে পড়বে মনে হয়।

তা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণের কোনো কারণ নাই। জানবার ইচ্ছা মানুষের মৌলিক বৃত্তি এবং সেই বৃত্তি এখনও শৈশবে বিশেষ প্রকট থাকে। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে তা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে থাকলেও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নি। তা না হলে বিভিন্ন জাতি এখনও মহাকাশের অভ্যন্তর দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য উৎসুক হয় কেন? সুদূর মহাকাশে সৌরজগৎ হতে লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসরের দূরত্বে যে অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রলোক আছে, তার বিষয় জ্ঞান আহরণ করলে মানুষের কোনো ব্যবহারিক সুবিধা নেই। তবু বর্তমানকালেও সে সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করতে মানুষ সমানই উৎসুক হয়। তাই মহাকাশের গভীরতম দেশের সহিত পরিচয় লাভের জন্য মানুষ যতখানি সম্ভব শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র এখনো নির্মাণ করে। সম্প্রতি মার্কিন দেশে পালোমার গিরিশিখরে একটি নূতন অবেক্ষণাগার নির্মাণ হয়েছে, যার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির কাচের ব্যাস হল ২০০ ইঞ্চি! তা লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত নূতন নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে খবর দেবার ক্ষমতা রাখে।

রামানুজ তিনটি বিভিন্ন সত্তা দিয়ে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেন, পরমাত্মা, জীবাত্মা ও জড় প্রকৃতি। তাঁর মতে জীবাত্মা ও জড় প্রকৃতি কেহই মায়া নয়। তারাও সত্য। তারা চোখে দেখার ভুল নয়, তাদেরও পারমার্থিক সত্তা আছে, তবে তারা ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ। বাস্তবিক বলতে তারা ব্রহ্মের দেহ ও গুণ-স্বরূপ; কাজেই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে তাদের সত্তা কখনো সম্ভব নয়। জীবাত্মার নিকট যেমন দেহ, ব্রহ্মের সঙ্গে জড় জগতের সম্বন্ধও সেইরূপ। সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা তিনি রক্ষা করেন, কিন্তু শঙ্কর হতে স্বতন্ত্রভাবে। শঙ্কর জীব ও জড় জগতের পারমার্থিক সত্তা একেবারেই মানতে প্রস্তুত নন, তিনি তাদের ভ্রান্ত অনুভূতির ফল বলে ব্যাখ্যা করেন। রামানুজ তাদের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন এবং তাদের ব্রহ্মের অঙ্গরূপে কল্পনা করেন। সুতরাং, তাঁর মতে ব্রহ্ম সোজাসুজি এক নন, তিনি বহুকে জড়িয়ে এক, তিনি আপাতদৃষ্টিতে এক নন, তিনি সমষ্টিরূপে এক।

তিনি স্বীকার করেন যে বাস্তব জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণই ব্রহ্ম। বাস্তব জগৎ হল ব্রহ্মেরই পরিণাম। সূক্ষ্ম অবস্থায় যা ব্রহ্ম, স্থূল অবস্থায় পরিণামে তাই জড় ও জীবের জগতে পরিণত হয়। তিনি তাই বলেন,

"চিৎ ও অচিৎ সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকলে আমরা বলি ব্রহ্ম এখানে কারণ স্বরূপ; আবার সেই ব্রহ্মই চিৎ ও অচিৎরূপে স্থূল অবস্থায় প্রকাশ নিলে আমরা তাঁকে কার্য বলে নির্দেশ ক'রে থাকি।"[২]

জীবাত্মাকে তিনি পরমাত্মার মতই পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট বলে স্বীকার করেন। পরমাত্মার সঙ্গে তাদের পার্থক্য হল এই যে তাদের জড় প্রকৃতিকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি নেই। স্বভাবেও তারা ব্রহ্মেরই অনুরূপ এবং চিৎ শক্তিবিশিষ্ট। জড় প্রকৃতিরও তাঁর মতে বিশিষ্ট সত্তা আছে এবং তাও ব্রহ্মের মতই পারমার্থিকভাবে সত্য। তবে ব্রহ্মকে অবলম্বন ক'রে এবং ব্রহ্মের অংশ হিসাবেই তাদের স্থিতি।

সুতরাং তাঁর মতে ব্রহ্ম অবিমিশ্রভাবে এক নন। তাঁর মধ্যে ভেদ আছে, বিভাগ আছে। তিনি ভেদকে গ্রহণ ক'রে এক। তাঁর মতে ব্রহ্মের মধ্যেই প্রকৃতিগত ভেদ আছে এবং তিনি জড় ও জীবকে গ্রহণ ক'রে এক। তাই তাঁর মতে ব্রহ্ম হলেন 'চিদ্-অচিদ্ বিশিষ্ট', তাঁর মধ্যে চেতনও আছে জড়ও আছে। জড় ও জীবের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা স্বাভাবিক এবং 'সনাতন'।[৩] তা নিত্য বর্তমান। জীব, জড় জগত এবং ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক হিসাবে বিভিন্ন এবং এক নয়, তিন। কারণ, তাদের এই ভিন্নতা স্বাভাবিক। অন্যপক্ষে তারা অভিন্ন এবং এক, কারণ তাদের মধ্যে ঐক্যও আছে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক

---

[২] রামানুজ ভাষ্য॥ ২॥ ১॥ ১৫
[৩] রামানুজ ভাষ্য॥ ২॥ ১॥ ১৫

'প্রকার বিশিষ্ট প্রকারীর'। এখানে একত্ব মানে জীব ও জড় সত্তার লোপ নয়, তাদের অভিন্ন স্থিতি।

মাধবাচার্য অদ্বৈতবাদকে একেবারেই সোজাসুজি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন সত্তার রূপ স্বভাবত বহু, এক নয়। তবে এই বহুকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ব্রহ্ম, জীব ও জড়বস্তু। এরা প্রত্যেকেই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলেন অনেকগুলি গুণের আধার। সেই গুণগুলির প্রধান হল এই আটটি : সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বিশ্বনিয়ন্ত্রণ, জ্ঞানপ্রদান, আত্মপ্রকাশ এবং জীবাত্মাদের সত্যজ্ঞান দান ক'রে মুক্তিলাভে সাহায্য করা। তিনি সকল আনন্দ এবং সকল জ্ঞানের আধার। মাধ্ব এই ভাবে ব্রহ্মকে একেশ্বরবাদের ঈশ্বরে রূপান্তরিত করেছেন। জীবাত্মাগুলি সংখ্যায় অগণ্য। তারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিহীন এবং ঈশ্বর হতেও তারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তারা ঈশ্বরের অধীন আছে এই মাত্র। তারা ঈশ্বরের মত সর্বগুণের আধার নয়, তাদের বহু দোষ আছে এবং সেই কারণে বারবার জন্ম হতে জন্মান্তর গ্রহণ করে।

জড়ের জগতের উৎপাদক হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতিও ঈশ্বর হতে উৎপন্ন নয়, তা স্বতন্ত্র। স্বভাবত তা ঈশ্বরের প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ ঈশ্বর হলেন সর্বপ্রকারে চিন্ময় অপরপক্ষে প্রকৃতি হল সর্বপ্রকারে জড়। তবে ঈশ্বর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাকে নানানরূপে সাজিয়ে বিভিন্ন জড় বস্তু উৎপাদন করেন। সুতরাং তাঁর মতে ব্রহ্ম কিছুতেই বিশ্বের উপাদান কারণ হতে পারেন না, তিনি কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতির কাছ হতে উপাদান নিয়ে তিনি তাকে বিভিন্নরূপ দিয়ে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করেন, যেমন মাটিকে উপাদান ক'রে কুম্ভকার বিভিন্ন মৃৎপাত্র নির্মাণ করে।

মাধ্বের মতে তা হলে বিশ্ব তিন জাতীয় বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি। তাতে আছে অসংখ্য জীবাত্মা, অসংখ্য জড়বস্তু নিয়ে গঠিত প্রকৃতি এবং সর্বোপরি তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আছেন ঈশ্বর। তারা এক নয়, তারা বহু। তারা শুধু বহু নয়, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিবলে অপর দুই পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের প্রয়োজন মত পরিচালিত করেন। তিনি শাসকমাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম এখানে একেশ্বরবাদের ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন।

(৩) বল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্ম সৃষ্টির নিমিত্ত কারণও বটে উপাদান কারণও বটে। তাঁর মতে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এবং তিনি সর্বত্র অধিষ্ঠান করেন। মোট কথায় তিনি সর্বেশ্বরবাদের পরিপোষক। তিনি বলেছেন সকল বস্তুকে জড়িয়ে নিয়েই ব্রহ্ম প্রকাশ হয়েছেন। ব্রহ্মের বাহিরে কিছু নেই, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি জড়েও আছেন, জীবেও আছেন, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে আছেন।

জীবাত্মা তাঁর মতে ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়, ব্রহ্মের মধ্যেই তার অবস্থিতি, তবে তা ব্রহ্মের অংশস্বরূপ। স্ফুলিঙ্গ যে হিসাবে অগ্নিরই অংশ, জীবাত্মাগুলিও

সেই হিসাবে ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্মেরই তারা রূপবিশেষ মাত্র, তবে তাদের মধ্যে আনন্দত্বের গুণ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। অণুর মত তাদের পরিমাণ, কিন্তু তারা সমগ্র দেহে বিরাজ করবার ক্ষমতা রাখে। যেমন চন্দন কাষ্ঠের গন্ধ বহুদূর পর্যন্ত নিজেকে ছড়িয়ে রাখতে পারে।

জড় জগতও এইরূপে ব্রহ্মেরই অংশ। এখানে আনন্দশক্তি এবং চিৎশক্তি, ব্রহ্মের এই উভয় শক্তিই ঢাকা পড়ে গেছে এবং কেবল মাত্র তার সত্তা বজায় আছে। সেই কারণেই জড় জগত জড় বলে প্রতীয়মান হয়। তারও ব্রহ্ম উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। "বিশেষ সৃষ্টি ও প্রলয় মানে আর কিছুই নয়, ব্রহ্মের এই বিভিন্ন আকারে আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র। ব্রহ্ম যখন ভোগ্য-বস্তু রূপে আবির্ভূত হন, তখনই বিশেষ সৃষ্টি হয়। আর যখন কারণরূপে তিনি তিরোহিত হন এবং সাধারণ অনুভূতির বিষয়ীভূত আর থাকেন না, তখনই বিশ্বের লয় হয়।"[৪]

ব্রহ্ম সনাতন, সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর তিনটি প্রধান গুণ আছে। তা হল সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। ব্রহ্ম নিজের ইচ্ছামতই সৃষ্টি ভাঙেন বা গড়েন। তার মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য রসোপলব্ধি। যেমন আমরা খেলা ক'রে বা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে সুখ পেয়ে থাকি। যখন সৃষ্টি রূপে ব্রহ্ম প্রকাশ নেন, তখন তাঁর প্রকৃতির মূলত কোনো পরিবর্তন হয় না; কেবল রূপের পার্থক্য হয়, যেমন সাপ পাকানো অবস্থায় এক রকম দেখায়, আবার পাক খুললে ভিন্ন রকম দেখায়।

সুতরাং ব্রহ্ম, জীব ও জড়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা একত্বের সম্বন্ধ। শঙ্করও তাদের ওপর একত্বের সম্বন্ধ আরোপ করেন, তবে তা স্বতন্ত্র ধরনের। তিনি বলেন জীবও জড়ের জগত ও ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত তাদের কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই, দেখার ভুলে তাদের জীব ও জগত রূপে দেখি। রজ্জুকে যখন সর্প বলে ভ্রম করি, তখনও তা রজ্জুই থাকে। বল্লভাচার্য যে একত্ব আরোপ করেন তার মধ্যে ভুল দেখবার কোনো কথা ওঠে না। তিনি যে একত্ব আরোপ করেন তা অংশ ও অংশীর একত্ব, অঙ্গ ও অঙ্গীর একত্ব। দেহের অংশ হিসাবে কোনো বিশেষ অঙ্গ দেহের সঙ্গে এক। এও তেমনি। ব্রহ্ম হলেন সর্বব্যাপী। জড় জগত এবং জীব তাঁরই অংশ এবং অংশ হিসাবে তারা প্রকৃতিতে এবং অন্য সব বিষয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একেবারেই এক। উপ-নিষদের বচন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থে সহজ সরল ভাবে যা বুঝি বল্লভাচার্য সেই অর্থই সোজাসুজি মেনে নিয়েছেন।

(৪) সর্বশেষে আমরা নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত আলোচনা করব। নিম্বার্কের মতের সঙ্গে মাধ্বের মতের কিছু মিল পাওয়া যায়। তিনিও বহু ও নানাকে সত্য

৪ Ghate, Vedanta, p. 36.

বলে গ্রহণ করেন। মূলত তিন শ্রেণীর স্বতন্ত্র পদার্থের কথা তিনিও স্বীকার করেন। তা হল চিৎ অর্থাৎ জীবাত্মা সমুদয়, অচিৎ অর্থাৎ জড় বস্তু সমুদয় এবং ঈশ্বর।

জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য হল তা জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর মতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞান উভয়ই এই জীবাত্মা হতে উদ্ভূত। সূর্য যেমন আলোকও বটে, সকল আলোকের আধারও বটে, এও তেমনি। এই জীবাত্মাগুলি অহংজ্ঞানযুক্ত, অর্থাৎ তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে তারা অনুভব করে। এই অহং জ্ঞান সকল অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এমন কি মুক্ত অবস্থাতেও এই অহং জ্ঞানের খন্ডন হয় না। তাদের আরও দুটি গুণ আছে। তারা কর্ম করতে অধিকারী এবং তাদের ভোগ করবার সামর্থ্য আছে। তাদের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুই গুণই বর্তমান। তারা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্য তাদের তৃতীয় গুণ হল তাদের নিয়াম্যত্ব।

জড় পদার্থগুলিকেও তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীতে আসে অবাস্তব জড় বস্তু, যেমন ঈশ্বরের জ্যোতি, তাঁর আবাসস্থান, তাঁর ভূষণ ইত্যাদি। এরা অবাস্তব বলে তিনি তাদের অপ্রাকৃত এই নামকরণ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে বাস্তব জগতের যত কিছু জড় পদার্থ আছে। তারা প্রকৃতি বলতে যা বুঝায় তাই এবং সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তৃতীয়ত আছে কাল। তা সত্য, তা তাঁর মতে একটি পদার্থ, তবে তা চিৎশক্তি বিশিষ্ট নয়।

সবার উপরে আছেন পরমাত্মা। ইনিই হলেন তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ সর্ববিষয়ে নির্দোষ এবং সকল সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ। ইনি যুগে যুগে, কালে কালে, প্রয়োজন হলে মানুষ রূপেও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তিনি "জগতের নিমিত্ত কারণও বটেন, উপাদান কারণও বটেন। ইনি এই হিসাবে উপাদান কারণ যে তাঁর সূক্ষ্ম অবস্থায় বর্তমান স্বাভাবিক চিৎ শক্তি ও অচিৎ শক্তিকে স্থূল অবস্থায় প্রকাশ হতে দেন। আর তিনি এই হিসাবে নিমিত্ত কারণ যে তিনি জীবাত্মাগুলিকে তাদের কর্মফলের সঙ্গে এবং ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এই হিসাবে বিশ্বের সৃষ্টি মানে আর কিছুই নয়, যা সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিল তাকে স্থূল অবস্থায় প্রকাশ দেওয়া এবং এই কারণেই সৃষ্টি অর্থে পরিণাম।"[৫]

এই বিশ্লেষণ দেখে মনে হয় তিনি এক হিসাবে জড় ও জীবকে ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন বলেই মনে করেন। সে যাই হক, এ বিষয় কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি যে এই তিন শ্রেণীর পদার্থের পরস্পরের বিভিন্নতাকে তিনি স্বীকার ক'রে নেন। ব্রহ্মের বা কৃষ্ণের সঙ্গে জীব ও জড়ের যা সম্পর্ক তাকে তিনি দুই রূপে

---

[৫] Ghate, Vedanta, p. 30.

ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে সম্বন্ধ ভেদেরও বটে, অভেদেরও বটে। এই হিসাবে জীব ও জড় ব্রহ্ম হতে ভিন্ন, যে ব্রহ্মকে তাদের সঙ্গে এক বলে যদি নির্দেশ করি, তা হলে আর ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অদ্বিতীয় থাকেন না, তিনি সসীম হয়ে পড়েন। আবার অপর পক্ষে তারা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন এই হিসাবে যে তারা ব্রহ্মের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এবং ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম নয়। কাজেই অভিন্নতা অর্থে এখানে দাঁড়ায় স্বাবলম্বিতার অভাব, তাঁর নিজের ভাষায় 'পরতন্ত্র-সত্তা-ভাব।'

আমরা সব কটি বিভিন্ন ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখন পেয়েছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা হতে এতগুলি বিভিন্ন ধরণের মতের উৎপত্তি হয়েছে। মতগুলির মধ্যে পরস্পরের বিরোধের পরিমাণও খুব বেশী। এক প্রান্তে পাই মাধবাচার্যের মত। তিনি সম্পূর্ণ রূপে বহুবাদের পক্ষপাতী। এমন কি তিনি জীব ও জড় সম্পর্কে ব্রহ্মের উপাদান কারণত্বও স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তিনি অদ্বৈতবাদেরই বিরোধী।

নিম্বার্কের মতের সহিত তাঁর মতের খানিক সাদৃশ্য দেখা যায়। নিম্বার্ক মাধবাচার্যের মত এক পক্ষে বহুকে মানেন, কিন্তু অপর পক্ষে ব্রহ্ম যে তাদের উপাদান কারণ, সেকথাও স্বীকার করেন। তিনিও মাধ্বের মত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং ব্রহ্মকে অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ রূপে কল্পনা করেছেন। তিনি মূলত বহুবাদকেই প্রাধান্য দেন বেশী, অথচ ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব স্বীকার ক'রে জীব, জড় জগত ও ব্রহ্মের মধ্যে একরকম একত্বের সম্বন্ধও আরোপ করেন। তিনি বহুবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও একত্বের দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই কারণে নিম্বার্কের মতকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হয়ে থাকে।

অপর পক্ষে শঙ্কর, রামানুজ ও বল্লভাচার্যের মতগুলিকে আমরা এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। কারণ, তাঁরা মোটামুটি একত্বের উপর বা অদ্বৈত-বাদের উপরই প্রাধান্য দেন বেশী। তাঁদের তিন জনেরই মতে ব্রহ্ম সমস্ত বিশ্বের নিমিত্ত কারণও বটেন, উপাদান কারণও বটেন। কিন্তু তাঁদের মতের পার্থক্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যে নানা বস্তু ও জীব দেখি তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে। এই যে বিশ্বকে আমরা অনুভব করি তা একক পদার্থ, না বহু বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি। তাঁদের পরস্পরের মতের পার্থক্য এই প্রশ্নটি সম্পর্কে তাঁরা যে উত্তর দিয়েছেন, তা হতে পরিষ্কার হয়ে যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বহুর দাবীকে আংশিকভাবে স্বীকার করেছেন, কেউ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এক পক্ষে তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে এই বিশ্ব একই মৌলিক পদার্থ হতে উৎপন্ন হয়েছে। তবে সেই এক মৌলিক পদার্থ নিরন্তর সকল অবস্থাতেই এক কিনা, সেই নিয়ে তাঁদের মতদ্বৈধ আছে। শঙ্কর বলেন সেই মৌলিক পদার্থ সকল অবস্থাতেই অবিমিশ্র ভাবে এক, তা একমাত্র, দ্বিতীয়বিহীন। যখন তাকে আমরা বহুর আকারে দেখি তাকে ভুল দেখি এবং এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী মায়া।

এই হিসাবে দেখতে গেলে, কেবল মাত্র একের দাবীকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে তিনি বহুর দাবীকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই কারণে শঙ্করের মতকে কেবল অদ্বৈতবাদ বলা হয়েছে।

রামানুজও একের দাবীকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বহুর দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি জীব ও জড়কে ব্রহ্মের অংশ বিশেষ বলে কল্পনা করেছেন এবং ব্রহ্মের নিজের মধ্যে এই যে বিভাগ তাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সনাতন বলে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে ব্রহ্ম একই বটেন, কিন্তু বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এক। কাজেই তিনি অবিমিশ্রভাবে অদ্বৈত-বাদকে গ্রহণ করেন নি, অদ্বৈতবাদকে তিনি বহুদ্বারা বিশিষ্ট ক'রে গ্রহণ করেছেন। এই কারণে তাঁর মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়ে থাকে। অদ্বৈতবাদ এখানে বহুর দাবীকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

অপর পক্ষে বল্লভাচার্যও রামানুজের মত বহুর দাবীকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন নি। তবে রামানুজের মত জীব ও জড়কে ব্রহ্মের সনাতন অংশ বলে কোনো সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নি। তাঁর মতে তারাও ব্রহ্মের অংশ, যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, যেমন অসংখ্য ঢেউ সাগরের অংশ, যেমন অগণ্য শিখা আগুনের অংশ। তিনি বলেন এই দৃশ্যমান জগত ব্রহ্মেরই রূপ, ব্রহ্ম এই রূপেই প্রকাশ হয়েছেন। আমরা বিশ্বকে যে রূপে দেখি সেই রূপই এর আসল রূপ, এ দেখায় কোনো ভ্রান্তি জড়িত নেই, এ দেখায় কোনো মায়ার খেলা নেই। তিনি মায়াবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। একের দাবীকে তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তা অবিমিশ্র দ্বিতীয়বিহীন একত্ব নয়। তাঁর মতে বহু আছে বটে, কিন্তু এই বহুত্ব ব্রহ্মের মৌলিক বা স্বাভাবিক ভেদ নয়। যে কোনো বিরাট বস্তুকে আমরা বিশ্লেষণ ক'রে বহু অংশ পেতে পারি। মনের দ্বারা বিশ্লেষণ ক'রে আমরা এই ভাবে ব্রহ্মের একত্বের মধ্যেও বহুর আবিষ্কার করতে পারি। এখানে একও সত্য, বহুও সত্য, এই বহু একেরই অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং শঙ্করের সহিত তাঁর মতের দুটি বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম, বহুকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন। শঙ্কর কিন্তু বহুর অস্তিত্ব কোনো মতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। দ্বিতীয়ত, শঙ্কর ঠিক সেই কারণে এই দৃশ্যমান বহুর জগতকে মায়ার রচনা বলে প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করেছেন। অপর পক্ষে বল্লভাচার্য এই ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বের বহুত্বকে সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন, মায়াবাদকে তিনি গ্রহণ করেন নি। মায়াবাদকে বর্জন ক'রে তিনি অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর মতকে বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদ বলা হয়ে থাকে।

ওপরের এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে যে এই পাঁচটি দর্শনের মধ্যে মতের অনৈক্যের দিক থেকে দেখতে গেলে চার জন ভাষ্যকারের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায়। তার এক দিকে আছেন নিম্বার্ক, মাধ্ব ও রামানুজ

বলে যে মূলত সৃষ্টি এক, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা বহুর রূপ নেয়। সৃষ্টি ঠিক বহুও নয়, একও নয়। বহুকে গ্রহণ ক'রে তা এক। তা জটিল-ভাবে এক, যেমন চিনির কলের কারখানা জটিলভাবে এক। এখন এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ কতখানি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় এসেছে।

শংকর যে মতের পরিপোষক তাকে আমরা বিশুদ্ধ একবাদ বলতে পারি। কারণ, তা বহুর দাবীকে আদৌ স্বীকার করে না, কেবল মাত্র একের দাবীকেই গ্রহণ করে। তিনি বলেন বিশ্ব কেবল মাত্র একটি সত্তা দিয়ে গঠিত। এই সত্তা জটিলভাবে এক নয়, এর মধ্যে বহুর কোনো স্থান নেই। কিন্তু বহুকে ত সোজাসুজি এমনভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জগতের মধ্যে বহু ও নানা যে আছে তা ত অস্বীকার করা যায় না। এমন কি শংকরও ঠিক তা অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বহু ও নানাকে একেবারে অসৎ বলতে পারেন নি, তাকে সদসৎ বলেছেন। অর্থাৎ তারা আছে আবার ঠিক নেইও। এইভাবে তারা আছে যে তারা সম্পূর্ণ অলীক নয়, কারণ ব্রহ্মই তাদের ভিত্তি। স্বপ্নের জগতকে যেমন সম্পূর্ণ অলীক বলে উড়িয়ে দিতে পারি একে তা পারি না। তারা নেই এই অর্থে যে তাদের যে পরিচয় আমাদের ইন্দ্রিয় এনে দেয়, তা ভুল পরিচয়। কিন্তু ভুল পরিচয় বলে সত্যই কি তাদের অস্বীকার করা যায়?

যে কোনো বস্তুর প্রকৃতি হল এই যে তা নিজেকে সরল হতে জটিল আকারে পরিণত ক'রে প্রগতি বা বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। জীবজগতে অতি সূক্ষ্ম জীব হল প্রোটোজোয়া, তা মাত্র একটি কোষবিশিষ্ট। তাই অবিমিশ্রভাবে তা এক। তা জটিলভাবে এক নয়। কিন্তু সেই কারণেই তার জীবনশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে মানুষের মধ্যে আমরা পাই জীবন-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ এবং সেই কারণেই মানুষের দেহ অত্যন্ত জটিল। মানুষের দেহে কত কোটি কোষ। সেই কোষগুলির কত শ্রেণীবিভাগ। তাদের দিয়ে কত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়ে উঠেছে। সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রত্যেকেরই কাজ স্বতন্ত্র। অথচ যে প্রাণের দেহ প্রকট রূপ তা একই। প্রাণশক্তির বিকাশের জন্যই দেহের জটিলতা গ্রহণ। তার অগণিত অংশ আছে। তাই বলে তা বহুধা বিভক্ত নয়, তা নানা কোষের গাণিতিক সমষ্টি মাত্র নয়। তাদের মধ্যে ঐক্য আছে, সংহতি আছে, পারস্পরিক সামঞ্জস্য আছে, যা দেহকে সামগ্রিকরূপে একত্ব গুণবিশিষ্ট করে।

কোনো বস্তুকে ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজ করতে হলে আর তার জটিলতা পরিহার করা চলে না, তার বিশুদ্ধভাবে এক থাকা চলে না। বিকাশের জন্য, সার্থক হবার জন্য তার জটিল হতে জটিলতর হতে হয়: তার নিজের মধ্যেই নানা ভাগ ও বিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে বিকাশে সাফল্যের জন্যই, যে কোনো বস্তুকে অবিমিশ্র একত্ব পরিহার ক'রে নিজেকে বিখণ্ডিত করতে হয়, তার বহু হতে হয়। কিন্তু এই বহু হওয়া ও বহুবাদীর বহুত্বের মধ্যে অনেক

এবং অপর দিকে আছেন শঙ্করাচার্য। নিম্বার্ক, মাধ্ব এবং রামানুজ বহু-বাদের সমর্থক, তাঁরা ব্রহ্মকে এক মাত্র এবং অদ্বিতীয় সত্তা বলে গ্রহণ করেন না। সেই কারণেই তাঁদের বিশেষ বিরোধ এসে পড়ে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার সঙ্গে। তিনি বিশুদ্ধ একবাদের পক্ষপাতী। তাঁর মতে ব্রহ্ম একমাত্র এবং অদ্বিতীয় সত্তা, সঙ্গে অন্য সত্তার সহাবস্থিতি নেই। সৃষ্টির গঠন কিরূপ, তা বহু না এক সত্তাদ্বারা গঠিত? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সৃষ্টি একটি-মাত্র সত্তাদ্বারা গঠিত এবং সেই সত্তা হলেন ব্রহ্ম। তিনি বহুকে গ্রহণ ক'রে এক নয়, তিনি নিরন্তরই এক, বহু বা নানা কিছু নেই, তা দেখার ভুল। তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধরূপে একবাদী। এই অর্থে তাঁকে আমরা বিশুদ্ধরূপে একবাদী বলতে পারি। এই কারণে শঙ্করের ব্যাখ্যাকে অন্য কোনো ব্যাখ্যার সহিত শ্রেণীভুক্ত করতে পারি না। তাঁর মত নিজেই একটি নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করে।

রামানুজ প্রভৃতির মত এবং শঙ্করের অবিমিশ্র একবাদের মধ্যে পার্থক্য এইভাবে অত্যন্ত বেশী। তাদের পরস্পরবিরোধী মত বলে বর্ণনা করা যায়। একপক্ষে শঙ্কর যেমন একটি মাত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তেমন অপর তিন ভাষ্যকার ঠিক তার বিরোধী মতকে পোষণ করেন। তাঁরা বহুবাদকে গ্রহণ করেন। বল্লভাচার্যের মত এই দুই বিরোধী শ্রেণীর মতের মাঝামাঝি। তিনি যেন এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্য এনে একটি পূর্ণতর মত স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে জীবও ব্রহ্ম জড়ও ব্রহ্ম, সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নেই, ব্রহ্ম হতে পৃথকও কিছু নেই। বহু ও নানারূপে বিরাজমান জীবও জড়ের জগত কল্পনা নয়, মায়ার রচনা নয়, তারাও ব্রহ্মের সত্য প্রকাশ। একই সত্তা, একই সর্বব্যাপী শক্তি আমাদের কাছে বহু ও নানারূপে প্রকাশ নিচ্ছেন। এই হিসাবে তিনি সর্বেশ্বরবাদের পরিপোষক হয়ে পড়েন। একদিকে বহুবাদের দাবীকে তিনি স্বীকার করেন, অপরদিকে একবাদের দাবীকেও তিনি গ্রহণ করেন। শঙ্কর একেকে গ্রহণ ক'রে বহুকে বর্জন করেছেন। তিনি তা করেন নি। রামানুজ প্রভৃতি একেকে পরিহার ক'রে বহুকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাও করেন নি। তিনি শঙ্করের একবাদকেও গ্রহণ করেছেন আবার বহুবাদের দাবীকেও স্বীকার করেছেন। এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য এনে তিনি একটি পূর্ণতর মতের স্থাপনা করেছেন।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে উপনিষদের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা সব থেকে বেশী মিল পাই বল্লভাচার্যের ব্যাখ্যার সহিত। অন্তত একজন ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার মধ্যে যে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন আছে তা বিশেষ তৃপ্তির কারণ। উপনিষদের মূল চিন্তাধারা যে সর্বেশ্বরবাদী এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে ঠিক গ্রহণ করে না, এ বিষয় পূর্বের দুটি অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সৃষ্টি এক না বহু, এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ

পার্থক্য। এখানে একই বহুকে ব্যেপে আছে, একই শক্তির একই ইচ্ছা, একই নিয়ম এখানে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বহুবাদের কল্পনায় যে বহু বস্তু বা বহু সত্তা তারা পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ও বিচ্ছিন্ন। এই বহুবাদের মতে বিশ্বের মধ্যে কোনো একত্বের যোগসূত্র পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই অবিমিশ্র বহুবাদ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। আপাত-দৃষ্টিতে বিশ্ব বহু বিশ্লিষ্ট বস্তুর গাণিতিক সমষ্টি বলে মনে হবে। কিন্তু ভাল ক'রে নজর দিয়ে দেখলে কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমরা দেখি বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, এই বহু বস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরা একটা শৃঙ্খলা পাই। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গুণ। সেই গুণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা একই নিয়মে ক্রিয়া ক'রে যায়। বিভিন্ন মৌলিক বস্তুর উপর তাপের ক্রিয়া একই। তাপ কম হলে তারা কঠিন পদার্থের রূপ গ্রহণ করে, বেশী হলে তারা তরল পদার্থ হয়, আরও বেশী হলে তারা বাষ্পীয় পদার্থের রূপ গ্রহণ করে। এইরূপ নানা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিয়মিত হয়। তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রিয়ার লক্ষণ যথেষ্ট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের বিন্যাসের কথাই ধরা যাক। জীব সেই জড় পদার্থ হতেই তার পুষ্টি সংগ্রহ করে, কিন্তু সকল জীব তা পারে না। যে শ্রেণীর জীব তা পারে তা হল উদ্ভিদ। ভূমি হতে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে তাকে দেহের পুষ্টি হিসাবে গ্রহণ করতে তারাই পারে। ফলে জড় পদার্থ জৈব পদার্থে পরিণত হয়। অন্য জীব উদ্ভিদ হতেই দেহের পুষ্টি সংগ্রহ করে। তাই প্রথম বিকাশ লাভ করে উদ্ভিদ। তারপর আসে সেই শ্রেণীর জীব যারা উদ্ভিদভোজী। যেমন গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি। তারপর আসে ব্যাঘ্রাদির মত মাংসাশী জীব। তারা খাদ্য সংগ্রহ করে উদ্ভিদভোজী জীবের দেহ হতে। এইসব বিষয় বিবেচনা করলে সন্দেহ থাকে না যে সমগ্র বিশ্বজুড়ে একই বিরাট শক্তি ব্যাপকভাবে কাজ করছে। কি সূক্ষ্মতম বস্তু, কি গ্রহনক্ষত্র বা ছায়াপথপুঞ্জ, কেহই এই ব্যাপক শক্তির গণ্ডির বাহিরে যেতে পারে না। সকলেই একই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সকলেই নির্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্তী, সকলেই ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। সুতরাং বিশুদ্ধ বহুবাদ কখনো এই মৌলিক তথ্যগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারে না।

এইভাবে দেখতে গেলে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ বা সর্বব্রহ্মবাদকে এদের থেকে পূর্ণতর দার্শনিক মত বলে গ্রহণ করা যায়। ঠিক বলতে কি বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তার এর থেকে সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে না। এখানে দ্বন্দ্ব এসে পড়ে দুই বিভিন্ন মতের। কেহ বলেন বিশ্ব কেবল মাত্র অবিমিশ্রভাবে একটি বস্তু দিয়ে গঠিত। শঙ্করের তাই মত। আবার কেহ

বলেন বিশ্ব অসংখ্য বিশ্লিষ্ট বস্তু দিয়ে গঠিত। আধুনিক বস্তুবাদের তাই মত। উপনিষদে বলে বহু বিশ্লিষ্ট বস্তু কিন্তু একই ব্যাপক সত্তার প্রকাশ। শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ একবাদকে গ্রহণ না ক'রে উপনিষদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে উপনিষদের যুগেই এইভাবে এক ও বহুর দ্বন্দ্বের একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে এতখানি পরিপক্কতা বা পূর্ণতা লাভ করতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। ঠিক বলতে কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম ইউরোপে সর্বেশ্বর-বাদ বা বহুবিশিষ্ট একবাদের জন্ম হয়। জার্মান দার্শনিক শেলিংই প্রথম উপনিষদে বর্ণিত এই তত্ত্বের সমস্থানীয় বা তুল্য মত প্রবর্তন করেন। শেলিং-এর মতে জড় এবং চেতন এই উভয় প্রকার বস্তুর ভিতরেই একই বিশ্বশক্তি নিহিত আছে। মানুষের মনে যে শক্তি কাজ করে, প্রকৃতির মধ্যেও সেই শক্তি বিরাজ করে। তাঁর মতে এই বিশ্ব একটি বিরাট সত্তার ক্রমবিকাশ মাত্র। এই সম্পর্কে দার্শনিক ইতিহাসকার থিলি তাঁর মতের যে বিবরণ দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

"পরিণত অবস্থায় শেলিং-এর দর্শন এক প্রকার সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করে যা বিশ্বকে একটি জীবন্ত, বিকাশশীল, সুগঠিত বস্তু হিসাবে কল্পনা করে। তার প্রত্যেক অঙ্গের তার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তারা সমগ্রকে শক্তি আধান করে। এই অর্থে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, পদার্থ এবং তার রূপ, মানসিক এবং বাস্তব সত্তা—সবই এক এবং অভিন্ন হয়ে যায়। একই বহু হয় এবং বহু এক হয়, যেমন কোনো দেহ হতে তার অঙ্গগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি না, কিম্বা দেহ ব্যতিরেকে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না, কিম্বা তাদের বাদ দিয়ে দেহকেও বুঝতে পারি না।"[৬]

বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে উপনিষদে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা যেমন পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সমর্থিত হয়েছে তেমন আধুনিক যুগে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সমর্থন পেয়েছে। তার কারণ, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত। উদাহরণস্বরূপ এই সম্পর্কে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের মত উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রহ নক্ষত্রের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে তিনি আপেক্ষিকবাদ প্রচার ক'রে পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। তাঁর মত মনীষীর মতেও সর্বেশ্বরবাদই বিশ্বের সব থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। তিনি বলেছেন,

"চিন্তা করতে এবং কার্যকারণের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখতে উৎসাহ দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কুসংস্কার হতে মানুষকে মুক্তি দিতে

---

৬ Thilly, History of Philosophy, p. 455.

সকল মননশীল সত্তা, সকল জ্ঞানের বস্তু
এবং সব কিছুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।”[৮]

এই গেল এমন কবির কথা যিনি বিদেশের পরিবেশে বর্ধিত। আমাদের নিজের দেশের যিনি সেরা কবি, তাঁর উপলব্ধিতে তিনি কি পেয়েছেন, কি বলেছেন? তিনিও অনুরূপ কথাই বলেছেন। তাঁর উপলব্ধিও বলে যে বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত এই বিশ্বের মধ্যেই পরম সত্তার অপ্রকট প্রকাশ। তিনি বলেছেন,

“দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব, সচেতন, বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনো কালে নূতন নহে, কোনো কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান, অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছেন।”[৯]

উপনিষদে বলে যিনি এক ছিলেন তিনি বহু হতে চাইলেন, তা না হলে তিনি আনন্দ পান না যে। তাই ত প্রকাশ হল রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ দিয়ে গড়া এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত। তা চঞ্চল, তা গতিশীল। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংঘাতে তার বিচিত্র রূপটি ফুটে উঠল। তবেই ত তাঁর আনন্দ রূপটি মূর্ত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতেও সেই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা পাই। তিনি বলেছেন,

“যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন যাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,”[১০]

---

[৮] “And I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean, and the living air,
And the blue sky, and in the mind of men,
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things.”
Tintern Abbey, Lines, 93-102

[৯] রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৪৫৭
[১০] রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, স্মরণ, পৃ ৯৬

পারে। এটা নিশ্চিত সত্য যে ধর্মবোধের অনুরূপ একটি বিশ্বাস যে বিশ্ব বুদ্ধিসম্মতভাবে গঠিত এবং মননশক্তির প্রয়োগে তাকে বোঝা যায়, উচ্চস্তরের সকল বৈজ্ঞানিক কাজে অন্তর্নিহিত আছে।

এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে জড়িত এই ধরনের একটি গভীর উপলব্ধি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে উচ্চস্তরের ধীশক্তিবিশিষ্ট একটি মন আত্মপ্রকাশ করছে, এই দুই নিয়ে ভগবান সম্বন্ধে আমার ধারণা গঠিত। সাধারণের ভাষায় তাকে সর্বেশ্বরবাদ বলে বর্ণনা করা যায়।"[৭]

সুতরাং আমরা দেখি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও সর্বেশ্বরবাদের গলায় বরমাল্য দিয়েছেন। দার্শনিকের সমর্থন পেলাম, বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পেলাম, কবি কি বলবেন? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মননশক্তির সাহায্যে বিশ্বের রূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে চান। কবির পথ কিন্তু স্বতন্ত্র। তাঁর মার্গ অনুভূতির মার্গ। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাঁর উপলব্ধিতেও কি সর্বেশ্বরবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা সৌভাগ্যক্রমে দেখি যে কবিও সেই সর্বেশ্বরবাদকেই তাঁর উপলব্ধিতে লাভ করেছেন। এই সম্পর্কে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই বিষয় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন মরমী কবি, প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির বুকে কান পেতে, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন তা নিজের ভাষায় এইভাবে বর্ণনা করেছেন,

"এবং আমি উপলব্ধি করেছি
সেই সত্তাকে, যা উচ্চতর চেতনার আনন্দে
আমাকে উদ্বেল করে; অতি গভীর ভাবে
পরিব্যাপ্ত একটি সত্তার নৈসর্গিক অনুভূতি,
যার আবাস অস্তোন্মুখ রবির রাঙা আলোয়,
গোলাকার মহাসমুদ্রে, চঞ্চল বাতাসে,
সুনীল আকাশে এবং মানুষের মনে,
এমন একটি গতিশীল অশরীরী শক্তি যা

---

[৭] "Scientific research can reduce superstition, by encouraging people to think and view things in terms of cause and effect. Certain it is that a conviction akin to religious feeling, of the rationality or intelligibility of the world, lies behind all scientific work of a high order.

This firm belief, a belief bound up with deep feeling in a superior mind that reveals itself in the world of experience, represents my conception of God. In common parlance this may be described as pantheistic."

Albert Einstein, Ideas and Opinions, Scientific Truth, p. 261.

এই সম্পর্কে প্রসঙ্গত আর একটি প্রশ্ন উপনিষদে উঠেছিল। তা হল ব্রহ্মের প্রকৃতি কি। এ বিষয় বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এক শ্রেণীর মত বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, যা বলে ব্রহ্মের প্রকৃতি হল জ্ঞাতৃ-স্বরূপ। যাজ্ঞবল্ক্য এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে কোনো অবস্থাতেই ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপ খন্ডন হয় না। আমরা জানি যেখানে দ্বৈতভাব আছে সেখানেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক থাকে। জ্ঞানের বস্তু না থাকলে জ্ঞাতা থাকবে কি করে? কিন্তু তিনি বলেন দ্বৈতভাব খন্ডিত হলেও ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপ বিনাশ হয় না। কারণ জ্ঞাতৃত্ব তাঁর প্রকৃতি, যেমন লবণের লবণ আস্বাদ প্রকৃতি। ব্রহ্মের স্বরূপ যে জ্ঞানজাতীয় পদার্থের মত, উপনিষদের অন্য বচনেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তিনি হলেন "সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত"[১১]। যাজ্ঞবল্ক্য আরও একটু এগিয়েছেন। তিনি বলেন ব্রহ্মের প্রকৃতি কেবল জ্ঞান বা চৈতন্য জাতীয় পদার্থের মত নয়, তিনি সকল অবস্থাতেই জ্ঞাতৃরূপী। কারণ তিনি বলেন, "যিনি দ্রষ্টা তাঁর দৃষ্টির বিলোপ কখনও হতে পারে না, সেই দ্রষ্টৃত্ব গুণ তাঁর অবিনাশী।"[১২] যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত শঙ্কর সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন মনে হয়। এই উক্তির সমর্থনে তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

"এই আত্মা নিত্য চৈতন্যময়।"[১৩]

তিনি আরও বলেছেন,

"যেমন আকাশে আশ্রিত জ্যোতির প্রকাশ প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে অপ্রকট থাকে, কিন্তু প্রকৃতিগত অভাব হেতু নয়, তেমনি ব্রহ্মের চৈতন্য রূপ।"

সুতরাং তাঁর মতেও যখন দ্বৈতভাব থাকে না, তখনও জ্ঞাতৃত্বরূপ খন্ডিত হয় না।

উপনিষদের এই ভাবধারার মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথম দেখা যায় যে বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যায় তার অচেতন হতে চেতন পদার্থের প্রতি পক্ষপাত বেশী, কারণ তা বলে যে অচেতনত্ব ব্রহ্মের প্রকৃতি নয়। দ্বিতীয়ত, তা মূলসত্তাকে জ্ঞাতৃরূপী বলে প্রচার করে। সুতরাং মনে হয় তা জ্ঞেয় বস্তুকে মূল সত্তার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়, তা তুলনায় নিম্ন স্তরের সত্তা হয়ে পড়ে। উভয় বৈশিষ্ট্যই মনোবাদ বা ইংরেজি পরিভাষায় যাকে 'আই-ডিয়ালিজম্' বলে তার লক্ষণ। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে প্রথমটির বিরোধ হল যাকে আমরা জড়বাদ বলি বা ইংরেজি পরিভাষায় 'মেটিরিয়ালিজম্' বলি, তার সঙ্গে। আর দ্বিতীয়টির বিরোধ হল যাকে আমরা বস্তুবাদ বা

[১১] সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ বল্লী॥ ১
[১২] ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪॥ ৩॥ ২৩
[১৩] নিত্যচৈতন্যোঽয়মাত্মা॥ শারীরক ভাষ্য॥ ২॥ ৩॥ ৯

ইংরেজি পরিভাষায় 'রিয়ালিজম্' বলি তার সঙ্গে। প্রথমটির সম্পর্ক বিশ্বের প্রকৃতি কি এই প্রশ্নের সঙ্গে। দ্বিতীয়টির সম্পর্ক জ্ঞানের বস্তুর জ্ঞাতা না থাকলেও অস্তিত্ব থাকে কি না এই প্রশ্নের সঙ্গে।

এই হিসাবে উপনিষদের এই তত্ত্বটির সঙ্গে দুই ধরনের মতের বিরোধ এসে পড়ে। যখন বলা হয় যে বিশ্বের প্রকৃতি জড় নয়, চৈতন্যস্বরূপ, তখন জড়বাদের সঙ্গে এসে পড়ে তার বিবাদ। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে মনোবাদ যেমন বিশ্বের সকল বস্তুকেই চৈতন্যময় বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জড়বাদও ঠিক তার পাল্টা মত প্রচার করে। আধুনিক জড়বাদ জড়বস্তুর সাহায্যে বিশ্বের সকল বস্তুর, এমন কি চৈতন্যময় মানবমনেরও ব্যাখ্যা করবার স্পর্ধা রাখে। তার মতে বাতি জ্বাললে যেমন অগ্নিশিখার উদ্ভব হয়, তেমন মানুষের মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে আলোড়নকে আমরা চৈতন্য বলে ভ্রম করি। দুই ভিন্ন প্রকৃতির সত্তার ব্যাখ্যায় একটির প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলে এই ধরনের বিভ্রাট ঘটে।

বিশ্বের মাঝখানে চৈতন্যময় পদার্থের আবির্ভাব দেখি আবার জড়ের আবির্ভাবও দেখি। কিন্তু যদি তাদের একটিকে উপেক্ষা ক'রে অন্যটির সাহায্যে সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয় তা হলে আমাদের আচরণ এক-দেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট হয়। তখন যেন বেশ জোর করেই যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখিয়েও অন্যের দাবীকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। একপক্ষে এমন যুক্তিও দেখান হয়ে থাকে যে জড়ের মধ্যেও চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ সম্ভব এবং প্রকৃতির মধ্যেও শৃঙ্খলা এবং মনন শক্তির প্রয়োগের লক্ষণ পাওয়া যায়। অপর দিকে জড়বাদের সপক্ষেও এ কথা বলা চলে যে আমরা যাকে জড় বলি, তাকি সত্যই জড়। জড়ের দুটি লক্ষণ ধরা হয়ে থাকে, তা স্থূল এবং তা গতিশীল নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান জড়ের যে ব্যাখ্যা করে, সে ব্যাখ্যায় জড় না থাকে স্থূল না থাকে স্থির। কাজেই জড় আর সে ব্যাখ্যায় ঠিক জড় থাকে না। পরমাণু আকারে তা নিত্য গতিশীল। পরমাণু আকারে তা আর স্থূল নয়, তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তা কতকগুলি শক্তিবিন্দুর সমষ্টিমাত্র। সুতরাং, কার দাবীকে উপেক্ষা করা উচিত সে কথা বলা শক্ত। সে ক্ষেত্রে যে .মত জড়ের দাবীকে উপেক্ষা করবে তা হয়ে পড়বে একপেশে দোষদুষ্ট।

এই একপেশে দোষ খন্ডন করবার প্রয়াসেই একদল দার্শনিক জড় ও চেতন উভয় প্রকার পদার্থেরই দাবী স্বীকার করা উচিত মনে করেন। জার্মান দার্শনিক পাউলসেন এই মত প্রচার করেন। তাঁর মতে বিশ্বের প্রতি বস্তুরই দুটি দিক আছে, একদিকে সে জড়, অপর দিকে সে চেতন। জড়গুণ এবং চৈতন্য তাঁর মতে সকল বস্তুতেই বিরাজমান। তারা একই বস্তুর বিভিন্ন দিক। মানুষের মন চেতন, তার দেহ জড়। এ কথা পশুর সম্পর্কে সমান প্রযোজ্য। উদ্ভিদের

সম্পর্কেও সে কথা খাটে, কারণ তাদেরও সুখ ও যন্ত্রণা বোধ আছে। তিনি বলেন যাকে আমরা অবিমিশ্র জড় বস্তু বলি, তার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। জড়বস্তুর সংগঠনে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, এই সব লক্ষণগুলিকে তার চৈতন্যের দিক বলে ধরে নেওয়া যায়। এইরূপে উভয়ের দাবীই স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই মত জড় ও চেতনের বিরোধের সামঞ্জস্য এইভাবে স্থাপন করে। পাউলসেন এই তত্ত্বের নাম দিয়েছিলেন 'সর্বচেতনাবাদ'। তার অর্থ এই যে সকল বস্তুরই দুই দিক আছে, চেতন ও জড়। এ কথা অণু হতে অণুতম বস্তুতেও যেমন খাটে, বৃহৎ হতে বৃহত্তম বস্তু সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। এই ভাবে তিনি কল্পনা করেন যে বিশ্বশক্তি যুগপৎ চেতন এবং অচেতন আকারে সর্ব বস্তুতে বিরাজমান আছেন। যে মত একপেশে ভাবে সমগ্র বিশ্বকে কেবল চৈতন্যময় বলে ব্যাখ্যা করে, তা হতে যে এ মত আরও যুক্তিসঙ্গত, তা অস্বীকার করবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই।

অপর পক্ষে উপনিষদের এই তত্ত্বটির বিশেষ বিরোধ এসে পড়ে জ্ঞেয়ের দাবীর সঙ্গে। এই সম্পর্কে এই কথা বলা হয়ে থাকে যে জ্ঞেয় মুখ্য বস্তু নয়, জ্ঞাতাই মুখ্য বস্তু। ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থায়, অর্থাৎ দ্বৈতভাববিহীন অবস্থায়, তাঁর জ্ঞেয়ত্ব লোপ পায়; কিন্তু জ্ঞাতৃ-আকারে তিনি নিশ্চিত বর্তমান থাকেন। তাঁর জ্ঞাতৃত্বরূপ তাঁর স্থায়ী রূপ। এই ত হল যাজ্ঞবল্ক্যের মত, আবার এই হল শঙ্করেরও মত। কিন্তু এই মত একদেশদর্শিতা দোষের অভিযোগ এড়াতে পারে না।

প্রথমত লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে দ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞাতাও বটেন জ্ঞেয়ও বটেন। কারণ শঙ্করের ব্যাখ্যা হল ব্রহ্ম উভয়েরই নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। তাই যদি হয়, তাহলে দ্বৈতাতীত রূপে তিনি জ্ঞেয়ত্ব বিসর্জন করেন এবং জ্ঞাতৃত্ব বজায় রাখেন, এই কথা বললে পরে জ্ঞাতৃত্ব রূপের প্রতি পক্ষপাত দেখান হয় বেশী। এই হল এক কথা।

দ্বিতীয় কথা হল জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়েই দ্বৈতাবস্থায় উভয়ের পরিপূরক বস্তু। জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় না হলে যেমন দ্বৈতাবস্থা হয় না, তেমন দ্বৈতাবস্থা ব্যতীত জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কারণ, উভয়ের মধ্যে পরস্পরের একটি নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য এবং শঙ্কর কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে একটা পরস্পর মুখাপেক্ষী হওয়ার সম্পর্ক আছে তা তাঁরা নজর করেন না। জ্ঞেয়ের সম্পর্কেই ত জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব ফুটে ওঠে। জ্ঞেয় যদি না থাকে, তা হলে জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব বজায় থাকে কি ক'রে? সে ক্ষেত্রে তাকে জ্ঞাতা বলে নির্দেশ করবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রহণ করবার কিছু থাক বা নাই থাক, সূর্য মহাশূন্যে কিরণ বর্ষণ করে সত্য, কিন্তু ভাল ক'রে দেখলে গ্রহীতার সন্ধান পাওয়া যায়। শূন্যকে সূর্য কিরণ দেয় ঠিক, তবে তা কিছুর ওপর প্রতিফলিত হয়

না বলে আমরা তা দেখতে পাই না। দেওয়া হয় অথচ দেখতে পাই না বলেই যে মহাশূন্যের গ্রহীতারূপ অস্বীকার করতে হবে তা ত নয়। বাতাসকে ত আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তা বাষ্পকণাকে গ্রহণ করে। এখানে কি তাই বলে তার গ্রহীতারূপ অস্বীকার করব? কাজেই এ উপমাও ঠিক এখানে প্রয়োগ করা যায় না।

যা কখনও জ্ঞাতা হবার ক্ষমতা রাখে না তাকে আমরা জড় বলি। আর যা জ্ঞাতা হবার ক্ষমতা রাখে, যেমন মানুষের মন, তাকে আমরা চৈতন্যময় বলি। যা জড় তাকে প্রধানত আমরা বাস্তব পদার্থরূপে দেখি, আর যা চৈতন্যময় তাকে কোনো নির্দিষ্ট রূপ দিতে পারি না বলে, তাকে অবাস্তব বলি। এইভাবে জড়ত্ব ও চৈতন্যের ভিত্তিতে বাস্তব ও চেতন পদার্থের মধ্যে আমরা একটা বিভেদের প্রাচীর তুলি। কিন্তু বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তারের ফলে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে কতকগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিবিন্দুর সমষ্টি। বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে পাই অণু, অণুকে বিশ্লেষণ করলে পাই পরমাণু। সেই পরমাণুর আকৃতি এক ক্ষুদ্র সৌরজগতের মত। তার কেন্দ্রে আছে একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি ও চারিপাশে ঘুরছে এক বা একাধিক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। এ ভিন্ন এমন বৈদ্যুতিক শক্তিকণাও আছে যা না ঋণাত্মক, না ধনাত্মক। এই হল আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুসারে জড় বস্তুর প্রকৃত রূপ। তা যদি হয়, তা হলে জড় বস্তুও ত মনের মতই সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিণত হয়ে পড়ে।

সেই কারণে একাধিক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে জড় ও চেতন পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য সাধারণত আমরা লক্ষ্য করি, সত্যই সে পার্থক্য নাই। জড়কে যতটা জড় ভাবি তা ততটা জড় নয়। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"আমার বিশ্বাস জড় ততটা জড় নয় এবং মন ততটা চৈতন্যময় নয় যতটা সাধারণত ধরা হয়ে থাকে এবং যখন আমরা এই কথা হৃদয়ঙ্গম করি, বার্কলি যে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করেছেন তা একরকম দূরীভূত হয়।"[১৪]

এইচ. জি. ওয়েলস একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি জড়ের সঙ্গে প্রাণশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ অবহিত। তাঁর মতে দেহ ও মনের মধ্যে, জড় বস্তু ও চৈতন্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তাঁর মতে তারা

---

১৪ 'I believe that matter is less material and mind less mental, than is commonly supposed and that when this is realised, the difficulties raised by Berkely largely disappear."

Bertrand Russel, The Analysis of Matter, p. 7

একই মৌলিক পদার্থের এ পিঠ ও পিঠ। এই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

"সম্ভবত তাঁরা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বিরোধের অবস্থা বর্তমান আছে ধরে নেন। সম্ভবত আমরা দেহ ও মনকে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদার্থ বলে ধরে নিয়ে থাকি, যদিও ঠিক বলতে তারা প্রত্যেকে একটি দ্বিমুখী সত্তার একটি দিক।"[১৫]

পরম সত্তা দুই মূল রূপে আমাদের কাছে প্রকাশ হয়। একটি হল জ্ঞাতা রূপ, অন্যটি জ্ঞেয় রূপ। একটি হল জড় রূপ অন্যটি চৈতন্য রূপ। বৈজ্ঞানিক বলেন, দার্শনিক বলেন তাদের মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একটি রূপকে প্রাধান্য দিয়ে তার বৈশিষ্ট্যকে স্থায়িত্ব দেবার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সম্পর্কে এসে পড়ে মাণ্ডুক্য উপনিষদের কথা। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা তার আলোচনা করেছি। এখানে বর্তমান প্রসঙ্গে তার নূতন ক'রে আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মোটামুটি সেখানে চারটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হল জাগ্রত অবস্থা। সেখানে মন বহিঃপ্রজ্ঞ বা বহির্মুখী। দ্বিতীয় হল স্বপ্নের অবস্থা। সেখানে মন অন্তঃপ্রজ্ঞ বা অন্তর্মুখী। তৃতীয় হল সুষুপ্তির অবস্থা। সেখানেও মন চৈতন্যময় ও জ্ঞাতৃরূপী। আর চতুর্থ অবস্থাটি হল এইরূপ,

"তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়তঃপ্রজ্ঞ নন, প্রজ্ঞও নন, অপ্রজ্ঞও নন। তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একত্ব বিশিষ্ট, বহুত্বহীন, শান্ত, শিব এবং অদ্বৈত। তিনিই আত্মা, তাঁকেই জানতে হবে।"[১৬]

মোটামুটি এই চারটি অবস্থাকে আমরা মূল দুটি অবস্থায় ভাগ করতে পারি। প্রথম তিনটি অবস্থা হল দ্বৈতাবস্থার বিভিন্ন রূপ। জাগ্রত অবস্থায় দ্বৈতভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, কারণ এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বিশিষ্ট বহুর জগত পূর্ণরূপে বিরাজমান। স্বপ্নাবস্থায়ও দ্বৈতভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু সেখানে যা জ্ঞেয়রূপে অনুভূত হয় তার বাস্তব সত্তা নেই, তা মনের কল্পিত বস্তু। এইজন্যই মনকে এখানে অন্তঃপ্রজ্ঞ বলা হয়েছে। তৃতীয় যে সুষুপ্তির অবস্থা সেখানেও দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ লোপ পায় না। সেখানে বাস্তব জগতের সঙ্গে বা স্বপ্নের কল্পিত জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় সন্দেহ নেই;

---

[১৫] "Perhaps they assume too complete an opposition between the objective and the subjective. Perhaps we treat body and mind as opposites in kind, when in fact, each is one face of a single two-fold reality."

H. G. Wells, Science of Life, P. 761

[১৬] মাণ্ডুক্য ॥ ৭ ॥

তবুও তার জ্ঞাতৃরূপ সেখানে খণ্ডন হয় না। তার উপভোগ ক্ষমতা তখনও বর্তমান থাকে। এই সুষুপ্তি হতে জেগে ওঠার পরে মানুষের মনে একটা তৃপ্তিবোধ জাগে যে বেশ আরামে ঘুমিয়েছিলাম। মাণ্ডুক্য উপনিষদে তাকে আনন্দভুক্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে বোধ হয় সেই কারণে। কিন্তু চতুর্থ যে অবস্থা সেখানে দ্বৈতভাবের কোনো সংস্পর্শ নেই। সেইজন্য তাকে সেখানে একত্ববিশিষ্ট বলা হয়েছে। সুতরাং বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে এই চার অবস্থাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। একটি দ্বৈত অবস্থা ও অপরটি অদ্বৈত অবস্থা।

এখন প্রশ্ন ওঠে এই অদ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপ পাই, তাতে কি তাঁর জ্ঞাতৃরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে? এখানে তার উত্তরে কি পাই দেখা যাক। অদ্বৈত-রূপের যে বর্ণনা তাতে যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে তারা সকলেই নেতিবাচক। তারা কতকগুলি গুণের অভাব সূচনা করে। যে গুণগুলির এই সম্পর্কে উল্লেখ আছে তাদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এই বর্ণনার প্রথম অংশে যে গুণগুলির অভাব সূচিত হয়েছে সেগুলি জ্ঞাতৃরূপী ব্রহ্মের ওপর প্রযোজ্য, যেমন, না অন্তঃপ্রজ্ঞ, না বহিঃপ্রজ্ঞ, না প্রজ্ঞানঘন, না অপ্রজ্ঞ। অপর পক্ষে শেষের দিকে যে গুণগুলির অভাব সূচিত হয়েছে সেগুলি জ্ঞেয়রূপী ব্রহ্মের ওপর প্রযোজ্য, যেমন, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য। সুতরাং চতুর্থ অবস্থায় তাঁর যে রূপ সেখানে তিনি জ্ঞাতার বৈশিষ্ট্যগুলিও ধারণ করেন না, জ্ঞেয়ের বৈশিষ্টগুলিও ধারণ করেন না। সেখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে একত্ববিশিষ্ট, তাঁর দ্বৈতভাব নেই এবং সেই কারণেই জ্ঞাতাও নন, জ্ঞেয়ও নন। সুতরাং এই ভাবধারা অনুসারে জ্ঞাতৃরূপ কেবলমাত্র দ্বৈত অবস্থাতেই আছে। অদ্বৈত অবস্থাতে জ্ঞাতৃরূপ থাকে না, যেমন জ্ঞেয়-রূপও থাকে না। ব্রহ্মের যে মূর্তরূপ, বিশ্বের মধ্যে প্রকট যে রূপ তার মধ্যেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে তাঁর প্রকাশ। তাঁর যে সৃষ্টি-পূর্ব অমূর্ত রূপ সেখানে তিনি জ্ঞাতাও নন, জ্ঞেয়ও নন, তিনি চেতনও নন, জড়ও নন, তিনি সকল বৈচিত্র্য-বিবর্জিত, তিনি পূর্ণতমরূপে অদ্বৈতভাবসম্পন্ন।

এই ভাবধারাটির কোনো পক্ষপাত দোষ পাওয়া যায় না। এখানে জড়ের প্রতি অবজ্ঞা নেই, চেতনের প্রতি আকর্ষণও নেই। জ্ঞেয়ের প্রতি অবহেলা নেই, জ্ঞাতার প্রতি অকারণ পক্ষপাত নেই। এইভাবে এই তত্ত্ব জ্ঞাতাও জ্ঞেয়ের, জড় ও চেতনের যে বিরোধ তার সমন্বয় করতে সক্ষম। শঙ্করের বা যাজ্ঞবল্ক্যের মত হতে এ তত্ত্ব পূর্ণতর। এই পরিণত দার্শনিক তত্ত্বের সমস্থানীয় মত কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য কোনো দর্শনেই দ্বিতীয় আর মেলে না।

সাধারণত দার্শনিকের মনে জ্ঞাতৃরূপের প্রতি পক্ষপাতের একটি কারণ আছে। সকল দার্শনিকই লক্ষ্য ক'রে থাকেন যে মানুষের মন ব্যতীত বিশ্বের মধ্যে যে ক্রিয়া চলেছে তাতেও উদ্দেশ্যমূলক কার্যের লক্ষণ দেখা যায় ও মনন-

শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষী যতই অনুসন্ধান করেছেন, ততই তাঁদের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে বিশ্বকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন তিনি যুক্তিসম্মত রূপে কাজ করেন, মানুষের মনে যে প্রজ্ঞা তাকে সত্যের সন্ধানে পথ দেখায়, অনুরূপ প্রজ্ঞা এবং অনুরূপ ধীশক্তি প্রকৃতির মধ্যেও ক্রিয়া করে। সুতরাং সেই শক্তি ধীশক্তিবিশিষ্ট না হয়ে যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা একজাতীয় পদার্থের মধ্যেই এই ধীশক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। তা হল নিজেদের মনে। জড়বস্তুতে আমরা তার অভাব দেখেছি। সেই কারণেই, জড়ের বিরুদ্ধে অজানিতে আমাদের মনে একটি বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছে। সত্তার মৌলিক রূপকে তাই আমরা চৈতন্যময় বলে কল্পনা ক'রে থাকি।

কিন্তু নিজেদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে অনুমান তা ভ্রান্তও ত হতে পারে। অবশ্য এমন অনুমান করা স্বাভাবিক। আমরা যাকে জানি তাই দিয়েই ত অজানিতকে জানব। কিন্তু এই পথে সব সময় আমরা অভ্রান্ত থাকি না। মানুষের জ্ঞানসঞ্চয়ের ইতিহাসে এইরূপ বিভ্রান্তির একাধিক উদাহরণ আমরা পাই। তার দু একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তা বলে যে, কোনো বস্তু শূন্যে থাকতে পারে না, অন্য কোনো বস্তুর আশ্রয়ে তার থাকতেই হবে। তা না হলে তা পড়ে যাবে। মানুষের শৈশবের ইতিহাসে এ প্রশ্ন উঠেছিল যে তা হলে পৃথিবী কি ভাবে আছে। সেদিনের মানুষ কল্পনাই করতে পারেনি যে অন্য কোনো বস্তুর আশ্রয়ে না থেকে কোনো বস্তু শূন্যে থাকতে পারে। কারণ, তা তার অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাই তার উত্তর দেওয়া হয়েছিল নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে। আমাদের দেশে বলা হত যে এক বিরাট সাপ আছে, তার নাম বাসুকি। তারই ফণার ওপর আশ্রিত হয়ে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। তা না হলে নিশ্চিত পৃথিবী পড়ে যেত। পশ্চিমের মানুষ তার ব্যাখ্যা করেছিল একটু স্বতন্ত্রভাবে, কিন্তু ব্যাখ্যার রীতি ছিল একই। তারা ধরে নিয়েছিল যে এক খুব শক্তিমান পুরুষ আছেন। তাঁর নাম এটল্যাস এবং তিনিই পৃথিবীকে পিঠে আশ্রয় দিয়ে ধরে রেখেছেন বলে পৃথিবী পড়ে যায় না। পরে জ্ঞানের পরিসর বর্ধিত হলে আমরা জেনেছি মহাশূন্যেই আকাশচারী গ্রহ ও নক্ষত্রের মত বিরাট বস্তু এমনি বিচরণ করে। তাদের নির্ভরের জন্য কোনো আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন নেই, অনন্ত দ্রুতগতিই তাদের অবলম্বন।

অনুরূপভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জেনেছিলাম যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে যেমন উপাদান লাগে, তেমন সেই উপাদানকে নূতন রূপ দান করতে একটি বাহিরের শক্তি লাগে। আমরা যখন ঘট নির্মাণ করি মাটি হয় উপাদান, আর যে সেই উপাদানকে ঘটের রূপ দেয়, সে হল কুম্ভকার।

প্রথমটিকে আমরা উপাদান কারণ বলি, আর দ্বিতীয়টিকে নিমিত্ত কারণ বলি। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা অনুমান করেছিলাম যে যে কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে একটি নিমিত্ত কারণ লাগে এবং সে কারণ উপাদান হতে স্বতন্ত্র থেকে বাহির হতে কাজ করে। মানুষের শৈশবে প্রশ্ন উঠেছিল বিশ্ব কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ তখন তার এক নিমিত্ত কারণ খুঁজেছিল এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধারণা ক'রে নিয়েছিল যে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অমিত শক্তিশালী ও বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র। তাঁকে তারা ঈশ্বর বলেছিল। এবং তাঁর জন্য স্বর্গে একটি পৃথক বাসস্থানও নির্দেশ ক'রে দিয়েছিল। তা নাকি পৃথিবীর উপর ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখেছে তার এই অনুমান ভ্রান্ত। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অবস্থিতি নেই, তাঁর আবাসভূমি স্বর্গকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বের মধ্যে যিনি ক্রিয়া করেন তিনি বিশ্বের অভ্যন্তরেই অলক্ষ্যে আছেন। প্রকৃতির মধ্যে যে কার্যকারণ ধারা চলেছে সেখানে উপাদানের মধ্যেই নিমিত্ত কারণ কাজ করে।

মানুষের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের মত ক'রে বিশ্বশক্তির কর্মরীতির এই ধরনের ব্যাখ্যাকে মানবধর্ম আরোপের দোষে দুষ্ট বলা হয়ে থাকে। আমাদের মনে হয়, এই যে পরম সত্তার মূলরূপের ওপর চিৎশক্তি আরোপ করা হয়ে থাকে, তাও একটি অনুরূপ মনোবৃত্তি প্রণোদিত। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া করেন তাঁর কর্মরীতি মানুষের ধরনের যে নয়, তা আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। চিন্তা ও মননের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক লাগে, প্রকৃতির তা লাগে না। বিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর ওপর মানুষের ধরনের ক্রিয়া-রীতি আরোপ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। তাঁর কর্মরীতি স্বতন্ত্র। তাঁর মৌলিক রূপের মননকার্যের জন্য মানুষের ধরনে চিৎশক্তি-বিশিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

(৩) উপনিষদে যে-নীতি প্রচার করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই। প্রথম প্রশ্ন হল আমাদের জীবনের আদর্শে আমরা ত্যাগকে প্রাধান্য দেব না ভোগকে প্রাধান্য দেব। এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ বলে দুয়েরই প্রয়োজন আছে, তাদের কোনোটিকেই বর্জন করবার প্রশ্ন ওঠে না। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে কোনো দোষ নেই, তা দোষযুক্ত হয় যখন তা অনিয়ন্ত্রিত আকারে সংঘটিত হয়। ইন্দ্রিয় দমনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের।

স্বার্থ ও পরার্থের যে দ্বন্দ্ব সে সম্বন্ধেও উপনিষদের উপদেশ অনুরূপ। স্বার্থবিলোপের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে স্বার্থশোধনের। ভোগে কোনো বাধা নেই, অপরকে বঞ্চিত ক'রে ভোগে আপত্তি আছে। আমার স্বার্থ যেখানে অন্যের স্বার্থের হানি করে সেখানে তাকে সংযত করতে হয়। কিন্তু

তার প্রয়োজন হয় না, যদি স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারি। সেটি সম্ভব হয় পরাবিদ্যার সাহায্যে প্রীতির বিস্তার দ্বারা। ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব বোধ হলে আমরা পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়তা উপলব্ধি করি। তখন স্বার্থ ও পরার্থ একীভূত হয়ে যায়, যেমন মায়ের স্বার্থ ও সন্তানের স্বার্থ একীভূত হয়ে যায়। জ্ঞানের সাহায্যে প্রেমের প্রসার সম্ভব, আবার প্রেমের প্রসার হলে স্বার্থবোধকে শোধন করা সম্ভব। সুতরাং উপনিষদে যে নীতি প্রচার করা হয়, তার বৈশিষ্ট্য হল তার মধ্যে জ্ঞান ও প্রীতির সংযোগ হয়েছে, জ্ঞান ও প্রীতির সংযোগই তার ভিত্তি।

এই তত্ত্বের সহিত বিভিন্ন দর্শনে নীতির সমস্যার যে সমাধানের চেষ্টা হয়েছে তার আমরা তুলনা করতে পারি। তুলনামূলক আলোচনায় দুটি সুবিধা আছে। প্রথম, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়, বিভিন্ন মতের সঙ্গে তুলনার ফলে বিশেষ মতগুলির উৎকর্ষ বা দুর্বলতা কোথায়, তা ধরা পড়ে। আমরা তাই কয়েকটি বিশিষ্ট নৈতিক আদর্শের সহিত উপনিষদের এই ভাবধারার তুলনার প্রস্তাব করি।

পাশ্চাত্য দর্শনে কাণ্টের নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে মতটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আমরা কাণ্টের নৈতিক আদর্শের সহিত তুলনা দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি।

কাণ্টের মতে সাধারণ জীব সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালিত, কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে তার মধ্যে জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয়েছে। তার তাৎপর্য হল এই যে মানুষ জন্তুর জীবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিলাসের জীবনকে সম্পূর্ণ নির্বাসন ক'রে জ্ঞানের জীবনকেই বরণ ক'রে নেবে। তিনি বলেন, বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষ সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়সুখ সন্ধানেই ইতর প্রাণীর মত প্রয়োগ করে, তাহলে জন্তুত্বের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য রইল কোথায়? সেই কারণে, তাঁর মত হল মানুষের কর্তব্য কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করা। স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের থেকে জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে উপনিষদও শিক্ষা দিয়েছে। আমরা দেখেছি সেকালের মানুষ পরাবিদ্যায় কি গভীর আনন্দ পেত। সুতরাং, এ বিষয়ে উভয় মতের সঙ্গে বেশ ভালরকম সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত কর্মের পথ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে সে বিষয়ে কাণ্ট যে ব্যবস্থা করেছেন তা অনন্যসাধারণ। তিনি কর্তব্য পথ নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ নীতি প্রয়োগ করেছেন। সেই নীতি প্রয়োগ হবে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা এবং তার ফলে যে নির্দেশ মিলবে তাকে বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পাদন ব্যাপারে হৃদয়বৃত্তির কোনো সংযোগ নেই। সে কর্তব্য সম্পাদনে সুখ আছে কি দুঃখ আছে, সে প্রশ্ন অবান্তর। নির্দেশ মিলেছে, অতএব তা নিশ্চয় করতে হবে, এই মনোভাব নিয়ে তিনি কাজ করতে

উপদেশ দেন। যে নীতি প্রযুক্ত হবে সে নীতি বলে প্রত্যেকটি মানুষের স্বার্থকে সম্মানিত করতে হবে এবং কোনো মানুষকে অপরের কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা চলবে না। তার অর্থ দাঁড়ায় আমার স্বার্থ সংরক্ষিত করতে আমি যেমন তৎপর হব, অন্য প্রতিটি মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে আমার ততখানি তৎপর হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন,

"এমনভাবে কাজ কর যাতে তোমার মধ্যে যে মানুষটি আছে এবং অপর সকলের মধ্যে যে মানুষটি আছে, তাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং কেহ কখনো স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়।"[১৭]

এখানে তাঁর মতের বৈশিষ্ট্য হল এই কর্তব্য নির্ধারণ এবং সম্পাদন ব্যাপারে তিনি হৃদয়বৃত্তির কোনো সংযোগ রাখেন নি। তাঁর মতে মানুষের কর্তব্য হল কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করা এবং তার কর্তব্যবুদ্ধি যে কাজ করতে বলবে সেই কাজ করা। তিনি হৃদয়বৃত্তিকে নীতির রাজ্য হতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করেছেন, সম্ভবত এই কারণে যে তা দেহের সঙ্গে এবং অনুভূতি বৃত্তির সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত। অনেক নীতিকার অনুভূতির স্বীকৃতি দিতে চান না, কারণ, সুখের আশায় কাজ করতে গেলে অনেক সময় দুঃখও এসে পড়ে, ফলে মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু কাণ্ট অনুভূতি বৃত্তিকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন অন্য কারণে। তিনি বলেন সুখের আশায় বা শান্তির আশায়, বা মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করা ঠিক নীতিসম্মত কাজ নয়। আমাদের নীতিবুদ্ধি আমাদের এমন কথা বলে না যে, সুখ চাও বা শান্তি চাও ত এই কর। তা বলে, এই কাজ কর, কারণ তা করা তোমার কর্তব্য। তার ফল কি হবে তা ভাববার তোমার অধিকার নেই। মানুষের অন্তর্নিহিত নীতিবুদ্ধি তাকে আদেশ করবে, যে কাজ বিশ্বের সকলের স্বার্থের দ্বারা অনুমোদিত হবে সেই কাজ তুমি ক'রে যাও, বিনা দ্বিধায়, বিনা বাক্যব্যয়ে। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি কাজ করবে না, এমন কি কোনো মহান হৃদয়বৃত্তির প্রেরণায়ও তুমি কাজ করবে না। কাজেই স্নেহপরবশ হয়ে বা দয়ামায়াপরবশ হয়ে কাজ করাও তাঁর নীতি অনুসারে নিষিদ্ধ। কর্তব্যের উপরোধেই কাজ ক'রে যেতে হবে। হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে নীতির কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

এইখানেই কাণ্টের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে গীতায় প্রচারিত নৈতিক আদর্শের সাদৃশ্য পাই। কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে অনুভূতিবৃত্তির কোনো সংযোগ থাকবে না, কাণ্ট এই শিক্ষা দেন। গীতায় প্রচারিত নৈতিক আদর্শেরও

[১৭] "Act so as to treat humanity whether in your own person or in the person of any others, in every case, as an end withal and never as a means."

Kant, Critique of Pure Reason

মূল কথা তাই। তবে উভয়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন কারণে। কাণ্ট এই নির্দেশ দিয়েছেন এই কারণে যে তাঁর মতে মানুষের বৈশিষ্ট্য হল তার বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিবর্ধিত। অনুভূতিবৃত্তি নিম্নস্তরের জীবেরও আছে। কাজেই তা নিকৃষ্ট বস্তু। মানুষের তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। সেই কারণে তিনি উপদেশ দেন হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তাকে কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ দেবে, তাই ক'রে যাওয়া তার কাজ।

গীতায় যে অনুভূতিবৃত্তিকে নৈতিক কর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তার কারণ স্বতন্ত্র। এটা দেখা যায় যে নির্দিষ্ট কর্তব্যের সঙ্গে অনুভূতির সংযোগ থাকলে অনেক সময় কর্তব্যে বাধা এসে পড়ে বা কর্তব্য সম্পাদনের পর মনে নানা কষ্টদায়ক চিন্তা আসে। সাধারণত কর্তব্য করা হয় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলে যেমন পরে সুখানুভূতি আসে, সিদ্ধিলাভ না হলে তেমন দুঃখের অনুভূতি আসে। অপরপক্ষে অনেক সময় হৃদয়বৃত্তির প্রভাব বর্তমান থাকলে কর্তব্য অপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। যখন কর্তব্যের নির্দেশে কোনো অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়, তখন কর্তব্য সম্পাদন কাজটাই অত্যন্ত কষ্টকর হয়। বিচারক যখন আইনের নির্দেশ পালন ক'রে কোনো ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেন, তখন তাঁর মন বিশেষভাবে বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। সেই রকম, ঘনিষ্ঠ আপন জনের বিরুদ্ধে ঘটনাচক্রে যদি কঠোর বিধান নিতে হয়, তাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গীতায় হৃদয়বৃত্তিকে নীতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এই কারণেই। উদ্দেশ্য হল কর্তব্য সম্পাদন কাজটি বাধামুক্ত করা এবং তার ফলে যে অপ্রীতিকর অনুভূতি উদ্ভূত হয় তা হতে যিনি কর্তব্য করছেন তাঁকে রক্ষা করা। ঠিক বলতে এই ধরনের সমস্যার মধ্যেই গীতার জন্ম ঘটেছিল। গল্পটির সহিত সকলেই সুপরিচিত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পর সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে, তখন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাদের মাঝখানে স্থাপন করলেন। অর্জুন দেখলেন যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি উদ্যত তাঁদের কেহ তাঁর পিতামহ, কেহ গুরু, কেহ জ্ঞাতিভ্রাতা। সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে আপন, শৈশবে সকলের সহিত কত গভীর প্রীতির সংযোগ ছিল। তাঁদের ওপর সেই প্রীতির অনুভূতি এখনও দুর্বল হয় নি। যাঁরা না থাকলে জীবনে কোনো সুখ থাকে না, তাঁদের বিরুদ্ধেই তিনি মরণাত্মক যুদ্ধে উদ্যত। এই উপলব্ধি তাঁকে এত অভিভূত ক'রে ফেলল যে তিনিও কর্তব্যের অনুরোধেও যুদ্ধ করবার উৎসাহ পেলেন না। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,

"হে মধুসূদন, আমার প্রাণ রক্ষার জন্যও আমি ওঁদের হত্যা করতে ইচ্ছা

করি না। সামান্য পৃথিবীর কারণে কেন, ত্রৈলোক্য রাজ্যের কারণেও আমি তাঁদের হত্যা করতে অক্ষম।”[১৮]

তখন অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে তাঁর কাছে আবেদন করলেন। যুদ্ধ কেন? যুদ্ধের কারণ, দুর্যোধন তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। কথা ছিল দ্বাদশ বৎসর নির্বাসনের পর যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হবে। কিন্তু দুর্যোধন তা করেন নি। তিনি বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও তিনি দিতে প্রস্তুত নন। ফলে, ক্ষত্রিয় হিসাবে পান্ডবদের কর্তব্য হল যুদ্ধ করেই ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় করা। সেই জন্যই ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ত কর্তব্য। তাই এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। তাকে ত পরিহার করা চলে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলেন।

তিনি প্রথমে বললেন মৃত্যু বাস্তবে নেই। হন্তা ভাবে আমি মেরেছি, যে হত হচ্ছে সে ভাবে আমি মরছি। উভয়েই সত্য কি জানে না, কেউ ত কাউকে মারে না।[১৯] কিন্তু সে যুক্তি বৃথা গেল।

তারপর তিনি অন্য পথ ধরলেন। তিনি বললেন মৃত্যু ত মানুষের অনিবার্য। যে জন্মায় সে ত মরেই। কাজেই যুদ্ধের ফলে আত্মীয়স্বজনের যদি মৃত্যু ঘটে তাতে ক্ষতি কি?[২০] তাতেও ফল হল না।

এবার করা হল কর্তব্যে আবেদন। অর্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্য। হৃদয়দৌর্বল্য হেতু যুদ্ধ হতে বিরত হলে তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হবেন। কিন্তু যিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে মরণকেই বরণ করতে প্রস্তুত, তাঁর কাছে এ আবেদনও নিষ্ফল।[২১]

তারপর ভিন্ন রকম আবেদন এল। ভয় দেখান হল, যুদ্ধ না করলে তিনি পাপে লিপ্ত হবেন। শুধু কি তাই, লোকে তাঁকে নিন্দা করবে। তিনি দুর্বিষহ অখ্যাতির ভাগী হবেন।[২২] কিন্তু এ আবেদনও তাঁর মনকে অবসাদ-মুক্ত করল না।

তারপর এল নূতন ক'রে আবেদন যা গীতাকে বিশ্বের মানুষের প্রিয় ক'রে তুলেছে। এইসূত্রেই কর্মফল ত্যাগের আদর্শ গীতায় স্থাপিত হয়েছে। গীতায় যা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই। কর্তব্য সম্পাদনেই মানুষের অধিকার আছে, তার ফল কি হয় না হয় তা নিয়ে চিন্তা করবার অধিকার নেই। কারণ,

---

[১৮] এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ গীতা॥ ১॥ ৩৫

[১৯] গীতা॥ ২॥ ১২

[২০] গীতা॥ ২॥ ২৭

[২১] গীতা॥ ২॥ ৩১

[২২] গীতা॥ ২॥ ৩৩

কর্ম ত এড়ান চলে না। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়, এদের সমান জ্ঞান করতে হবে। তবেই কর্তব্য সম্পাদনের ফলে মনে কোনো সংঘাত ঘটবে না। তাই গীতায় বলেছেন,

"কর্মেই তোমার অধিকার, ফলেতে কখনো নয়, কর্মফলের হেতু তুমি হোয়ো না, অকর্মের সঙ্গেও যেন তোমার যোগ না থাকে।[২৩]

এই কর্মফল ত্যাগের আদর্শকে গীতায় শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে কর্মফলন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। কর্মফল ত্যাগই প্রকৃত যোগ। "সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান ক'রে সমত্ব স্থাপনই যোগ।"[২৪] বলা হয়েছে যে কর্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। "যে কর্ম কর্তব্যবোধেই নিয়ত সম্পাদিত হয় এবং সঙ্গ ও ফল বর্জন করা হয়, সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হয়।"[২৫] সুতরাং গীতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে কর্মফল সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও গীতা ও কাণ্টের নৈতিক আদর্শ এই বিষয় সম্পূর্ণ একমত মনে হয়।

এইখানেই গীতা ও কাণ্টের সহিত উপনিষদের আদর্শের একটি বড় রকম পার্থক্য এসে পড়ে। উপনিষদে হৃদয়বৃত্তির দাবীকে স্বীকার করা হয়, তাকে সাদরে নীতির রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়। উপনিষদ বলে, তোমরা দয়া কর, তোমরা দান কর। উপনিষদ বলে মা সন্তানের প্রিয় হক, সন্তান মায়ের প্রিয় হক, মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, বিশ্ববাসী বিশ্ববাসীকে ভালবাসুক, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি ক'রে সকলে পরস্পরের সহিত একত্ব এবং আত্মীয়তা অনুভব করুক। এইখানেই ত মনে হয় উপনিষদের উৎকর্ষ।

মানুষের মনটি বড় জটিল বস্তু। তার সহিত তিনটি মূল বৃত্তি গ্রথিত, হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি। তার বুদ্ধিবৃত্তি জানতে চায়, তার হৃদয়-বৃত্তি ভালবাসতে চায়, তার ইচ্ছাবৃত্তি কর্ম করতে চায়। এই তিনটি নিয়েই ত তার মন সম্পূর্ণতা পায়। এই তিনটি বৃত্তি ওতঃপ্রোত ভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত এবং পরস্পরের সহায়তা করে। মানুষের বুদ্ধিশক্তি নির্দেশ দেবে তার কর্তব্য কোন্ পথে, তার ইচ্ছাশক্তি তাকে সেই পথে নিয়ে যাবে, আর তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রেরণা দিয়ে বলাধান করবে তার হৃদয়বৃত্তি। মানুষের হৃদয়বৃত্তিই তার কাজে তাকে উৎসাহ এনে দেয় এবং প্রেরণা এনে দেয়। মানুষের কাজ করবার ক্ষমতা তার প্রেরণার গভীরতার উপরই নির্ভর করে। কোনো অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা যে পরিমাণে অনুভব করব, তাকে দমন

[২৩] কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ গীতা॥ ২॥ ৪৭

[২৪] গীতা॥ ২॥ ৪৮

[২৫] গীতা॥ ১৮॥ ৯

করবার ইচ্ছাও আমাদের সেই পরিমাণে বাড়বে। কর্তব্য হিসাবে যা করি তা যন্ত্রচালিতের মত করি। প্রেরণার বশে যা করি, তা প্রাণপণে করি।

শুধু কি তাই? হৃদয়বৃত্তিকে যদি নীতির জগৎ হতে নির্বাসিত করা হয়, তা হলে আমাদের কর্মজীবনে রস থাকবে কোথায়? জীবন কলুর ঘানিতে যুক্ত বলদের মত একান্ত রসহীন হয়ে পড়বে। কর্তব্যের নির্দেশ যদি হয় নীতির কঙ্কাল, তা হলে অনুভূতিশক্তি হল তার দেহ। অনুভূতিশক্তি নৈতিক জীবনকে পূর্ণতা দেয়, তাকে রক্তমাংসের দেহে পরিণত করে, তাকে কঙ্কালসার মাত্র রাখে না। এইখানেই উপনিষদের নৈতিক আদর্শের উৎকর্ষ।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হল অনুভূতিকে নিষ্পেষিত করা নয়, তাকে পরিবর্ধিত করা, তাকে মার্জিত করা; স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া নয়, স্বার্থকে বিস্তারিত ক'রে তাকে সংকীর্ণতাদোষমুক্ত করা। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হল প্রীতি বা ভালবাসা। ভালবাসার বিস্তার ঘটিয়ে স্বার্থকে সংকীর্ণতাদোষ-মুক্ত করা যায়। এই ভাবে স্বার্থকে বিস্তার ক'রে সকলের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত করা যায়। তা হলে কর্তব্যের পথ আপনা হতেই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্য অনুষ্ঠান করতে দুঃখ এড়াতে আমরা যদি হৃদয়বৃত্তিকে নির্মূল করি, তা হলে এই ভাবে স্বার্থকে পরিশোধনের পথ আমাদের রুদ্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, অনুভূতিশক্তিকে নির্বাসিত করলে জীবনের সকল মাধুর্য, কর্মের সকল সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। মানুষ ফলে হয়ে পড়ে যন্ত্রচালিত জীবের মত। কর্তব্যে তার আনন্দ থাকে না, কর্তব্য তার নিকট নিতান্তই বোঝা হয়ে পড়ে। নৈতিক জীবনে অনুভূতির খুবই প্রয়োজন আছে। উপনিষদ হৃদয়বৃত্তিকে নির্বাসিত না ক'রে বুকে টেনে নিয়েছিল বলেই তার বাণীতে আনন্দ এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাই উপনিষদের ঋষি আকাশে, বাতাসে, নদীতে, বনস্পতিতে মধুর আস্বাদ পেয়েছিলেন; তাই তাঁরা পৃথিবীর সকল বস্তুকেই মধুময় বলে উপলব্ধি করেছিলেন। উপনিষদের মতে চাই শুদ্ধ জ্ঞান পিপাসা, চাই ব্রহ্মবিদ্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির সহিত একতাবোধপ্রসূত অনন্তবিস্তারী ভালবাসা এবং চাই অনবদ্য, সর্বজনসম্মত, সুন্দর, পরিপূর্ণ জীবন।

উপনিষদের নৈতিক আদর্শের সমর্থক বাণী কিন্তু আমরা আমাদেরই দেশের দুই মনীষীর কাছ থেকে পাই। তাঁদের একজন হলেন বুদ্ধ এবং অপর জন হলেন রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় আড়াই হাজার বছরের। তবু তাঁদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এদিকে উভয়ের আদর্শের সঙ্গে উপনিষদের প্রচারিত নীতিরও বেশী রকম মিল পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে বুদ্ধের নৈতিক আদর্শের কথা বলব।

ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর স্থাপিত। প্রথম জীবনে তিনি দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্র-সাধন করেছিলেন। সেই আত্মনিগ্রহের ফলে তাঁর দেহ এমন নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল যে চিন্তা করবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁর লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বুঝেছিলেন যে স্বাস্থ্যের মত বড় সম্পদ আর কিছু নেই এবং অর্থহীন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কোনো কাজে লাগে না। এমন কি ধর্মসাধনের জন্যও সুস্থ দেহের প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন,

"শরীরকে সুস্থ রাখা ধর্মের অঙ্গ, কারণ অন্যথায়, আমাদের জ্ঞানবর্তিকাকে সতেজ রাখতে সক্ষম হব না এবং মনকে সবল এবং সুস্থ রাখতে পারব না।"[২৬]

সেই কারণে, বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি বারাণসীতে যে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন,

"হে ভিক্ষুগণ, দুটি বিরোধী বিষয় আছে, যা যে মানুষ প্রব্রজিত হয়েছে তার পরিহার করা উচিত। একদিকে বিষয় ভোগে অত্যধিক আসক্তি; তা বিষয়ী মানুষের বৈশিষ্ট্য, তা হেয় এবং অর্থহীন। অপর দিকে আত্মনিগ্রহের অভ্যাস। তা কষ্টদায়ক, অর্থবিহীন এবং তার কোনো মূল্য নেই।"[২৭]

সুতরাং বুদ্ধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ গ্রহণ করেন নি, করেছিলেন ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকে যে তিনি অত্যন্ত অধিক মূল্য দিতেন তা তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত বাণী হতে সমর্থিত হবে :

"পোষমানা অশ্বতর ভাল, সিন্ধু দেশের অশ্ব ভাল, বড় দাঁতবিশিষ্ট হাতী ভাল, কিন্তু যে মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে, সে আরও ভাল।"[২৮]

অপর পক্ষে স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের সমাধানে বুদ্ধ প্রচারিত নীতি উপনিষদেরই মত হৃদয়বৃত্তির ওপর বিশেষ মূল্য দিয়েছে। তার ভিত্তিতেই বৌদ্ধধর্মে অহিংসা নীতির প্রচার এবং সেই কারণেই বুদ্ধ পরম কারুণিক মহর্ষি বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আর্ত মানুষের প্রতি করুণাই ত তাঁকে সংসার ত্যাগ করবার প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কতখানি করুণা হৃদয়ে ধারণ করতেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত তাঁর একটি বাণী হতে হৃদয়ঙ্গম হবে :

"সকল মানুষ যন্ত্রণার ভয়ে কাঁপে, সকল মানুষ প্রাণকে ভালবাসে; মনে রেখ তুমিও তাদের মতই জীব। এবং হিংসা ও হত্যা হতে বিরত থেক।"[২৯]

এই ভাবেই অনুকম্পা, করুণা ও মমত্ববোধ ফুটিয়ে তুলে বুদ্ধের নীতি স্বার্থকে শোধন ক'রে মানুষকে পরার্থে ব্রতী ক'রে তুলত। বুদ্ধের অহিংসা নীতির প্রেরণা এইখানেই।

---

[২৬] অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত
[২৭] ধম্মপদ ॥ ১৫ ॥ ৭
[২৮] ধম্মপদ ॥ ১৩ ॥ ৩
[২৯] ধম্মপদ ॥ ১০ ॥ ২

কিন্তু বুদ্ধ প্রচারিত নীতিকে কেবল অহিংসা বলে বর্ণনা করলে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি যা প্রচার করেছিলেন, তা হিংসাবৃত্তির দমন মাত্র নয়, তার থেকে অনেক বেশী। সেই পরম কারুণিক মহামানব এ কথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে সর্ব জীবে প্রীতি এবং ভালবাসার মত চিত্তশোধক বস্তু কিছু হয় না। সকল জীবের প্রতি পূর্ণ প্রেম সহকারে আমরা যে আচরণ করব, তা স্বার্থদূষিত হতে পারে না। সংক্ষেপে বলা যায় সকলকে ভালবেসে, সকলের মঙ্গল কামনা ক'রে, সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই ভগবান বুদ্ধ মানুষের নৈতিক আদর্শ তথা ধর্ম বলেই প্রচার করেছেন।

আশ্চর্যের কথা, বুদ্ধ তাঁর এই আদর্শকে 'ব্রহ্মবিহার' বলে বর্ণনা করেছেন। তাবে কি তাঁর এই আদর্শের প্রেরণা ছিল উপনিষদের বাণী? ব্রহ্মবিহার বলতে তিনি যা বোঝেন তা হল এই,

"পরস্পরকে প্রতারিত কোরো না, কোথাও কাউকে অবহেলা কোরো না, কখনো ক্রোধবশেও চেয়ো না যে তোমার দেহ বচন বা চিন্তা কারও দুঃখের কারণ হক। মা যেমন তাঁর একমাত্র সন্তানকে তাঁর প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন, তেমন সকল জীবের জন্য অপরিমেয় করুণার চিন্তা তোমার হৃদয়ে বহন করবে।

তোমার উপরে, নীচে, চারিপাশে, সমগ্র বিশ্বের জন্য বহন করবে বাধামুক্ত, হিংসামুক্ত ও দ্বেষমুক্ত হয়ে, সহানুভূতি ও অপরিমেয় প্রীতি।

দণ্ডায়মান অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় বা শায়িত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না নিদ্রাবিষ্ট হও, অনুক্ষণ এমন মনোভাবসম্পন্ন হয়ে থাকার নাম 'ব্রহ্মবিহার'।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের যা নৈতিক আদর্শ, তার সঙ্গেও উপনিষদের প্রচারিত নৈতিক আদর্শের অনুরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের অনুরূপ নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে, কারণ তা হলে আমরা জীবনকে ভালরকম বিকশিত করতে পারব। কিন্তু ইন্দ্রিয় নিরোধের তিনি দৃঢ়তম ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, সন্ন্যাস হল শুষ্কতার সাধনা, তা হল আত্মবঞ্চনার ধর্ম। চাষী যে মাটি চাষ করে, তাকে মরুভূমিতে পরিণত করবার জন্য নয়, তাতে ফসল উৎপাদন করার জন্য। এই সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি এখানে পুনরুল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে না মনে হয়। তিনি বলেছেন,

"সৌন্দর্য ত চাই। আত্মহত্যা ত সাধনার বিষয় হতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য পালন, শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না।"[৩১]

---

৩০ The Religion of Man, PP. 69-70.

৩১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, সাহিত্য, পৃ ৩৫৫।

স্বার্থ ও পরার্থের যে দ্বন্দ্ব তা রবীন্দ্র-দর্শনে সমাধান হয়েছে এক অভিনব পথে। মানুষের ধর্ম কি হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ঘটনাক্রমে এই নৈতিক সমস্যারও সমাধান করেছেন। ফলে নীতি ও ধর্ম তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছে। কথাটি ভাল ক'রে বুঝতে গেলে একটু প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মানুষের মনটি বড় জটিল বস্তু। তার বৃত্তি বহুমুখী। তার বুদ্ধিবৃত্তি আছে, হৃদয়বৃত্তি আছে এবং ইচ্ছাশক্তি আছে। তাই বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম তার জীবনে তিনটি মূল আকর্ষণ। ধর্ম সমস্যাতে তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। পরম সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষাই মানুষের ধর্মবোধের মূলে। এই ধর্মবোধের তৃপ্তি সম্পাদিত হবে সেই পথে যে পথে তার শ্রদ্ধা নিবেদন সুন্দররূপে সম্পাদিত হবে। এখন এই পথ কি ভাবে নির্ধারিত হবে, তাই হল ধর্মসমস্যা। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির জটিলতা এই সমস্যাকেও জটিল ক'রে তোলে। কারণ, নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পথে তার সমাধান খুঁজছে। যার বুদ্ধি শক্তি প্রবল, সে মনন শক্তি-দ্বারা পরম সত্তার পরিচয় লাভকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলবে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই পথে যাবেন। যিনি কর্ম ক'রে তৃপ্তি পান তিনি কাজের পথেই শ্রদ্ধা নিবেদনের উপায় খুঁজবেন। এ হল সমাজ সেবকের ধর্ম। আর যাঁর হৃদয়-বৃত্তি প্রবল, তিনি ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পরম সত্তার প্রতি হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করতে উৎসুক হবেন। এ হল ভক্তের ধর্ম।

এই ভাবে মানুষের রুচি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে নানা মার্গের দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে কোন্ মার্গ ভাল সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। কেহ তার সমাধান খোঁজেন অন্য মার্গগুলিকে অস্বীকার ক'রে, যে মার্গে তাঁর রুচি কেবল তাকেই সমর্থন ক'রে। কেহ বলেন, যে পথে যার তৃপ্তি, তাই তার উপযুক্ত মার্গ। গীতা সেই কথা বলেছে। রামকৃষ্ণদেবও সেই কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এদের কোনো মতটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেন, এ কথাটি ঠিক যে পরম সত্তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের যে আকুতি, তার তৃপ্তি সাধনের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। তাই বলে ধর্মের আদর্শ সংকুচিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে সেই পথই আদর্শ ধর্মমার্গ যা কেবল শ্রদ্ধা নিবেদনের ইচ্ছার শুধু তৃপ্তি সাধন করবে না, যা উপাসকের মনুষ্যত্বকে পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট করবে। সুতরাং, যে মার্গ মানুষের হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মবৃত্তিকে একসঙ্গে পরিচালিত করবার সমান অধিকার দেবে, তাই আদর্শ ধর্ম।

কিন্তু পরম সত্তার ত একস্থানে কোনো বিশেষ প্রকাশ নেই। তিনি ত বিশ্বের সর্বত্র অদৃষ্ট রূপে বিরাজমান। সে ক্ষেত্রে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাব কি

উপায়ে? তাঁর কাছে সেবা পেঁছে দেব কি ক'রে? তিনি তার উত্তরে বলেন, তাঁকে সেবা করতে হবে সেই রূপেই যে রূপে মানুষের নিকট তিনি ঘনিষ্ঠতম ভাবে প্রকাশ নিয়েছেন। নারীর নানা সম্পর্কে নানা রূপে প্রকাশ। তিনি কারও কন্যা, কারও ভগিনী, কারও সখী, কারও বা মাতা। সন্তানের কাছে তাঁর মাতৃরূপটিই ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ। সেইরূপ মানুষের নিকট বিশ্ব সত্তার যে প্রকাশটি ঘনিষ্ঠতম, তা হল মানুষ রূপে প্রকাশ। সুতরাং বিশ্বমানবের সেবাই হল প্রকৃষ্ট ধর্ম এবং তথা আদর্শ নীতি। এই সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণ ভাবে জ্ঞানে জানতে পারি। জল, স্থল, আকাশ, গ্রহনক্ষত্রের সহিত আমাদের আদান-প্রদান চলে না।—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গল কর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এই জন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতর ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানব আত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি।......আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্র ভাবে প্রকাশ করিলে, তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃ সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর ও অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি।"[৩২]

সুতরাং তাঁর এই নৈতিক আদর্শ বলে সমগ্র মানব জাতিকে আপন জ্ঞানে ভালবাসতে হবে। ফলে, আমাদের স্বার্থ বিস্তার লাভ ক'রে মার্জিত হয়ে যাবে। তাকেই তিনি বলেন 'বাসনাকে ছড়িয়ে দিয়ে লয় করা'। তখন বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধনই হবে আমাদের প্রকৃষ্ট কর্তব্য। আমাদের কর্মবৃত্তি তখন স্বার্থদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, যা বিশ্বমানবের কল্যাণ আনে এমন কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। বিশ্বজনীন কর্মই এই ভাবে হয়ে পড়ে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। তাকে তিনি বলেন বিশ্বকর্মা হওয়া। তিনি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে,

"যে সত্তার লীলা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করেছে এবং যে সত্তা মানুষের মনে

[৩২] রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ধর্ম, পৃ ৩৮২

স্থান নিয়েছে, তার সঙ্গে মিলন কখনো নির্জীব আকার গ্রহণ করবে না। তাঁর সঙ্গে মিলনের প্রয়োজনে আমাদের কর্মকে স্বার্থপরতা-দোষ-মুক্ত করতে হবে। আমি যখন বলি সকলের জন্য কর্ম করতে হবে, তার অর্থ এই করি না যে অসংখ্য ব্যক্তিবিশেষের কর্ম আমাদের করতে হবে। যে কর্ম ভাল, তা হাজারই ক্ষুদ্র হক, তাই হল বিশ্বজনীন কর্ম। এমন কাজ বিশ্বকর্মার সাধনযোগ কর্ম, কারণ সে সকলের জন্যই কাজ করে।"[৩৩]

উপনিষদে নীতির যে আদর্শ স্থাপন হয়েছে তাঁর যেন বর্তমান কালে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। সমগ্র বিশ্বের একত্বের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির জন্য মনে ঐকান্তিক ভালবাসা নিয়ে বিশ্বজনীন কর্মে তা প্রবৃত্তি দেয়। তার মূল শিক্ষা হল, আত্মদমন কর, দয়া কর, বিদ্বেষভাব পরিহার কর, মনে বিশ্ববাসীর জন্য প্রীতি পোষণ কর। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে সমগ্র মানবজাতি তার ইতিহাসের এক মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যা এত অগ্রসর হয়েছে যে মানবসমাজে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ভোগ্য পণ্যের যে বিপুল সম্ভার উৎপাদিত হয়েছে তার বণ্টন নিয়ে দারুণ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছে। অপর পক্ষে এই প্রযুক্তিবিদ্যারই প্রয়োগে মানুষের অধিগত হয়েছে এমন শক্তি যা মহাপ্রলয় ঘটাতে পারে। বিদ্বেষের মাত্রা যদি আরও বর্ধিত হয়, তাঁদের হাতে এই ধ্বংসাত্মক শক্তি রক্ষিত, তাঁরা যদি আত্মসংযমের ক্ষমতা হারান, তা হলে, এমন বিপর্যয় ঘটতে পারে যা সমগ্র মানবজাতির বিলোপসাধন করবার ক্ষমতা রাখে।

এই পরিস্থিতি যে কতখানি মারাত্মক তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন কোয়েস্‌লার নামে পশ্চিমের এক মনীষী। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে গত দুই শত বৎসরের মধ্যে ধর্মের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু ফলে হয়েছে কি, তার ভিত্তিতে যে প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে উঠেছে, তা মানুষের হাতে অভাবনীয় ভাবে ধ্বংসাত্মক-শক্তি এনে দিয়েছে, অথচ সেই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে সংহত রাখবার মত তার নৈতিক বল নেই। এক দিকে যেমন তার সংহার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, অপর দিকে তেমন সে নৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই কারণে আজ বিশ্ববাসী এক সর্বাত্মক ধ্বংসের সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেছেন,

"দুটি বিচ্ছিন্ন পক্ষের মধ্যে (ধর্ম ও বিজ্ঞান) বিজ্ঞানের কাছে প্রথম দিকে ভিন্ন পথে যাত্রা যেন অবিমিশ্র সৌভাগ্যের বিষয় হয়েছিল। ধর্মরহস্যের ভার-

---

[৩৩] The Religion of Man, p. 69.

সাম্যের শক্তি হতে মুক্ত হয়ে, শ্বাসরোধ হয়ে যায় এমন গতিতে বিজ্ঞান স্বপ্নেরও অতীত কত নূতন দেশ জয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে দুই শতাব্দীর মধ্যে মানবজাতির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর রূপও পরিবর্তন ক'রে দিয়েছে। কিন্তু যে মূল্য দিতে হয়েছে তাও সেই অনুপাতে বেশী। তা মানুষকে ঠেলে দিয়েছে দৈহিক আত্মবিনাশের প্রায় সীমানায় এবং তেমনি অভূতপূর্ব এক মানসিক অক্ষমতা সৃষ্টি করেছে।"[৩৪]

এই সমস্যার সমাধান কোন পথে? মনে হয় উপনিষদের নৈতিক আদর্শের প্রচার এখানে হয় ত এই সমস্যা সমাধান করতে পারে। অনুভূতি শক্তির যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেই হৃদয়বৃত্তির প্রসারই বোধ হয় একমাত্র নিষ্কৃতির পথ। সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে পরস্পরের একান্ত আপন জেনে এবং কোনো বিশেষ জাতির কোনো মানুষকে শত্রু বিবেচনা না ক'রে যদি বিশ্বজনীন প্রীতি ও মৈত্রীর পথ মুক্ত করা যায়, তবেই বোধ হয় সেই বিদ্বেষ বিষকে নির্বাসনে পাঠান যায়, যা মানুষের মনকে অধিকার ক'রে বসে ধ্বংসাত্মক কাজে প্রেরণা দিচ্ছে। পূর্বে ধর্মের, বাহির হতে ভারসাম্য রক্ষা করবার যে নিয়ন্ত্রণ শক্তি ছিল, তা আর কাজ করে না। পরলোকে পাপের শাস্তির ভয় মানুষের সংস্কার-মুক্ত মনকে ভয় দেখানর ক্ষমতা হারিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংযমের ব্যবস্থা আনতে হবে মানুষের অন্তর হতে। সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তিতে বিশ্বজনীন প্রীতিই বোধ হয় সেই প্রেরণা দিতে পারে।

তাই ত হল প্রাচীন উপনিষদের মর্মবাণী। পরম সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের কৌতূহল হল উপনিষদের যুগের মানুষের চিত্তবিনোদন। তাঁকে সর্বব্যাপী সত্তারূপে উপলব্ধি ক'রে খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির যে দুঃখ তা হতে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হব, এই হল উপনিষদের পুরুষার্থ। এবং সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তিতে বিশ্বমানবের জন্য হৃদয়ে প্রীতি বহন ক'রে সকল মানুষের সঙ্গে ভাগ ক'রে জীবন ভোগ করব, এই হল উপনিষদের নৈতিক আদর্শ।

এই উপলব্ধির উৎকর্ষ উপনিষদের ঋষি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "হে সকল দেশের অমৃতের পুত্র, শোনো, আমি জেনেছি।"[৩৫]

কি জেনেছেন? তিনি বলেন, আমি জেনেছি সেই পরম সত্তাকে, পেয়েছি তাঁর পরিচয়, যার ফলে আমি তাঁর আনন্দের ভাগী হয়েছি, খণ্ড জীবনের দুঃখ, শোক, তাপ আর আমাকে স্পর্শ করে না।

---

[৩৪] Arther Koestler, The Sleep Walkers, p. 529.

[৩৫] শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ঋগবেদ ॥ ৭ ॥ ৮৯ ॥২

বিশ্ববাসী সে কালে সে বাণী শুনেছিল কিনা জানি না, কিন্তু আজ বোধ হয় তা শোনবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপনিষদের ঋষি যে পথে শ্রেয় ও কল্যাণের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই পথই বোধ হয় বর্তমান বিশ্বের পরিত্রাণের পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ড

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ব

ভ

ম

য

র